পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র : রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মো: রফিকুল ইসলাম

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১২৮

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-১৪

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
দর্শন বিভাগ

অনুমোদনপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, *পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র : রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক বিশ্লেষণ* শিরোনামে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এটি জনাব মো: রফিকুল ইসলাম-এর একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভের সকল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ইতোমধ্যে অন্য কোনো ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/গবেষণাকর্ম বা এ জাতীয় কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়নি।

ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি আমার একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি প্রফেসর ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণায় অন্যান্য উৎস থেকে সংযোজিত তথ্যের তথ্যসূত্র যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ কোনো অংশই ডিপ্লোমা বা অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা হয় নি।

(মো: রফিকুল ইসলাম)

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

উচ্চতর গবেষণা ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে পথিকৃতের নিদর্শন স্থাপন করেছে। ইতিমধ্যে দর্শন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকটি উচ্চতর ডিগ্রি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় আমার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে অপরিসীম ধৈর্য সহকারে সহযোগিতা করেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম করেছেন। তিনি প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি আমার ঋণ ও গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

দর্শন বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে অধ্যাপক ড. মো: শাজাহান মিয়া, অধ্যাপক ড. এম মতিউর রহমান, অধ্যাপক ড. নাইমা হক এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ গবেষণায় আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং দর্শন বিভাগ সেমিনারে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের অনেকে নানাভাবে আমাকে প্রেরণা ও সহায়তা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। গবেষণা সহায়ক বইপত্র ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আমার স্ত্রী তাজরিন আক্তার পিয়ালী এবং বন্ধু ড. মো: মাসুদ আলম সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

মো: রফিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

মানব সভ্যতা আজ উৎকর্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বিশ্বায়ন, উদার অর্থনীতি ও মুক্তবাজারের প্রভাব সর্বত্র বর্তমান। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের কর্মসংস্থান, আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও পারস্পরিক বৈষম্যের অবসানের চিন্তার প্রেক্ষিতে কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণা বেশ জনপ্রিয় ও আকাঙ্খিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। উৎপাদিকা শক্তির গতিশীল ও পরিকল্পিত বিকাশ যেমন প্রয়োজন তেমনি এর যথোপযুক্ত সুযোগ এখন সকল মানুষের সামনে উন্মুক্ত। মানব সমাজ, সমাজের বিকাশ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সাথে পুঁজির যেমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তেমনি এর মুখ্য বিষয় হলো মানবকল্যাণ। সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন আজ মানবজাতির মধ্যে দেখা যায় তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক বিশ্লেষণ। বর্তমান গবেষণাকর্মটি "পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র : রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক বিশ্লেষণ" শিরোনামের মূল প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস।

মানবেতিহাসের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক বিশ্বের প্রয়োগমুখী অভিজ্ঞতা পর্যন্ত সার্বিক বিশ্বপরিস্থিতি ও তার চূড়ান্ত ফলাফলের ইতিহাস এ অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এলোমেলো ও বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন ছেড়ে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হুমকিকে জয় করে, খাদ্য উৎপাদন, সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে শেখার মধ্য দিয়ে মানুষ অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা লাভের পাশাপাশি উন্নততর জীবনের যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। সভ্য হতে শেখা থেকে শুরু করে সম্পদের মালিকানাকে কেন্দ্র করে সমাজে যে শ্রেণিবিভক্তির সূচনা হয় এবং তার ফলে মানবসমাজে বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন ধরনের পরিচালনা ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছে সেগুলোর উদ্ভব, স্বরূপ ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি দিকনির্দেশনা পাওয়াই এ অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য।

বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ গণতন্ত্রের উদ্ভব, স্বরূপ ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। গণতান্ত্রিক উপায়ে নাগরিক সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাস এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সমানাধিকারের দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে প্রাচীনকালের হলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সূত্রপাত হয় বিশ শতকে এসে। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হলো জনমতের প্রতিফলন। সার্বজনীন স্বাধীনতা, প্রগতিশীল ও আলোকিত জনগণের অভিমত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই। এটি সভ্য সমাজের নিদর্শন ও আধুনিক জীবন-পদ্ধতির অন্যতম দিকদর্শন। বাস্তবে গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো সমাজের সব স্তরের মানুষের মৌলিক অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি মানুষের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলসমূহ ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের গণতান্ত্রিক মানসিকতার অভাবের কারণে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নানাবিধ প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে সৃষ্টিশীলতা বিকাশের পরিপন্থী নানামুখী চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে গণতন্ত্রের বহুমাত্রিকতাকে উন্মোচন করে তার পরিচর্যার মাধ্যমে বিকাশ নিশ্চিত করা যথার্থ গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পুঁজিবাদ সম্পর্কে। শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং পুঁজিবাদের বৈপ্লবিক বিকাশের সূচনা হয়। পুঁজিবাদী সমাজের আর্থিক কাঠামো সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় এক নতুন যুগের ঘোষণা করে। বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেদের মতো গড়ে তোলে আর্থ-রাজনৈতিক জগৎ। সবাইকে সেই জগতে যুক্ত করে রাজনীতি এবং উৎপাদনের উপায়গুলো কেন্দ্রীভূত করে। উৎপাদনের উপকরণের বিশাল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তোলা হয় আধিপত্যের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসর। অর্থাৎ পুঁজি নিজ দেশে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্ববাজার ভ্রমণ করে এবং মুনাফার ভিত্তিতে স্ফীত হয়। পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও প্রতিযোগিতা থেকে একচেটিয়া রূপান্তর পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তোলে। পুঁজির স্থানিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক রূপ আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়, সম্পদের অসম বন্টনের কারণে পুঁজিবাদের সংকট চলমান। নানাবিধ সংকট সত্ত্বেও পুঁজিবাদ পরিবর্তিত বিশ্ব ও জাতীয় পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে আজও পৃথিবীর বুকে টিকে রয়েছে। পুঁজিবাদ আজ আর সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে নিজের বৈশ্বিক অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পারছে না। এটাই বর্তমানে পাশ্চাত্যে চলমান পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের মূল অনুপ্রেরণা। পুঁজিবাদী ভাঙ্গনের এই বার্তাই ইতিহাসের শেষ কথা হতে পারে না। সব ধরনের ভাঙ্গনের পর সেখানে নতুন যেকোনো ধরনের পুনর্গঠন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী শুধু অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশগুলোতেই নয়, ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত দেশগুলোতেও তেমনি গঠনের এক পদধ্বনি এখন শোনা যাচ্ছে। পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পুঁজিবাদীরা ঘোষণা করেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র শেষ হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী এখন শুধু বিশ্বায়নের নতুন বিশ্বব্যবস্থা। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই নতুন বিশ্বব্যবস্থা আসলে পুঁজিবাদের চরম রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত মূল দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত মালিকানা ও সামাজিক উৎপাদনের দ্বন্দ্বের কোনো সমাধান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরা মনে করেন, এই দ্বন্দ্বের সমাধান যে ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব সেটি হলো সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের কোনো দেশ নেই, জাতি নেই। সমাজতন্ত্র হলো সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পরবর্তী ব্যবস্থা। পুঁজিবাদের পর মানবজাতি সমাজতন্ত্রের চেয়ে বাস্তব এবং উৎকৃষ্ট কোনো ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই বিদ্যমান সামাজিক ধ্যান-ধারণা থেকে আপাতদৃষ্টিতে তাদের মনে হয়, সমাজতন্ত্রই হচ্ছে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সব দেশের অবধারিত ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। সমাজতন্ত্রের ধারণা, উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। ধনতান্ত্রিক জগতের অন্তর্বিরোধের ফলে কীভাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল এখানে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর্থিক অসাম্য ও বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য এবং ধনতান্ত্রিক মতবিরোধ থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে এ আদর্শের প্রচার শুরু হয়। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলে এ মতবাদ। সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবকে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির যুগ বলে অভিহিত করে সর্বপ্রকার নিপীড়ন ও দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তির আলোকবর্তিকা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দার্শনিকভাবে উপস্থাপন করেছেন তার মূলকথা হলো সম্পদের পুঁজিবাদী মালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের অপরিহার্য উচ্ছেদ। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরা মনে করেন, প্রলেতারীয় শ্রেণিসংগ্রামের ভেতর দিয়ে শ্রেণিবৈষম্য দূর হবে এবং সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যর্থতা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীরা এখনও মনে করেন সমাজতন্ত্র কখনো বিলুপ্ত হবে না। তাদের এরুপ মনে করার পিছনে রয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চলমান বৈশ্বিক সংকট।

বিশ্বায়নের মুখে গণতন্ত্র, জাতিরাষ্ট্র, জাতীয় সংস্কৃতি আজ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সামাজিক নিরাপত্তা, সার্বজনীন কল্যাণ, সুষম বন্টন, ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণার মূল উপাদান। যুদ্ধত্তোরকালের পৃথিবীতে যে কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলেই আধুনিক পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্রের সমন্বিত অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়েছিল। এই ধারণাই পুঁজিবাদের পক্ষে একটি আপাত স্থিতিশীল ও বিশ্বব্যাপী সমর্থন সম্ভবপর করে তুলেছিল। ইতিহাসের এই অধ্যায়টিকে সবসময়ই পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ধারণাটি নির্ভরশীল মূলত উদারনৈতিকতার নীতি এবং রাজনৈতিক দলের ভাবাদর্শের ইতিহাসের ওপর, যেখানে স্বাধীনতা ও সমতার ধারণা নিহিত থাকে। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলোকে অপসারণ করে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বুর্জোয়াদের শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে প্রোলেতারিয়েত সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস যে রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন তা সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণি শাসিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নয়, তা হলো এক শ্রেণিহীন, শোষণহীন সাম্যবাদী অবস্থা। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে এবং মার্কসের তত্ত্বকে প্রয়োগ করে লেনিন যে রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা পত্তন করেন তা হলো সাম্যবাদী সমাজ পত্তনের পথে এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধুনিকতার কালপর্বে এসে আমরা যেন নির্ভরযোগ্য নতুন বৃত্ত খুঁজে পাই সে সম্ভাবনা খুঁজতে হবে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। ভবিষ্যতের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে শেষ অধ্যায়ে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এদের যে ব্যর্থতা ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে, তাতে খুব সহজেই ধরে নেয়া যেতে পারে যে এগুলো হয়তো আর কখনই তার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হতে পারবে না এবং আমাদেরকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ উপহার দিতে পারবে না। সামজিক বৈষম্য ও অসমতাই সামাজিক সংকটের মূল কারণ। মানুষ চায় স্বাধীনতা, মানবিকতা ও মানবিক মুক্তির নৈতিকতার ধারণা নিয়ে এগিয়ে যেতে। আর এজন্যই মনে হয় একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শই হলো যথার্থ আদর্শ যার ভিত্তিতে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যেখানে ব্যক্তির মানবিক স্বাধীনতা থাকবে। কাজেই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজই হয়তো হবে বিশ্ববাসীর ভবিষ্যৎ। কিন্তু উদারনৈতিক গণতন্ত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির রাজনৈতিক রূপ। তাই সংকট থেকেই যাবে। এ সংকট থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে কাংখিত ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাবে গণতন্ত্রকে বরাবরই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে দেখা যাচ্ছে। এজন্য গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ যেমন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্বারোপ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা, আন্তদলীয় ও অন্তদলীয় সহিংসতা দূর, গণতন্ত্রের স্বার্থে শাসনব্যবস্থার সংস্কার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রাধান্য রক্ষা করা, গণতন্ত্র ও প্রবৃদ্ধির সমান্তরাল ধারা বজায় রাখা, জাতীয় সংহতির সর্বাধিকার, কর্তৃত্ববাদের অবসান, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, বিশ্ব মানবতার বিপর্যয় রোধ, বাণিজ্য যুদ্ধের অবসান, গণতন্ত্রের নিজস্বতা রক্ষা, জনগণের কাছ থেকে গণতন্ত্র রক্ষা, সাম্রাজ্যিক উচ্চাকাংখা পরিত্যাগ, উদারনৈতিকতার পতন ঠেকানো, সংকুচিত গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার, অখন্ডতার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ইত্যাদি পূরণের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাংখিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অনুমোদনপত্র	i
ঘোষণাপত্র	ii
কৃতজ্ঞতা	iii
সারসংক্ষেপ	iv-vii
সূচিপত্র	viii-xii

প্রথম অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক পর্যায় থেকে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবর্তন	১-৩১
১. ভূমিকা	১
২. সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়	৩
৩. সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ	৫
৪. সমাজে শ্রেণিবিভাগ ও বৈষম্যের সূত্রপাত	৭
৫. সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি, বিকাশ ও পতন	৯
৬. বাণিজ্যিক অর্থনীতি এবং বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ	১১
৭. পুঁজিবাদের উন্মেষ ও বিকাশ	১৩
৮. ট্রেড ইউনিয়ন গঠন	১৭
৯. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ	১৯
১০. সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ	১৯
১১. বিশ্ব পুঁজিবাদ ও এর সংকট	২৬
১২. ভবিষ্যতের সমাজব্যবস্থা	৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণতন্ত্রের উদ্ভব, স্বরূপ ও বিকাশ	৩২-৬১
১. গণতন্ত্রের উদ্ভব	৩২
২. গণতন্ত্রের স্বরূপ	৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৩. গণতন্ত্রের মানদণ্ড হিসেবে নির্বাচন ও সুশাসন ৩৮
৪. বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের অবস্থান ৪০
৫. গণতন্ত্রে বাক স্বাধীনতার গুরুত্ব ৪৫
৬. গণতন্ত্রে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা ৪৮
৭. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতি ৫০
৮. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা ৫২
৯. গণতন্ত্র ও উন্নয়ন ৫৬
১০. গণতন্ত্র চর্চায় নির্বাচন ৫৮
১১. গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ৬০

তৃতীয় অধ্যায়

পুঁজিবাদের উদ্ভব, স্বরূপ ও বিকাশ ৬২-১২০
১. পুঁজিবাদের উদ্ভব ৬২
২. পুঁজিবাদের স্বরূপ ৬৫
৩. পুঁজিবাদ বিকাশের ধাপসমূহ ৬৭
৪. পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পর্কিত ওয়েবারের তত্ত্বের বিশ্লেষণ ৬৮
৫. পুঁজিবাদী শ্রম প্রক্রিয়া ৭৪
৬. পুঁজিবাদী উৎপাদন ও পুঁজির সঞ্চয় ৭৭
৭. পুঁজিবাদী উৎপাদন ও সঞ্চয়ের বর্ণনামূলক-ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ৮১
৮. উৎপাদন সম্পর্কের সামাজিক স্তর ৮৩
৯. পুঁজিবাদী পণ্য বিনিময় নিয়ম ৮৭
১০. শ্রম, মূল্য ও পুঁজি ৮৮
১১. শ্রমশক্তির নৈতিক বিবেচনা ৯০
১২. উদ্বৃত্ত মূল্য, শোষণ ও মুনাফা ৯২
১৩. পুঁজিপতি ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক ৯৭
১৪. পুঁজিবাদে শ্রমিকের বিনাশ ৯৯
১৫. উদ্বৃত্ত মূল্য ও শ্রম শোষণ ১০১
১৬. পরিবেশের ওপর পুঁজিবাদের প্রভাব ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

১৭. পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদ ১০৭

১৮. পুঁজিবাদী শোষণ ১০৯

১৯. মানবিক স্বাধীনতা ও পুঁজিবাদ ১১২

২০. পুঁজিবাদী অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতা ১১৭

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজতন্ত্রের উদ্ভব, স্বরূপ ও বিকাশ ১২১-১৭৭

১. সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ১২১

২. সমাজতন্ত্রের স্বরূপ ১২৫

৩. সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা ১২৭

৪. সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণি কাঠামো ১৩১

৫. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দর্শন ১৩৩

৬. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলাফল ১৩৭

৭. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মুক্তির ধারণা ১৪০

৮. অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলাফল ১৪৫

৯. পরিবেশের ওপর সমাজতন্ত্রের প্রভাব ১৪৮

১০. পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ১৫১

১১. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কিত পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ ১৫৩

১২. সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির অবক্ষয় ১৫৬

১৩. কাঙ্খিত উন্নয়নে রাশিয়ার ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ ১৫৭

১৪. সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রধান দ্বন্দ্ব ১৫৯

১৫. চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্র ১৬২

১৬. রাশিয়ার পুনর্জাগরণ ১৬৪

১৭. সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কিত কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা ১৬৬

১৮. সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতাবিষয়ক প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ১৬৯

১৯. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আলোকবর্তিকা ১৭২

২০. পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ১৭৮-২২৯

১. পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ১৭৮

২. স্বাধীনতার ধারণা ১৮১

৩. সংঘ ও শ্রমিক ইউনিয়ন ১৮১

৪. সামাজিক দায়িত্বশীলতা ১৮৩

৫. মূল্যবোধ ১৮৪

৬. ব্যক্তিগত সম্পত্তি ১৮৫

৭. শাসন ১৮৬

৮. রাষ্ট্রের ভূমিকা ১৮৮

৯. পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ১৮৯

১০. পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ইতিবাচক দিক ১৯১

১১. পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা ১৯৬

১২. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ২০১

১৩. মাও সেতুং এর নয়া গণতন্ত্র ২০৪

১৪. লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ধারণা ২০৮

১৫. প্রলেতারীয় গণতন্ত্র ২১১

১৬. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ইতিহাস ২১৬

১৭. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার দৃষ্টিভঙ্গি ২১৯

১৮. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথপরিক্রমা ২২১

১৯. সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সামঞ্জস্যতা ২২৪

২০. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রত্যাশা ২২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থা	২৩০-২৭১
১. বৈশ্বিক রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ	২৩৫
২. বিগত বছরগুলোর কয়েকটি প্রবণতা	২৩৭
৩. বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক ভূরাজনীতি	২৩৯
৪. জনতুষ্টিবাদের উত্থান	২৪১
৫. জনতুষ্টিবাদী শাসনের বিস্তার	২৪৪
৬. সাম্প্রতিককালে জনতুষ্টিবাদের বিস্তার	২৪৫
৭. বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ	২৪৭
৮. ফ্যাসিবাদের আগাম বিপদসংকেত	২৫০
৯. বিশ্ব মানবতার বিপর্যয়	২৫১
১০. সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থা	২৫৩
১১. যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য রূপরেখা	২৫৪
১২. গণতান্ত্রিক শাসনের বৈশিষ্ট্য	২৫৫
১৩. শাসনব্যবস্থার সংস্কার	২৫৬
১৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠা	২৫৭
১৫. গণতন্ত্র ও প্রবৃদ্ধি	২৫৮
১৬. রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতন্ত্রায়ণ	২৫৯
১৭. কর্তৃত্ববাদের অবসান	২৬১
১৮. রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা	২৬৩
১৯. গণতন্ত্র রক্ষায় করণীয়	২৬৬
২০. উদার বিশ্বব্যবস্থার ভবিষ্যৎ	২৬৯
গ্রন্থপঞ্জি	২৭২-২৮১

প্রথম অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক পর্যায় থেকে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবর্তন

১. ভূমিকা

সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের জীবনযাত্রার রীতি ছিল অনেকটা পশুর মতো। তারা এলোমেলো ও বিচ্ছিন্নভাবে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াত। তাদের কোনো স্থায়ী আবাসস্থল ছিল না এবং কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ ছিল না। খাবার সংগ্রহ ছিল তাদের একমাত্র কাজ। খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা বন-জঙ্গল যেখানে যেত সেখানেই রাত কাটাত। কিন্তু এভাবে যেখানে-সেখানে রাত কাটানো ছিল মানুষের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। মূলত নিরাপত্তার প্রয়োজনেই তারা সংঘবদ্ধ হতে শেখে। এভাবে ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হতে হতে তারা স্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তোলে। এরপর তারা খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের দিকে মনোযোগী হয়। এভাবে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে সভ্যতা এবং মানুষ উন্নততর জীবনের ধ্যান-ধারণা লাভ করে। উন্নততর জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে তারা সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে উৎসাহী হয়। এভাবে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা জন্মলাভ করে; গড়ে উঠে সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। পরবর্তীতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করার জন্য মানুষ তৈরি করে বিভিন্ন নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ। সমাজ বা রাষ্ট্রকে পরিচালনার উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পরিচালনা ব্যবস্থার ধারণা লাভ করে। অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একচেটিয়া প্রাধান্য। পুঁজিবাদের কয়েকটি ঐতিহাসিক বিকল্প থাকলেও এর পক্ষে দুটি শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, অন্য যে কোনো পদ্ধতির তুলনায় পুঁজিবাদ দরিদ্রদের দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে অধিকতর ভালভাবে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের সত্যিকার সাফল্যের জন্য পুঁজিবাদ একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। আজকের পৃথিবীতে পুঁজিবাদের দুটি বিকল্প রয়েছে। একটি হলো সমাজতন্ত্র, যা উত্তর কোরিয়া, কিউবা, ভিয়েতনাম, চীন প্রজাতন্ত্র এবং অন্য দু-একটি স্থানে দেখা যায়। অন্যটি হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বে অনুসৃত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি। এটি দেখা যায় লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে এবং এশিয়ার বৃহদাংশে। এছাড়া অনেকে মনে করেন, জার্মানি ও স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসমূহে যে সামাজিক গণতন্ত্র চালু আছে তা হচ্ছে তৃতীয় বিকল্প। এ ধরনের সামাজিক গণতন্ত্র মূলত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রেরই একটি ধারা।

সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের পরে আসে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ প্রাথমিক, মধ্য ও শেষ স্তর অতিক্রম করে তার সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের দিকে এগিয়েছে। পুঁজিবাদের পরবর্তী পর্যায়ে আসে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যবর্তী স্তর হলো সমাজতন্ত্র।[১]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈষম্য, শোষণ ও বিচ্ছিন্নতার কারণে মানুষের আশানুরুপ কোনো উন্নয়ন ঘটেনি, বাড়েনি কোনোপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। সকল মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সমাজতন্ত্রও সফল হয়নি। সমাজতন্ত্রও পারেনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, ইউরোপীয় রেনেসাঁ আর চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথ ধরে। আধুনিকতার দুটি প্রধান উদ্ভাবন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ই নানা সাফল্য অর্জন করলেও বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দুটি মতবাদের ভাল দিকগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে মিশ্র অর্থনীতিভিত্তিক কল্যাণরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে প্রবল আশাবাদ নিয়ে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কার প্রভাবে তাহলে পৃথিবী চলছে? এক কথায় বলা যায় গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে পুঁজিবাদের প্রভাবে। এ বিষয়টা বুঝতে হলে জানা দরকার পুঁজিবাদ কী, সমাজতন্ত্রের সাথে এর দ্বন্দ্বটাই বা কী, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? এই দুই মতবাদের রাষ্ট্রদার্শনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও বিশ্বায়নের বিকল্প নিয়ে যে অনুসন্ধান ও তৎপরতা তার আলোকে ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থার একটি রূপরেখা অনুসন্ধান করা বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা রাষ্ট্র স্বীকৃত একচেটিয়া মালিকানা, অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্র কর্তৃক মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় পরিভোগ, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বর্তমান অর্থনৈতিক ভূমিকা, বিশ্বায়নের নামে পুঁজিবাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়গুলোকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাতিয়ার বলে গণ্য করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বিরাজমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির বিস্তার ও বিকাশ সংকটমুক্ত নয়। পুঁজির প্রাচুর্য যত বেশি হয় সংকটের ধরন তত তীব্র হয়। বিশ্ববাজার সৃষ্টির জন্য পুঁজিবাদীরা পৃথিবীকে ভাগাভাগি করে প্রকারান্তরে পুরো পৃথিবীটাকেই বাজার বানিয়ে ফেলেছে। আন্তর্জাতিকভাবে পুঁজি গঠনের এ অশুভ প্রতিযোগিতা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এমতাবস্থায়

[১] রতনতনু ঘোষ (সম্পা.), *পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪২৪।

পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে সমাজতন্ত্র নাকি অন্য কোনো ব্যবস্থার মধ্যে সংকট উত্তরণের পথ নিহিত রয়েছে তা সমসাময়িককালের রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিকদের রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে।

২. সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়

মানব সমাজের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা চিত্রিত করার জন্য ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকরা সামজিক বিবর্তনের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের এসব ব্যাখ্যা হতে আমরা জানতে পারি যে, বিভিন্ন সমাজের বা বিভিন্ন যুগের নামকরণ হয়েছে সে সময়ের জীবিকা অবলম্বনের বিশেষ উপায়, উৎপাদন কৌশল এবং অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে কেন্দ্র করে। দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরা তাঁদের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সমাজ ও যুগের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে এক সমাজ বা যুগ অন্য সমাজ বা যুগ থেকে একেবারে যে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন তা বলা যায় না। বাস্তবে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কালানুক্রমে পাশাপাশি কয়েকটি যুগের উপায়-উপকরণ সংরক্ষিত হয়, কতগুলো যুগের পর যুগ টিকে থাকে। সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা মূলত তিনটি পর্যায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। সেগুলো হলো- আদিম যুগ, বর্বর যুগ এবং সভ্যতার যুগ।

মানবজাতির উদ্ভবের সময় থেকেই আদিম যুগের আরম্ভ। এ সময়ের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ আদিম প্রবৃত্তির দ্বারাই চালিত হতো এবং ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত। ঐতিহাসিক যুগে অবশ্য এই অবস্থার কোনো মানবগোষ্ঠীর অস্বিত্ব মেলে নি।[২] আদিম যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে খাদ্য হিসেবে মাছকে গ্রহণ ও আগুনের ব্যবহার আরম্ভ হয়। শেষ পর্যায়ের আদিম যুগের আরম্ভ হয় তীর-ধনুক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে এবং শেষ হয় মৃৎশিল্প আবিষ্কারের মাধ্যমে। বর্বর যুগের প্রথম উপরিভাগের শুরু মৃৎশিল্প আয়ত্বের সাথে।[৩] এই যুগের মধ্যভাগে পৃথিবীর দুই গোলার্ধে দুই ধরনের সমান্তরাল উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব গোলার্ধে ঘটে পশুপালন এবং পশ্চিম গোলার্ধে ঘটে সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ। এই সময়েই দেখা যায় পোড়া ইট এবং পাথর দিয়ে গৃহ নির্মাণ।[৪] লোহার ব্যবহার আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে বর্বর দশার শেষ পর্যায় সূচিত হয়।[৫] এর পরবর্তী পর্যায়ে ধ্বনিসমৃদ্ধ বর্ণমালার উদ্ভাবন ও সাহিত্যমূলক রচনা সৃষ্টি হয়। আর এটাকে গণ্য করা হয় সভ্যতার উন্মেষের প্রস্তুতি হিসেবে। সভ্যতার পর্বে দেখা যায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের আরো উন্নততর প্রক্রিয়া এবং যথার্থ শ্রমশিল্প কলার জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।[৬]

---

[২] লুইস হেনরি মর্গান, *আদিম সমাজ*, অনুবাদ: বুলবুল ওসমান, অবসর, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬।
[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭।
[৪] *প্রাগুক্ত*।
[৫] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্র, *পৃথিবীর ইতিহাস*, মাটিগন্ধা, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৩২।
[৬] ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*, হাওলাদার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২১।

মানুষের আদিম সম্পত্তি হল তার আহার্য বস্তু। আদিম অবস্থায় খাদ্যবস্তুই ছিল তাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস। মানুষের খাদ্য বা সম্পদ আহরণ ও বৃদ্ধির উপায় ছিল হাতিয়ারের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিটি যুগে দেখা গেছে কিছু কিছু নতুন হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এবং তার ফলে সম্পত্তির বৃদ্ধি ঘটেছে। মানুষ নিজেদের আহার যোগানোর জন্য যেসব হাতিয়ারের আবিষ্কার করেছে, সেগুলোর অধিকার বজায় রাখা বা মালিকানা রক্ষা করার চেষ্টা চলাটা স্বাভাবিক। সম্পত্তি যত বাড়ে তত দেখা দেয় মালিকানার সমস্যা। এই মালিকানা ও উত্তরাধিকার নির্ণয়ের প্রথা সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই সম্পদের বৃদ্ধি ও বিকাশ সর্বদাই নির্ভর করেছে বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ওপর। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতির সঙ্গে এইসব আবিষ্কারের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে।

অর্থনীতিতে উৎপাদন, বন্টন, ভোগ, বিনিময়, চাহিদা, যোগান, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের যে ধারণা বিদ্যমান তা খুব একটা সুসংগঠিত আকারে না হলেও আদিম অবস্থা থেকেই মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আদিম অর্থনীতি ছিল জীবনধারণকেন্দ্রিক অর্থনীতি। এ অর্থনীতি মূলত সংগ্রহ কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। তখন মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ছিল প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত খাদ্য সরাসরি সংগ্রহ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। আদিম অর্থনীতিতে সম্পত্তি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। জীবজন্তু ও পশুপাখি শিকারের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রপাতিই ছিল মূল সম্পত্তি। এগুলো আবার ছিল যৌথ বা গোষ্ঠী মালিকানা ভিত্তিক। ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো ধারণা মানুষের মনে তখন স্থান পায়নি। তবে ব্যক্তি ব্যবহার্য সম্পত্তির অস্তিত্ব আদিম অর্থনীতিতে ছিল। জীবনধারণভিত্তিক এ অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়নি। প্রাপ্ত খাদ্যে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টাই ছিল খাদ্য সংগ্রহের ভিত্তি। আদিম অর্থনীতির ভিত্তিতে সমাজে কোনো শ্রেণি বৈষম্যের সৃষ্টি হয়নি। ভোগ, বন্টন, বিনিময় ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টির তেমন কোনো সুযোগই ছিল না। সমতার দর্শনভিত্তিক এ সমাজকে মার্কসবাদী দর্শনে আদিম সাম্যবাদ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পারস্পরিক বিনিময় ছিল আদিম অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ প্রথার মাধ্যমে দ্রব্য ও কাজের পারস্পরিক আদান প্রদান চলত। এতে সামাজিক সংহতি দৃঢ় হত এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক চাহিদা মিটত। পারস্পরিক বিনিময় পদ্ধতিতে লাভালাভের কোনো বিষয় জড়িত থাকত না। তবে প্রাপ্তির সমপরিমাণ প্রতিদান দেয়ার মানসিকতা পোষণ করা হত। আদিম সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক কোনোক্রমেই সামাজিক সম্পর্ক

থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। আদিম মানুষ একত্রিত হয়ে নিজেদের বাঁচার তাগিদেই কাজ করত। তাদের মধ্যে পারস্পরিক একটা অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতাবোধ ছিল। সে সময়ে মূলত সামাজিক প্রয়োজনেই যৌথ উৎপাদন এবং ভোগ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তখন অর্থনৈতিক সম্পর্ক সামাজিক সম্পকর্কে নির্ধারণ করেনি, বরং সামাজিক সম্পর্কই অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করেছে।

মানুষের সংগ্রহবৃত্তির বিভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন, শিকার-সংগ্রহ পর্যায়, পশুপালন পর্যায়, উদ্যান কৃষি পর্যায় এবং কৃষি পর্যায়। শিকার ও সংগ্রহ পর্যায় বলতে মূলত বোঝায় প্রাগৈতিহাসিক কালের জীবনধারণমূলক আর্থ-সামজিক অবস্থাকে। এ পর্বে মানুষের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জীবিকার সংস্থান। শিকার সংগ্রহের মাধ্যমে জীবন ধারণ বা টিকে থাকাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। মানবজাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পশুপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক পর্যায়। পশু শিকারের সময় যেসব বাচ্চা পশু ধরা পড়ত সেগুলো পোষ মেনে গৃহপালিত হয়। তৎকালীন সমাজে পশুপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বিকশিত হয়। উদ্যান কৃষিমূলক সমাজে পূর্বের তুলনায় উন্নত আর্থ-সামাজিক জীবন শুরু হয়। শিকার সংগ্রহ ও মৎস আহরণের পাশাপাশি নতুন একটা উৎপাদন কৌশলের সংযুক্তিতে খাদ্য নিরাপত্তা বেড়ে যায়। জুম চাষ পদ্ধতিতে ফল-ফলাদি ও বাগ-বাগিচার চাষ মানুষকে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে অধিকতর সমর্থ করে তোলে। কৃষি পর্বে এসে মানুষ জীবন-জীবিকার প্রধান উপায় হিসেবে ভূমি কর্ষণ ও শষ্য উৎপাদনকে বেছে নেয়। লাঙলের উদ্ভাবন, তাতে ফলা সংযুক্তি এবং কৃষিতে পশু শক্তির ব্যবহার রীতিমত কৃষি বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। ফলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন ঘটে।

৩. সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ

ফসল ফলানো এবং পশুপালন শেখার পর মানুষ নিজেদের জীবনধারার মধ্যে একটা যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা করেছিল। প্রকৃতির বুকে স্বাভাবিকভাবে যা পাওয়া যায় না, তা তারা উৎপাদন করতে শেখায় নিজেদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি খাবার তাদের হাতে আসতে শুরু করে। বাড়তি খাদ্যদ্রব্য মানুষের গোটা সমাজকে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। কয়েকটি নতুন আবিষ্কার সোজাসুজি মানুষের সমাজকে এগিয়ে দেয়। লাঙল, চাকা ও ধাতুর ব্যবহার শেখার মতো আবিষ্কারগুলো ছিল সে যুগের পক্ষে যুগান্তকারী ঘটনা।

খাবার সংগ্রহ নিয়ে মানুষের উৎকণ্ঠা যখন কমে যায়, তখন তারা কারিগরি ও বাণিজ্যিক ধরনের চিন্তা করার সুযোগ পায়। কারিগরি জ্ঞানের প্রসারক্ষেত্র এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে শহর গড়ে উঠেছিল। সভ্যতার বড় বিশেষত্ব শহর।[৭] শহরকেন্দ্রিক কারিগরি জ্ঞানের প্রভাবে মানুষের জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বিকাশে নানারকম মানসিক সহায়তা করে। বহু রকমের অর্থনৈতিক বৃত্তির চিন্তা, বাণিজ্যের প্রসার, শহুরে সংস্কৃতির আবির্ভাব, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি সভ্যতার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রাচীন সভ্যতাসমূহ গড়ে উঠেছিল মূলত কৃষি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। সভ্যতার প্রাক্কালে লোকেরা সমবেত হয়েই কৃষিকাজ করত। কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল জিনিসের ওপর সকলের সমান অধিকার ছিল। কৃষিজমি যৌথগ্রামের লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। প্রয়োজনবোধে জমির পুনর্বন্টনও করা হতো। উৎকৃষ্ট জমি প্রায়ই নেতা, পুরোহিত ও বৃদ্ধদের ভাগে পড়ত। এসব জমি তাদের বংশধরেরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেত। এগুলো তাদেরই থাকত। ফলে যৌথ পরিবারে অসমতা দেখা দিতে থাকে। ক্রমেই ধণী-দরিদ্রের সৃষ্টি হয়, গড়ে ওঠে শ্রেণি। শোষণ প্রথার উৎপত্তি হয়। সভ্যতার একটি বড় বিশেষত্ব হলো শ্রেণিশাসন। মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় এইরূপ রাষ্ট্রের জন্ম হয় সবার আগে।[৮]

সভ্যতার ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল মার্কস দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। একটি হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ এবং অপরটি হলো শ্রেণি সম্পর্ক। তিনি মনে করতেন, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রেণি সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। তাঁর মতে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণি সংগ্রাম অপরিহার্য। একটি বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থা এক বিশেষ ধরনের শ্রেণি সম্পর্ক গড়ে তোলে। শ্রেণি সম্পর্ক যে শ্রেণি সংগ্রামের জন্ম দেয়, তা-ই প্রচলিত সভ্যতার পরিবর্তন ঘটায় এবং নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করে। মার্কসের মতে সভ্যতার পরিবর্তনের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। সামাজিক কাঠামোয় অর্থনৈতিক বিষয়াবলির উপস্থিতিই ঐতিহাসিক ঘটনা সৃষ্টিতে মূল চালিকা শক্তির ভূমিকা রাখে। উৎপাদন, বন্টন এবং দ্রব্যের ব্যবহার ইতিহাস ও সভ্যতার গতি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিবেচিত হয়।

---

[৭] রেবতী বর্মন, *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৯।
[৮] *প্রাগুক্ত* পৃ. ৩২।

মার্কসের মতে উৎপাদন সম্পর্কে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের স্থান ও যন্ত্রের সাথে তার সম্পর্কের দ্বারাই সামাজিক শ্রেণি নির্ধারিত হয়। ইতিহাসে দেখা যায় আদিম কমিউন ব্যবস্থার ভাঙ্গন এবং দাস সমাজের উদ্ভবের সাথে সাথে সমাজে উদ্ভব ঘটেছে শ্রেণির। এ পর্যায়ে উৎপাদন শক্তি এবং শ্রম বিভাজনের উন্নতির ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব হয়, যা উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি করে। ফলে উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি শ্রেণির সৃষ্টি হয়। একটি উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং অপরটি শ্রমজীবী। অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মালিকগণই সর্বেসর্বা। পক্ষান্তরে, শ্রমজীবীগণ সবকিছু থেকে বঞ্চিত। ফলে উভয়ের মধ্যে শ্রেণি সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়ে। মার্কসের মতে, পরস্পর বিরোধী দুটি শ্রেণির সংগ্রামের ফলেই সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তন আসে। উৎপাদন শক্তির দ্বন্দ্বে সমাজ কাঠামোর বিকাশ ঘটে। এভাবে পর্যায়ক্রমে দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ ঘটেছে। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী সভ্যতার উত্থান ও পতনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

৪. সমাজে শ্রেণিবিভাগ ও বৈষম্যের সূত্রপাত

মানুষ অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা লাভের পর এবং কৃষির ব্যাপক প্রসারের ফলে কোনো এক সময় প্রাচীন যুগের দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কাজ করতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ কর্মবিভাগের সূচনা হয়। আস্তে আস্তে দলের কর্তা ও তার পরিবারবর্গ, দলের অন্যান্যদের চেয়ে একটি বিশিষ্ট শ্রেণি হয়ে দাঁড়ায়। দলপতি নিজের হাতে কেবল দল পরিচালনার ভারটাই রাখে। সে আর তার পরিবারের লোকেরা উঁচুস্তরের-এই ধারণা জন্মায়। অর্থাৎ তারা ভিন্ন আরেক শ্রেণির লোক হয়ে যায়। এভাবেই মানুষের সমাজে দুটি শ্রেণির সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ এক শ্রেণির কাজ ছিল, আদেশ করা ও কর্ম পরিচালনা করা; আর অন্য শ্রেণির কাজ ছিল শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কাজটি সম্পন্ন করা।[৯] অবশ্য যে শ্রেণির লোকদের হাতে পরিচালনার ভার ছিল, তাদের ক্ষমতাও বেশি ছিল। আর এই ক্ষমতার জোরেই তারা সম্পদের বড় অংশটা গ্রহণ করত। শ্রমিকদের কাছ থেকে বড় ভাগটা গ্রহণ করে তারা ক্রমে ক্রমে ধনী হতে থাকে।

আবার সমাজে কর্মবিভাগ যত প্রসার পেতে থাকে, তার সাথে সাথে আরো কতগুলো শ্রেণির উদ্ভব হয়। এসব শ্রেণিসমূহের প্রথমেই আসে দলপতি, তার পরিবার এবং পরিষদের দল। শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা এবং যুদ্ধের কাজ এরাই করত। এ ছাড়া তারা আর তেমন কিছু করত না। মন্দিরের সব পুরুত আর আনুষঙ্গিক সব কর্মচারীগোষ্ঠী হলো দ্বিতীয় শ্রেণি। এই পুরুতেরা আর

[৯] জওহরলাল নেহেরু, *পৃথিবীর ইতিহাস*, অনুবাদ: প্রবোধ চন্দ্র দাশগুপ্ত, বুক ক্লাব, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৮২।

তাদের সঙ্গীরা সমাজের মধ্যে একটি বিশিষ্ট শ্রেণি ছিল। তৃতীয় আরেকটি শ্রেণি হল সওদাগর। এরা ব্যবসার জন্য দ্রব্যসামগ্রী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত, দোকান খুলে কেনাবেচার কাজ করত। কারিগর নামে চতুর্থ আরেকটি শ্রেণির উদ্ভব হয়। এরা মানুষের প্রয়োজনীয় সব রকমের জিনিস তৈরি করত। আরেকটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হল কৃষক ও মজুর। কৃষকরা মাঠে কাজ করত, আর মজুররা শারীরিক পরিশ্রমের অন্যান্য কাজ করত। এই কৃষক ও মজুর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত লোকের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণির লোকদের কাছ থেকে এরা কখনোই উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেত না। সবাই চাইত এদের শোষণ করতে এবং করত।

আদিম মানুষের জীবনে কৃষিকর্ম ও পশুপালন ব্যবস্থা এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। কারণ এগুলোর ওপর ভিত্তি করে যে কর্মবিভাজন সূচিত হয়েছিল তাই কালক্রমে শ্রেণির ধারণা সৃষ্টি করে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটায়। গোত্রের সার্বজনীন বিষয় সম্পত্তি বিভক্ত হয়ে আলাদা-আলাদা পরিবারের বিষয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ফলে পূর্বে গোষ্ঠীভুক্ত সকলের মধ্যে যে সাম্য ছিল তা অন্তর্হিত হয়ে যায়। দলপতি আর গোত্রপ্রধানরা জমির বড় ও উর্বর অংশ নিজেরা নিয়ে নেয়। আবার যুদ্ধজয়ের ফলে অর্জিত ধনসম্পদের বেশির ভাগ তারাই গ্রাস করত। এভাবে দলপতি আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা ক্রমশ ধনী হতে লাগল এবং গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য সবাই তাদের তুলনায় গরিব হয়ে পড়তে লাগল। এভাবে গোত্রের যৌথ মালিকানার অবসান এবং মানুষের মধ্যে বৈষম্যের উদ্ভব হওয়ার কারণে আদিম মানুষের গোষ্ঠীজীবন ধ্বংস হয়ে যায়।

অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে মানব সমাজ যে শ্রেণিগত রূপ লাভ করে তা মানব আচরণের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সমাজের শ্রেণিগত উপাদান মানব আচরণকে প্রভাবিত করে অন্য একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দিকে ধাবিত করে। তাছাড়া সমাজের সদস্যদেরকে শাসনে রাখার জন্য নতুন একটা ব্যবস্থারও প্রয়োজন দেখা দিল। সৃষ্টি হলো রাষ্ট্রব্যবস্থা। শহর এবং রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পর মানুষের সামাজিক জীবনে যে বিপ্লব সূচিত হয় তার অনিবার্য পরিণতিতে রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার আবির্ভাব ঘটে। সমাজের শ্রেণিগত উপাদান রাজনৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করে। আবার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রচলিত শ্রেণিকাঠামো ও শ্রেণিবিন্যাস প্রভাবিত হয়।

৫. সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি, বিকাশ ও পতন

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ সমাজ বিকাশের একটি পর্যায় হলো সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো জমি। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের প্রাক্কালে জমিজমার নিয়ন্ত্রণ ছিল স্বল্প সংখ্যক বৃহৎ ভূস্বামীর হাতে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সন্নিহিত অঞ্চলের ভূমির ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে দূরবর্তী অঞ্চলের ভূমি জয় করার কাজে সচেষ্ট ছিলেন ক্ষমতাবানেরা। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল দূরবর্তী অঞ্চলের ভূমির চাষাবাদ নিয়ে। কারণ এগুলো নিজে তদারক করা যায় না। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনে প্রচুর খরচ হয় এবং অনেক সময় ফসল উৎপাদন অনেকটা লোকসানের হয়ে পড়ে। প্রশাসনিক ও সামরিক নানা ধরনের সমস্যাও দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ভূস্বামীরা দূরবর্তী ভূমির চাষ নিজেদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে না রেখে অন্য কোনো ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ, শস্যাংশ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার রীতি চালু করে। আর এভাবেই জন্ম নেয় সামন্তপ্রথা। এ প্রথায় ভূমিই হয়ে পড়ে সম্পদ সৃষ্টির প্রধানতম মাধ্যম। অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভূস্বামীদের হাতে চলে যাওয়ার অনিবার্য ফল হিসেবে শাসন ক্ষমতাও ভূস্বামীদের করায়ত্ব হয় এবং তারা রাজা হয়ে বসেন। রাজা তার ভূমি যাদের মধ্যে বন্টন করে দেন তারা হয়ে পড়েন রাজার অধীনস্ত ও কর প্রদানকারী সামন্তপ্রভূ। এভাবে সমাজ বিকাশের ধারায় ভূমিকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী এক বিশেষ ধরনের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে যা সামন্ততন্ত্র নামে পরিচিত। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় গরিব কৃষকদের অভিহিত করা হতো 'দেউলিয়া' নামে।[১০]

সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়, আবার বিশেষ কোনো কারণে তাৎক্ষণিকভাবে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়নি। এটাকে মানব সমাজের বিকাশের একটি পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বিভিন্ন জায়গায় ভূস্বামীরা বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামন্তপ্রভূদের সন্তুষ্ট রেখে সামন্তপ্রথাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ব্যবস্থাপনার এসব ধরনগুলো আস্তে আস্তে সুনির্দিষ্ট প্রথায় রূপান্তরিত হয়। এভাবে বিভিন্ন প্রথার মাধ্যমে সামন্তপ্রথা বিকাশ লাভ করতে থাকে। সামন্তপ্রভূদের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে রাজারা ভোগবিলাসের জীবন যাপনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সামন্তপ্রভূদের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে সামন্তপ্রথা দ্রুত বিকাশ লাভ করে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে একমাত্র নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে গড়ে

[১০] দেখুন, ইয়েকাতেরিনা আগিবালভা ও গ্রিগোরি দনস্কই, *পৃথিবীর ইতিহাস: মধ্যযুগ*, অনুবাদ: সুবীর মজুমদার, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৭।

ওঠে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শাসকদের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙ্গে যায় এবং সে সুযোগে সামন্তপ্রভূরা হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা। এমনকি চার্চ ও মঠসমূহের যাজকরা নিরাপত্তার বিনিময়ে জনগনের নিকট থেকে ভূমি গ্রহণ করে, সেগুলো আবার তাদেরকেই চাষাবাদ করতে দিয়ে ভূমিদাসে পরিণত করে। এভাবে চার্চ ও মঠসমূহ বিপুল সম্পদের অধিকারী হয় এবং এক একটি সামন্তপ্রভূতে পরিণত হয়।

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি নতুন অর্থনৈতিক জীবনের পত্তন ঘটায়। সমাজে তখন প্রধান স্থান হয় বণিক শ্রেণির, সামন্তপ্রভূর মর্যাদা অনেক কমে যায়। চার্চের নির্দেশ এবং ধর্মোপদেশ এ নতুন শ্রেণির কোনো কাজে আসে না। তারা বরং নিজেদের শক্তির ওপর অধিক আস্থাবান হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ের ব্যাপারে এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে অন্য কারও হস্তক্ষেপ তারা সহ্য করতে পারত না। এই সময়েই আবার অধিকাংশ কৃষক ভূমিদাসপ্রথা হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন কৃষকের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু পণ্য বিনিময় এবং টাকার প্রচলন হওয়ায় তাদের দুর্গতি আরও বেড়ে যায়। তারা আরও বেশি শোষিত হতে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে কৃষকদের মধ্যেও বড় কৃষক, গরিব কৃষক এরূপ স্তরভেদ দেখা দেয়। পণ্য বিনিময় এবং ব্যবসার প্রসারের ফলে সমাজে বণিক শ্রেণির প্রভাব ও গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পায়। কৃষক এবং কারিগরই শুধু নয়, অনেক সামন্তপ্রভূও এদের পুঁজির চাপে ভেঙ্গে পড়ে। শহরগুলোর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব যথার্থই এই শ্রেণির হাতে চলে যায়। নতুন নতুন শ্রেণির অভ্যুদয়, এক শ্রেণি আরেক শ্রেণিতে পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে সামন্ত ব্যবস্থার রূপান্তর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে নতুন নতুন শ্রেণি গড়ে ওঠে, শ্রেণিসংঘর্ষও তীব্র হয়।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় ও গতিহীন করে ফেলেছিল। সামন্ত প্রথার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলোই জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন মেটাত। মানুষের সর্বাঙ্গীন কর্মকান্ড এ সীমিত গন্ডির মধ্যেই আবর্তিত হতো। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই যেন ছিল না। তাদের নিজেদের অধিকার এবং সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতির ব্যাপারে কোনো খবর জানার সুযোগও তাদের ছিল না। সামন্ত সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতি ছিল হতাশাব্যঞ্জক। নতুন কোনো রাজনৈতিক ধারণার প্রবেশ ও প্রয়োগ সামন্ত সমাজে ছিল না। অর্থনৈতিকভাবে এ সমাজ ছিল অপরিবর্তনীয় ও অনুন্নত। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ সামন্তপ্রভূরা গ্রহণ করেননি। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন বা উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগের কোনো ঝুঁকি সামন্তপ্রভূরা নিতেন না। তাদের আশু উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সম্পদ অর্জন করা যায়।

সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ছিল না বললেই চলে। সর্বোপরি তারা এমন কোনো পরিবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন না, যা সমাজে তাদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধাকে বিঘ্নিত করে। এর ফলে সমাজের অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

সাধারণ জনগণও এই প্রথার বিরোধী ছিল। তারা অভিজাত শ্রেণির হঠকারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা পছন্দ করতেন না। সাধারণ মানুষ এবং সামন্তপ্রভূর মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য তাদের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। এই বিভেদের ফলে পৃথিবীব্যাপী নানান বিদ্রোহ ও বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এইসব বিদ্রোহ ও বিপ্লব সামাল দিতে গিয়ে অভিজাতরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে নতুন নতুন বহু নগর গড়ে ওঠে। নগরজীবন পদ্ধতি শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে শ্রম দান করার সুযোগ বৃদ্ধি করে। কৃষিশ্রমিকেরা সামন্তদের এস্টেট ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন শ্রমিকের জীবন গ্রহণ করে। ফলে শ্রমিকের অভাবে সামন্তদের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। আবার নগরের জনগণের সম্পদ ও প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা সামন্তদের অত্যাচার ও অর্থলিপ্সা স্তব্ধ করে দিতে থাকে। এভাবে সামন্ততন্ত্রের পতন সূচিত হয়।

৬. বাণিজ্যিক অর্থনীতি এবং বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ

সামন্ততন্ত্রের পতনের পর ইউরোপের কয়েকটি নগরের ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে শিল্পোৎপাদন অগ্রগতি লাভ করে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের এলাকার মধ্যে পণ্যসমূহের আমদানী-রপ্তানির তৎপরতা সে সময়ের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তোলে। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি, কম্পাসের ন্যায় কতগুলো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উদ্ভাবন, ঘোড়ার ক্ষুরের নাল ও লাগামের ব্যবহার, নৌকাকে দ্রুতগামী করার পদ্ধতি আবিষ্কার, সড়ক মসৃণতর করার উপায় উদ্ভাবন ইত্যাদি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সহজতর করেছিল। এসব বাণিজ্যিক তৎপরতার ফলে নগরগুলোতে যথেষ্ট অর্থের সমাগম ঘটে যা ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পর অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক প্রশস্ত হতে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আনুকূল্যের ফলে বণিকদের হাতে প্রচুর অর্থ আসে। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য বা আন্তর্জাতিক পণ্য বিনিময়ের জন্য বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য মেলার মধ্য দিয়ে আমদানি ও রপ্তানির প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের ফলে কৃষি নির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে গড়ে ওঠে বাণিজ্যিক অর্থনীতি এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবন বাণিজ্যিক অর্থনীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে সমাজে একটি মধ্যবর্তী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি ছিল ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিক যারা শহরে (burgh) বাস করত এবং সে কারণেই তারা বুর্জোয়া নামে পরিচিত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে ব্যবসায়ী দল থেকেই আবির্ভূত হয়েছিল এই মধ্যবর্তী শ্রেণিটি। সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি এবং পুঁজির ধারণার উদ্ভবের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও পুঁজির অধিকারীগণ আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মৌল অংশে পরিণত হয়। বণিকের পথ অনুসরণ করে এ শ্রেণিটি সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও উৎপাদন বিকাশের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টির জন্য এ শ্রেণি দুটো কাজ করেছিল। এর একটি হলো কারখানার অভ্যন্তরে শ্রম বিভাগ যেটা ছাড়া ব্যাপক হারে পণ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। আর অন্যটি হলো শ্রমিকের হাত থেকে উৎপাদনযন্ত্রকে পৃথক করে সেটাকে পুঁজি বানানোর হাতিয়ারে পরিণত করা। বুর্জোয়া শ্রেণি সে যুগের সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের সুস্পষ্ট একটা স্থান গড়ে তুলেছিল। কিন্তু যেভাবে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল, সে তুলনায় এ স্থান ছিল সংকীর্ণ। অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশের সাথে সামন্ত ব্যবস্থার সঙ্গতি ছিল না। তাই সামন্ত ব্যবস্থার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণির সুদীর্ঘ সংগ্রাম শেষ হয়েছিল তিনটি বৃহৎ আন্দোলন ও বিপ্লবের মাধ্যমে। প্রথমটি হলো জার্মানির ধর্মসংস্কার আন্দোলন, চার্চের বিরুদ্ধে লুথার যে আন্দোলন চালান। লুথারের সংস্কার নীতি স্বৈরতন্ত্রের সাথে মানানসই একটা নতুন ধর্মমতের সৃষ্টি করে। লুথারের পাশাপাশি ক্যালভিন আরেক ধরনের ধর্মমতের কথা বলেন। তাঁর ধর্মমতের মধ্যে তাদের শ্রেণির স্বার্থের প্রতিধ্বনি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া অভ্যুত্থান হয় ইংল্যান্ডে। ক্যালভিনের ধর্মমতের মধ্যে একটা শ্রেণি তাদের জীবনাদর্শের প্রতিফলন দেখতে পায়। ইংল্যান্ডে এই অভ্যুত্থান জন্ম দেয় শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ফলে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা এক নতুন যাত্রার সূচনা করে। বুর্জোয়া ও অভিজাত মিলে এক নতুন শাসকশ্রেণি তৈরি হয় যাদের কাজ ছিল শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণ করা। ফরাসি বিপ্লবকে গণ্য করা হয় বুর্জোয়া শ্রেণির তৃতীয় অভিযান হিসেবে। ফরাসি বিপ্লবেই সর্বপ্রথম ধর্মের আবরণ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের আগ পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রের অতীত রীতিনীতির সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে নি। ফরাসি বিপ্লব সামন্ততন্ত্রের

শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলে। অর্থনৈতিক বিকাশের যে স্তরটিকে মার্কস পণ্যোৎপাদন আখ্যা দিয়েছেন, সেই স্তরটিতে মানুষের মধ্যে যেসব ব্যবহারিক সম্পর্ক ছিল তা অভিব্যক্ত হয়েছে রোমান আইনের মধ্যে, বিপ্লবের ফলে রোমান ব্যবহার বিধিতে আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক অবস্থার সাথে নিপুনভাবে খাপ খাইয়ে দেওয়ানী আইন রচিত হয়।[১১] বিপ্লব যে সময় ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনৈতিক বিজয় সুনিশ্চিত করে তোলে সেই সময়ে ঈংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। ফলে অর্থনৈতিক শক্তির ভারকেন্দ্র আর আগের জায়গায় থাকে না। অর্থনীতির এ নতুন ধরনের বিকাশের ফলে বুর্জোয়ার বিত্তের পরিমাণ ভূস্বামী ও অভিজাতদের বিত্তের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শিল্পপতি বুর্জোয়াদের প্রাধান্য চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. পুঁজিবাদের উন্মেষ ও বিকাশ

পুঁজিবাদ এমন একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে তোলার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা মুনাফা লাভের অবাধ স্বাধীনতা থাকে। এক বৈপ্লবিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামন্তবাদী সমাজ পুঁজিবাদী সমাজের রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ সামন্ত সমাজের কাঠামোগত ও গুণগত পরিবর্তনের ফলে পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব ঘটে। সামন্ততন্ত্রের পতনের ফলে উৎপাদন যন্ত্র তথা উৎপাদন কৌশলে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। পূর্বের ভূমিদাসরা মুক্ত শ্রমিকে পরিণত হয়, পণ্য উৎপাদন বেড়ে যায়। নগর ও বাজারের প্রসার ঘটে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। বাণিজ্যিক অর্থনীতির বিকাশ এবং শিল্পনির্ভর অর্থনীতি পুঁজিবাদী সমাজের উৎপত্তিতে এক প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদন উপকরণসমূহের ব্যবহারের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটা অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরির ধারণা এবং ভোগ্যবস্তু পছন্দ করে নেয়ার স্বাধীনতার ধারণা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎপত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিল্প বিপ্লবের পর উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা উদ্ভবের পাশাপাশি আবিষ্কার হয় নতুন নতুন প্রযুক্তির। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভ করা সহজ হয়। কাজেই পৃথিবীর অনেক দেশ ঝুঁকে পড়ে এই আদর্শের প্রতি। তবে সব কিছুর উর্দ্ধে ছিল অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ও শ্রমকে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পুঁজি বানানোর মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাও পুঁজিবাদের উদ্ভবের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে প্রচারের ব্যাপক সুবিধা হয়। এতে করে

[১১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।

মানুষ নিজের অর্থনৈতিক অবস্থান জানতে পারে, ভালমন্দ সহজে অনুধাবন করতে পারে। তাছাড়া নানা ধরনের যন্ত্রপাতির আবিষ্কার শিল্প কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়ক হয়। কৃষিভিত্তিক সমাজ ছেড়ে মানুষ শহর জীবনে বসবাস করতে শুরু করে। এভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি হতে থাকে এবং শুরু হয় পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল কথাই হলো, ব্যক্তি অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অবাধ সুবিধা পাবে। নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে অনেক মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ব্যবসায় প্রচুর লাভ হওয়ার ফলে তাদের হাতে সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠে। এই ব্যবসায়ী বা বণিক শ্রেণিই হলো পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণির পূর্বসূরী। বিদেশে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বণিক শ্রেণি হস্ত চালিত কারিগরদের এবং ছোট ছোট শিল্পের মালিকদের কিছু অর্থ যোগান দিতে থাকে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তারা সেগুলো অন্যত্র বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারে। প্রাথমিকভাবে তারা চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত উৎপাদন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

আগে যেখানে কারিগর এবং গৃহশিল্পীরা নিজেরা মালিক ছিল, যারা বাজারে অথবা দালালদের নিকট নিজেদের তৈরি জিনিস বিক্রি করত, তারা আস্তে আস্তে ব্যবসায়ীর বা পুঁজিপতির কারখানার শ্রমিক হয়ে যায়। তারা পুঁজিপতির নিকট তাদের নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। পুঁজিপতিরা একসঙ্গে বহু লোককে খাটায় বলে উৎপাদন হয় বেশি, সেই অনুপাতে খরচ অনেক কম হয়। একসঙ্গে কাজ করার ফলে নতুন একটা শক্তির উদ্ভব হয়, এটা শ্রমিকের সমষ্টিগত শক্তি। সমবেত কাজে উৎপাদন বাড়ে। তাছাড়া পুঁজিপতিরা তাদের কারখানায় শ্রমিকদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের কাজ সুনির্দিষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ এখন আর শ্রমিক কোনো জিনিসের পুরোটা একাই তৈরি করে না, একেকজন একেক অংশের কাজ করতে থাকে। ফলে উৎপাদনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এতে শ্রমিকেরা তাদের সর্বাঙ্গীন দক্ষতা হারিয়ে পুঁজিপতির ওপর ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পুঁজিপতিরা তাদের কারখানায় যখন মেশিনের প্রবর্তন করেন, তখন তারা শ্রমিককে পুরোপুরি আয়ত্বে এনে ফেলে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একটা সুসংগঠিত রূপ লাভ করে।

ব্যবসা হতেই প্রথম পুঁজির সঞ্চয় হয়। সে সময়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে শুধু পণ্য বিনিময়ই ছিল না; দেশজয়, দস্যুতা, লুণ্ঠন, শোষণ–এসবও ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিকেরা শ্রমিকের শ্রমশক্তি কেনে। নিজের কারখানায় শ্রমিককে দিয়ে সে পণ্য উৎপাদন করায় এবং

তা বাজারে বিক্রির জন্য পাঠায়। মালিক শ্রমের মূল্য হিসেবে যে মজুরি দেয়, শ্রমিক তা অপেক্ষা বেশি উৎপাদন করে। এ বেশি অংশটুকু মালিকের মুনাফা। এ রকম উৎপাদনকে বলা হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন। আর মালিক যে টাকা খাটায় তা হলো পুঁজি। একবার এ ধরনের উৎপাদন শুরু হলে মুনাফা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এ মুনাফা থেকে নতুন পুঁজির সৃষ্টি হয়। পুঁজিতন্ত্রের পূর্ণতম বিকাশ হয় ইংল্যান্ডে।[১২] ইংল্যান্ডের পর ইউরোপের অনেক দেশে নানা পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান দেখা দেয়।[১৩] পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে পুঁজিবাদ বিকাশের পর্যায়কে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ, শিল্প পুঁজিবাদ ও অর্থনৈতিক পুঁজিবাদ।

বাণিজ্যিক পুঁজিবাদঃ প্রাচীন ও সামন্ততান্ত্রিক যুগে এ ধরনের পুঁজিবাদের উন্মেষ ঘটে। গ্রিস, মিশর, রোম প্রভৃতি স্থানে বণিক দলের উদ্ভব ঘটে এবং তাদের প্রচেষ্টায় দেশ-বিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকতা লাভ করে। ব্যবসার ফলে সম্পদ সঞ্চিত হয় এবং মূলধন সংগঠনের সুযোগ লাভ ঘটে। বণিক ধনতন্ত্রের পর্যায়ে সামন্তপ্রভূরা ভোগ-বিলাসের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের ভোগ-বিলাস চাহিদা যতই বাড়তে থাকে, বণিক শ্রেণি ততই সেগুলোর যোগান দিতে থাকে। সামন্তবাদের শেষ পর্যায়ে বণিক শ্রেণি আইন করে জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৈধ বলে স্বীকৃত হওয়ার পর কেউ কারও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নৈপুণ্যের কারণে একদল লোক নিজেদের সম্পদ বাড়িয়ে ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে , অন্যদল নিঃস্ব হয়ে পড়ে। যন্ত্র ও কল-কারখানার মালিক হলো ধনী, আর যারা সে কল-কারখানায় উৎপাদন কাজে শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত হয় তারা গরীব শ্রেণি। এ দুটি শ্রেণির একটি হলো বুর্জোয়া, আর অন্যটি হলো প্রলেতারিয়েত। সামন্ততন্ত্রের শেষ দিকে সদ্যজাত বুর্জোয়া শ্রেণিই ছিল বৈপ্লবিক। এরাই সামন্ততন্ত্রের সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে পুঁজিবাদের জন্ম দেয়।

বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয় নৌ পথে প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে। অর্থাৎ যখন জাহাজ শিল্পের উন্নতি ঘটে তখন বণিকরা সমুদ্র পথে প্রচুর মালামাল ধারণক্ষম বাণিজ্যতরী বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় উপনিবেশ এবং উপনিবেশগুলো বিজয়ীদের দেশী পণ্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত হয়। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের প্রসারে কতিপয় আদর্শবাদী কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মধ্যযুগে মানুষ আদর্শ ও ধর্ম

---

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

[১৩] ইয়েকাতেরিনা আগিবালভা ও গ্রিগোরি দনস্কই, *পৃথিবীর ইতিহাস: আধুনিক যুগের সূচনাপর্ব*, অনুবাদ: সুবীর মজুমদার, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩০।

প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে গমন করত। এগুলো বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল।

শিল্প পুঁজিবাদঃ কারিগরি ও সাংগঠনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হওয়ায় কৃষি ও শিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এর ফলে একটি ভিন্ন প্রকৃতির আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে যা শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদ নামে পরিচিত। শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবকে কেন্দ্র করে। শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় এবং একটির পর একটি নতুন নতুন উদ্ভাবনের ফলে নতুন নতুন শিল্পের সৃষ্টি হতে থাকে। শিল্পের এ আবিষ্কার পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন সাধন করে। উৎপাদন কৌশল, কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যে সামগ্রিক অগ্রগতি সাধিত হয় তা অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণাতেও ব্যাপক পরিবর্তন আনে।

শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে নতুন অর্থনৈতিক দিগন্ত উন্মোচিত হয়। দেশে অসংখ্য কল-কারখানা, শিল্প ও যন্ত্র গড়ে ওঠে। ফলে সমাজে বিশাল একটা শ্রমজীবী শ্রেণির উদ্ভব হয়। মানুষ জমিজমা ছেড়ে শিল্প কারখানার দিকে বিপুলভাবে ঝুঁকে পড়ে এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ শিল্পভিত্তিক সমাজের দিকে মোড় নেয়। এ পর্যায়ে এসে কৃষি পেশার চেয়ে ব্যবসা ও অর্থ বিনিয়োগ সংক্রান্ত পেশা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ এবং আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত লাভজনক বলে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক উদারতা ছিল শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সামন্ততন্ত্রের যাবতীয় বেড়াজাল ছিন্ন করে এ পর্যায়ে এসে অর্থনৈতিক উদারতার নীতি গৃহীত হয় এবং বিপুল সম্পদ অর্জনের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিল্পভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রের যুগেই গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রভৃতি বিষয়ের বিকাশ সাধিত হয়।

অর্থনৈতিক পুঁজিবাদঃ শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে এসে অর্থনৈতিক পুঁজিবাদের যাত্রা শুরু হয়। লৌহের ব্যাপক ব্যবহার, ডায়নামা আবিষ্কার, পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার, ডিজেল ইঞ্জিনের আবিষ্কার, রসায়ন শিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তন, রাবারের ব্যাপক ব্যবহার, জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের আবির্ভাব, চিকিৎসাবিদ্যার প্রভূত অগ্রগতি, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আকাশযানের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো শিল্প বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। শিল্প বিপ্লবের এ পর্যায় যে কেবল কৌশলগত দিক থেকেই

প্রথম পর্যায়ের চেয়ে অগ্রসরমান তা নয়, বরং পুঁজিবাদের গঠনমূলক বিচারেও অগ্রসর। এ পর্যায়ে এসে বৃহৎ শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গড়ে উঠতে শুরু করে। এ সময়ে শিল্প পুঁজির স্থলে আবির্ভুত হয় লগ্নী পুঁজি এবং গড়ে ওঠে লগ্নী পুঁজিবাদ। এর ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে মৌলিক পরিবর্তনগুলো সাধিত হয় তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো : কোম্পানিগুলোর টাকা যোগানোর দায়িত্বে নিয়োজিত হলো ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো, পুঁজির বিপুল পুঞ্জীভূবন ঘটল, ব্যবস্থাপনা থেকে মালিকের পৃথকীকরণ ঘটল এবং হোল্ডিং কোম্পানির জন্মলাভ হলো। অর্থনৈতিক পুঁজিবাদের আবির্ভাবের ফলে শিল্পোৎপাদনের পুরাতন ধরনের উৎপাদনকারী পুঁজিবাদীদের স্থলে পুঁজি সরবরাহকারীদের বিজয় সূচিত হয়।

৮. ট্রেড ইউনিয়ন গঠন

শিল্প সমাজের গোড়ার দিকে যেমন উপযুক্ত পরিমাণ পুঁজির দরকার হয়েছিল, তেমনি দরকার হয়েছিল উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিকের। শিল্পভিত্তিক সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকদেরকে শিল্প-কারখানায় রোজ ষোল ঘন্টারও বেশি খাটতে হতো। একদিতে দীর্ঘ সময় খাটুনি, অন্যদিকে নামমাত্র মজুরি; তদুপরি নানা অজুহাতে জরিমানা ধার্য করে কম মজুরি প্রদান করে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের শোষণ করত। পুঁজিপতি মনে করত, শ্রমিকের শ্রমশক্তি সে কিনেছে, মেশিন তার সম্পত্তি, সুতরাং ইচ্ছেমত শ্রমিকদেরকে খাটানো যাবে। মেশিন আর মজুরদের মধ্যে কোনো পার্থক্য তারা করত না।

পুঁজিপতি শ্রেণি শ্রমিকদের মনে একটা ধারণা গ্রথিত করার চেষ্টা করতেন যে, বাধ্যতা, কঠোর পরিশ্রম ও শৃঙ্খলার অভ্যাস নৈতিক জীবনের সহায়ক। কিন্তু বেশিদিন শ্রমিকদেরকে ভুলিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। তারা প্রথমে সংগ্রাম শুরু করে খাটুনি কমানোর জন্য। তারা মনে করতে থাকে, মেশিন আসার আগে তাদের অবস্থা ভাল ছিল, তাদের স্বাধীন উপজীবিকা ছিল। তারা ধরে নেয়, মেশিনই তাদের প্রধান শত্রু। দলে দলে শ্রমিকেরা মেশিন ভাঙ্গার জন্য বের হয়। শুরু হয় মেশিন ভাঙ্গার জন্য আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের শত্রু মেশিন নয়, মেশিনের মালিক। মালিকরাই শ্রমিকদেরকে তাদের জীবনধারণের উপায়গুলো হতে বঞ্চিত করেছে। শ্রমিকেরা অচিরেই বুঝতে পারে যে, মেশিন ভেঙ্গে কোনো লাভ নাই, মালিকরাই তাদের জন্য কিছু করতে পারে। বহু শ্রমিক সংঘবদ্ধভাবে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে মালিকদের কাছে আবেদন করতে থাকে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না। অনেকে পার্লামেন্টের নিকট আবেদন করে; তাও উপেক্ষিত হয়। পরবর্তীতে শ্রমিকদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য কতগুলো আইন পাস হয়। কিন্তু আইন পাস করা, আর তা

কার্যকরী করা এক কথা নয়। শীঘ্রই শ্রমিকরা বুঝতে পারে যে, আইনের মধ্যে ফাঁক-ফোকর আছে। মালিক ও শ্রমিকের বিরোধের বিষয়গুলো আদালতে গড়ালে সবসময় রায় আসতে থাকে মালিকপক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করেই। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হতে শ্রমিকদের মধ্যে নতুন চেতনা জাগে যে, পার্লামেন্টের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার পেলেই তারা নিজেদের শ্রেণির প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে; তখন শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষাকারী আইন প্রণয়ন সহজ হবে। এই চেতনা হতেই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম হয়।

শ্রমিকেরা গণতন্ত্রের জন্য লড়তে শুরু করে, তারা মনে করতে থাকে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলেই তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে। শ্রমিক শ্রেণির দাবি অনুযায়ী, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় সত্য, কিন্তু শ্রমিকের ভাল বাসস্থান, উন্নত জীবন, উচ্চ মজুরি–কিছুরই তেমন ব্যবস্থা হয় না। ভোটের অধিকার খাটিয়ে তারা তাদের দাবী আদায় করতে পারে নি। কাজেই এসব দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলে। এসব সংগঠনই ট্রেড-ইউনিয়ন। শ্রমিকরা শ্রেণি-সচেতন না হওয়া পর্যন্ত, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যবোধ না জন্মানো পর্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির ওপর শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে উঠতে পারে নি। শিল্প বিপ্লবের পর সারা বিশ্বে ট্রেড-ইউনিয়নের ছোঁয়া লাগে। বহু শ্রমিক শহরে জড়ো হওয়ার সাথে সাথেই সংঘ গড়ে ওঠে। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ হওয়ার সাথে সাথেই শ্রমিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে, শ্রমিকরা শ্রেণিস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এভাবে শ্রমিকের সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে ট্রেড-ইউনিয়ন।

শ্রমশিল্পের আবির্ভাবের পর একটা সময়ে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। তাদের প্রধান দাবি ছিল, শ্রমের সময়কাল কমানো এবং মজুরি বৃদ্ধি করা। মালিকদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয় যে, শ্রমিকরা এ দীর্ঘ সময় কাজ করে বলেই মুনাফা সৃষ্টি হয়। এই সময়কাল কমিয়ে দিলে মুনাফা সৃষ্টি হবে না। কাজেই কল-কারখানা বন্ধ করে দেয়া ছাড়া মালিকের আর কোনো উপায় থাকবে না। অন্যদিকে শ্রমিকরা ট্রেড-ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হয়ে মজুরি বৃদ্ধির জন্য অব্যাহতভাবে ধর্মঘট করতে থাকে। শিল্পপতিদের পক্ষে অর্থনীতির পন্ডিতরা বলতে থাকেন যে, শ্রমিকদের ব্যক্তিগত মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। কেননা মোট মজুরির পরিমাণ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এই পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না। তবে মোট শ্রমিকের সংখ্যা কমালে জনপ্রতি মজুরি বাড়তে পারে। কিন্তু শ্রমিকরা বিশ্বাস করে না যে, তাদের দেওয়ার জন্য পূর্ব হতেই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ফান্ড রয়েছে। তারা এতেও বিশ্বাস করে না যে, ট্রেড-ইউনিয়নের মাধ্যমে তারা মজুরি বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে

শ্রমিক তার এখনকার খাটুনি দ্বারা যে উৎপাদন করে, তা থেকেই দেওয়া হয় মজুরি। অর্থনীতির পন্ডিতদের দেওয়া তত্ত্ব ছিল শ্রমিকদের স্বার্থের বিরোধী। শ্রমিকেরা উপলব্ধি করে যে, পুঁজিবাদী সমাজে তারা শ্রমের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। তাদের পক্ষে এ যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। সে নির্বিচারে শ্রম বিক্রি করে চলছে।[১৪] শ্রমের মাধ্যমে শ্রমিক যা উৎপাদন করছে তার সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকছে না এবং উৎপাদিত দ্রব্যে তার কোনো অধিকার থাকছে না। নিছক জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে সে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে মাত্র। তার শ্রম আসলে এক ধরনের পণ্য ছাড়া আর কিছু নয়। একদিকে উৎপাদিত দ্রব্য হতে শ্রমিকদের নিজেদের এই বিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণা, আর অন্যদিকে মালিকপক্ষের অব্যাহত শোষণ প্রবণতা থেকে শ্রেণিসংগ্রামের সূত্রপাত হয়।

৯. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ

আধুনিক বিশ্বের একটি অন্যতম রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার থাকলে সে রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত হয়। প্রাচীন পৃথিবীতে এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা হয়। তৎকালীন নগররাষ্ট্রসমূহ ছিল মূলত গণতন্ত্র ও প্রগতি বিরোধী। কিন্তু এথেন্স নগররাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র নিয়ে। অন্যান্য নগররাষ্ট্রের শাসকেরা যেমন মানুষের প্রভূ হয়ে তাদের সব অধিকার কেড়ে নিয়েছিল এথেন্সের শাসকেরা তা করেনি। তারা বরং ধীরে ধীরে মানুষের সব ধরনের অধিকার ফিরিয়ে দিতে থাকে।

এথেনীয় সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী শাসক ছিলেন পেরিক্লিস। এথেন্সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বর্ণযুগের সূচনা হয় তাঁর আমলেই। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সার্বজনীন অংশগ্রহণ পদ্ধতির ভিত্তিতে তিনি এথেন্সকে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর শাসনামলে শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এথেনীয়রা চরম উন্নতি সাধন করে। পেরিক্লিসের নেতৃত্বে আইন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। পেরিক্লিসের যুগেই এথেন্স একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১০. সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ

কোনো কোনো মহৎপ্রাণ ব্যক্তি শিল্পোত্তর সমাজের শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে নতুন সমাজের কথা ভাবেন। কিন্তু কিছু মানুষ ইচ্ছা করলেই একটা সমাজ বদলাতে পারে না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে

[১৪] হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৪৩।

নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগণ অনেকবারই নিজেদেরকে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, অনেক সময় চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু সবসময় সফল হননি। তারা সফল হয়েছেন কেবল তখনই, যখন সেই সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের কারণগুলো বিকশিত হয়েছে। সহজ কথায়, তখনই একটা সমাজ পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়ায় যখন সেই সমাজ পুরনো নিয়মে আর চলতে পারে না, সেখানে পরিবর্তনের শর্ত উপস্থিত হয়, যখন সমাজের বিকাশ সাধনের জন্য এবং পরিবর্তিত সমাজকে ধারণে সক্ষম নতুন শ্রেণির উদ্ভব হয়, নতুন বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সে রকম সময়ে পরিবর্তনকামী জনগণ যদি সঠিকভাবে সংগঠিত হন তাহলে পরিবর্তনমুখী সমাজ এবং মানুষের সক্রিয় ও সংগঠিত প্রচেষ্টায় পুরনো সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সমাজের উদ্ভব ঘটে।[১৫] শিল্পোত্তর সমাজেও কিছু মানুষ নতুন আর্থ-সামাজিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এর বাস্তব রূপ দিতে প্রয়াসী হন। পুঁজিতন্ত্রের বিলোপ সাধন করাই ছিল এই পরিবর্তনকামীদের প্রধান চিন্তা। পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে তারা দেখেছিলেন শুধু অন্যায়। তারা চাইতেন একটি পরিকল্পিত সমাজ যেখানে সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে। পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদনের যন্ত্রগুলোতে মুষ্টিমেয় মালিকদেরই একচেটিয়া অধিকার এবং তারাই ভোগ করে যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ। পরিবর্তনকামীরা মনে করেন, সকলের জন্য স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যদি উৎপাদনের যন্ত্র ও উপকরণগুলোকে সকলের সম্পত্তিতে পরিণত করা যায়। এই ধরনের চিন্তাই সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সূত্রপাত ঘটায় এবং এটাই ছিল পরিবর্তনকামী মানুষদের কল্পনা।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিকশিত রূপ আমরা লক্ষ্য করি কার্ল মার্কসের চিন্তাধারার মধ্যে। ইউরোপে সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে মার্কসের মতবাদ ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল।[১৬] তিনি পরিকল্পিত সমাজ এবং শ্রমিকদের অবস্থা পরিবর্তনের কথা বলেন। মার্কস উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সকলের সম্পত্তিতে পরিণত করার পক্ষে যুক্তি দেন। কিন্তু তাঁর মতবাদ পূর্বের ন্যায় কল্পনাশ্রয়ী ছিল না। ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার কোনো কাল্পনিক রূপ চিত্রিত না করে বর্তমান সমাজকে বিশ্লেষণ করে দেখার প্রতিই তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বর্তমান সমাজের অভ্যন্তরে যেসব শক্তি কাজ করছে এবং পরিবর্তনের শর্ত তৈরি করছে, সেগুলো তিনি শ্রমিক শ্রেণির সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক বিষয়গুলোই ছিল তাঁর চিন্তার মূল বিষয়। *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদনের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন।

---

[১৫] আনু মুহাম্মদ, *মানুষের সমাজ*, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৫।

[১৬] জওহরলাল নেহেরু, 'সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব' *সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে*, (সম্পা.) শরীফ শমশির, গণপ্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৯।

পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণ করে মার্কস এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। তিনি মনে করেন, পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কতগুলো শক্তি সক্রিয় হয়ে সমাজকে ভাঙ্গনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পুঁজিবাদী সমাজের সংঘবদ্ধ বৈপ্লবিক শ্রমিকরা পুঁজিতন্ত্রকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বানুসারে, সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসীয় অর্থনীতির প্রথম কথা হলো– পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি শ্রমিক শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দাস যুগে এবং সামন্ত যুগে ভূমিদাস ও শ্রমিকদের যেভাবে শোষণ করা হতো, পুঁজিবাদেও তাই করা হয়। তবে এখানে পার্থক্য হলো এই যে, পুঁজিবাদী শোষণের কাজটুকু করা হয় প্রচ্ছন্নভাবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, শ্রমিক স্বাধীন মানুষ। দাস কিংবা ভূমিদাসের মতো তাকে মনিবের জন্য খাটতে হয় না। শ্রমিক ইচ্ছা করলে কাজ করবে, না হলে করবে না। শ্রমিকরা মালিকের অধীনে চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করবে। কাজ করলে মজুরি পাবে, না করলে পাবে না। এখানে শোষণের কিছু নেই। এই আপাত ধারণার অন্তরালের বিষয়গুলো মার্কস তুলে ধরেন তাঁর 'উদ্বৃত্ত মূল্য' তত্ত্বটি দ্বারা। এই তত্ত্বটির মূল কথা হলো, পণ্য উৎপাদন করতে যে শ্রম দেয়া হয়, তা দ্বারাই নির্ধারিত হয় পণ্যের মূল্য। শ্রম বলতে মার্কস বুঝিয়েছেন সামাজিক শ্রম, একক ব্যক্তির শ্রম নয়। সামাজিক শ্রমশক্তির বিনিময় মূল্যই হলো উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধন-সম্পদ জমছে, বড় বড় উৎপাদকরা ছোট ছোট উৎপাদকদের গ্রাস করছে, উন্নততর যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে মালিকরা শ্রমিকদেরকে যখন তখন কর্মচ্যুত করছে, শ্রমিক শ্রেণির জনগণের দারিদ্র্য বাড়ছে। পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে তা হলো– উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বন্টনের নীতির মধ্যে। বহু লোক একত্রিত হয়ে সমষ্টিগতভাবে উৎপাদন করে, অথচ তাদের শ্রমের ফল আত্মসাতের মাধ্যমে ভোগ করে কেবল কতিপয় মালিক। সমবেত শ্রমের মাধ্যমে যা উৎপন্ন হয়, তা হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পুঁজিবাদের এই অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যই শ্রমিক ও মালিকের বিরোধের মূল কারণ। মার্কস তাঁর *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, 'বড় পুঁজিতন্ত্রী মালিক ছোট মালিকদের গ্রাস করে। কতিপয় মালিকের হাতে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয়; সঙ্গে সঙ্গে শ্রমপদ্ধতি সমষ্টিগত রূপ নেয়; ... এদিকে শোষণ, অত্যাচার ও দাসত্ব বাড়তে থাকে; কিন্তু একই সঙ্গে দেখা দেয় সংঘবদ্ধ শ্রমিকের বিদ্রোহ ....

পুঁজির কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সমাজতান্ত্রিক রূপ অবশেষে এমন একটা স্তরে এসে দাঁড়ায় যখন আর পুঁজিতন্ত্রী কাঠামোর মধ্যে এগুলো সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সমর্থ হয় না।'[১৭]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়া যেমন সমাজতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে, তেমনি উৎপাদনের ফলও যাতে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত হয়, সেই রকম সমাজের ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কস এবং এঙ্গেলস্। এই রকম সমাজে উৎপাদনের যান্ত্রিক উপকরণগুলোর মালিক হবে সমাজ অর্থাৎ উৎপাদনকারী শ্রমিকরা। উৎপাদনের যন্ত্র এবং উপকরণাদির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ হবে। এই পরিবর্তন আনবে শ্রমিক শ্রেণি। কেননা যে ব্যবস্থায় শ্রমিক তার যথার্থ অধিকার ও ভাগ হতে বঞ্চিত হয় , সে ব্যবস্থাকে ভাঙতে তো সেই চেষ্টা করবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মালিকের ব্যক্তিগত স্বত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শ্রমিকরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ চায়। সমাজের সব ব্যক্তিগত সম্পত্তিই শ্রমিকরা বিপ্লবের দ্বারা সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায়।

মালিকের এবং শ্রমিকের দ্বন্দ্বে রাষ্ট্র দাঁড়ায় মালিকের পক্ষেই। রাষ্ট্রের ক্ষমতা শাসক শ্রেণির স্বার্থেই নিয়োজিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে শ্রেণির প্রাধান্য, শাসনযন্ত্র সে শ্রেণির হাতেই। বিশেষ এক শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণিকে শোষণ করার জন্য সুসংহত ক্ষমতাই রাজনৈতিক ক্ষমতা। আমরা সাধারণত মনে করি, রাষ্ট্র শ্রেণির ধারণার উর্দ্ধে। সরকার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই প্রতিনিধি। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তিই পুঁজিবাদের মর্মস্থল। বস্তুত যতক্ষণ শ্রেণির অস্তিত্ব থাকবে, ততক্ষণ রাষ্ট্র শাসকশ্রেণিরই যন্ত্র। মার্কস এবং এঙ্গেলস্ তাই শ্রমিকশ্রেণিকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। এই প্রস্তুতির অর্থ হলো শ্রেণি হিসেবে সচেতন হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া এবং সামাজিক বিকাশের বিরাজমান স্তরটিতে নিজেদের ভূমিকা কী সে সম্পর্কে অবগত হওয়া। মার্কস মনে করেন, শোষণ অপসারণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ এবং শ্রেণি ও শ্রেণি শাসন নির্মূল করতে প্রস্তুত হওয়া শ্রমিকের কর্তব্য। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণেই এর ভাঙ্গন আসন্ন। কিন্তু যদি শ্রমিকরা প্রস্তুত না থাকে, তবে দেখা দেবে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। তারা যদি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাকে তবে এই ভাঙ্গন থেকেই দেখা দেবে সমাজতন্ত্র।

[১৭] রেবতী বর্মন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫।

পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে আবশ্যিকভাবে একটা প্রশ্ন জাগে যে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ কতদূর এবং কতটুকু সাফল্যের সাথে শ্রমিক শ্রেণির নানা সমস্যার সমাধান করেছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত দেশসমূহের শ্রম ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক ধরনের মিশ্র চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয়ভাবে আদর্শিক শ্রম ও অর্থনৈতিক সমতার অঙ্গীকার রয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অবশ্য স্থানবিশেষে এর সামান্য তারতম্য রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পুঁজিপতি ও শ্রমজীবীদের আলাদা করে রাখার মতো বিষয়গুলো বেশ ভালভাবেই মোকাবেলা করেছে। সেখানে অন্ততপক্ষে নীতিগতভাবে সমতাভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শ্রম বাজারে প্রবেশকে একটা সাধারণ প্রত্যাশারূপে গণ্য করা হয়, এমনকি দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকলের পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং স্বাধীন চলাফেরার অঙ্গীকার রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকার শ্রম শক্তির প্রজনন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যাপকতর দায়িত্ব গ্রহণ করে ।

মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের যে ধারাবাহিকতা, তা থেকে এ সত্য বেরিয়ে এসেছে যে, পুঁজিবাদের বাস্তব বিকল্প হচ্ছে সমাজতন্ত্র। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে সমাজতন্ত্রের বিকল্প ধরনের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজতন্ত্রের প্রধান ধারণাগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্রেণি বৈষম্য ও প্রতিযোগিতার বিপরীতে সমতা ও সহযোগিতা। নিজ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে একটি নতুন সমাজ গঠনে নিবেদিত এক সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে, সমাজে বঞ্চিত শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবল আশাবাদ নিয়ে সমাজতন্ত্রের উত্থান। সমাজতান্ত্রিক ধারণা ও মতবাদ বহু বছরের শোষণমূলক ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ। মানুষের মুক্তির আকাঙ্খা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বিপ্লবের ধারণার বিস্তারের সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ যত শক্তিশালী হয়েছে, এ মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মাত্রাও বিস্তৃত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ও অপপ্রচার তার কেন্দ্র হচ্ছে পুঁজিবাদী মুনাফার সুবিধাভোগী শ্রেণি। পুঁজিবাদের সুবিধাভোগীরা সমাজের বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাকচ করেন এবং বিদ্যমান ব্যবস্থাকেই সর্বোত্তম হিসেবে মানুষের কাছে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করেন। তারা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, শ্রমজীবীদের মুক্তির সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা

ইত্যাদির বিরুদ্ধে কখনো পরিষ্কারভাবে, কখনো প্রচ্ছন্নভাবে প্রচার চালান। এ ধারার মধ্যে দুটি প্রধান উপধারা লক্ষ্য করা যায়। এদের একটি হলো আধুনিকতাবাদী[১৮] ধারা, যার সমর্থকবৃন্দ পুঁজিবাদকে সর্বোত্তম হিসেবে উপস্থিত করে এবং বিদ্যমান গণতন্ত্র আর একচেটিয়া সংস্থার কর্তৃত্বাধীন মুক্ত অর্থনীতির ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এর বিপরীতে আরেকটি উপধারা হলো উত্তর আধুনিকতাবাদী[১৯] ধারা। আপাতদৃষ্টিতে আধুনিকতার বিরোধী হিসেবে উপস্থাপিত হলেও এই ধারা মূলত সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিরোধিতার প্রতিই বিশেষ মনোযোগী। উত্তর আধুনিকতাবাদীরা মনে করেন, সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রয়োগে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিজাত শ্রেণিসত্তাকে এত

---

[১৮] আধুনিকতা একটি দার্শনিক আন্দোলন যা উনিশ এবং বিশ শতকে পশ্চিমা সমাজে সুদুরপ্রসারী ও ব্যাপক রূপান্তরের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক প্রবণতা ও পরিবর্তনের সাথে সাথে উত্থান লাভ করে। যেসব ফ্যাক্টর আধুনিকতাকে বর্তমান রূপ দান করে তার মধ্যে শিল্পভিত্তিক সমাজ গঠন, নগরের দ্রুত বিকাশ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। আধুনিকতাবাদ আলোকায়নের চিন্তাধারার অভ্রান্ততাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অনেক আধুনিকতাবাদী ধর্মীয় বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে। অনেকের মতে, শিল্প বিপ্লব এবং বুর্জোয়া মূল্যবোধের প্রভাবের বিরুদ্ধে রোমান্টিকতাবাদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আধুনিকতাবাদের সূচনা হয়। তারা বলেন, আধুনিকতাবাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল উনিশ শতকের বুর্জোয়া সমাজকাঠামো এবং বিশ্বের প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা। আধুনিকতাবাদীরা প্রত্যাশা করেন, প্রতিনিধিত্বের প্রচলিত নিয়মগুলো ভেঙ্গে ফেলতে। তারা বিশ্বাস করেন, কাজের মাধ্যমে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য বর্ণনামূলক বিষয়বস্তু প্রকাশ করা উচিত। সাধারণভাবে আধুনিকতাবাদের অন্তর্ভুক্ত সেইসব লোকেদের কাজ ও সৃষ্টিকর্ম যারা অনুভব করেন ঐতিহ্যবাহী শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, দর্শন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, দৈনন্দিন কাজকর্ম এমনকি বিজ্ঞানও যেগুলো কিনা পুরোপুরি শিল্পায়িত সমাজের উত্থানের ফলে নতুন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সেকেলে হয়ে পড়েছিল। আধুনিকতাবাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আত্মসচেতনতা এবং সামাজিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য নিয়ে বিদ্রুপ, যা প্রায়ই কাঠামো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে নিয়ে যেত এবং শিল্প-সংস্কৃতি ও দর্শনে ব্যবহার করা পদ্ধতি ও উপকরণসমূহের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করত। আধুনিকতা স্পষ্টতই বাস্তববাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অতীতের কাজগুলোকে নতুন করে দেখা, লেখা, বিবেচনা ও বিদ্রুপ করে। কিছু ভাষ্যকার আধুনিকতাকে চিন্তার একটি ধারা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, এক বা একাধিক দার্শনিকভাবে সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমন আত্মসচেতনতা বা আত্মোল্লেখ যা সব নৃতাত্ত্বিক ও শিল্পকর্মের মধ্যে চলছে। বিশেষ করে পশ্চিমা জনগণ, যারা একে সমাজে চিন্তার প্রগতিশীল ভাবধারা বলে মনে করে, যা মানুষকে ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা প্রযুক্তির সাহায্যে তাদের পরিবেশ সৃষ্টি, উন্নয়ন ও পুনর্নির্মাণ করার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এদিক থেকে আধুনিকতাবাদ যা অগ্রগতিকে আটকে রাখছিল তা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে শিল্প ও বাণিজ্য থেকে দর্শন পর্যন্ত অস্তিত্বের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্বিবেচনাকে এবং একই দ্বারপ্রান্তে পৌছানোর জন্য নতুন উপায়ে তা প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্যে উৎসাহ দেয়। অনেকে আবার নান্দনিক আন্তঃদর্শন হিসেবে আধুনিকতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া এবং ফ্রেডরিক নিৎশে থেকে শুরু করে স্যামুয়েল বেকেট পর্যন্ত চিন্তাবিদ ও শিল্পীদের প্রযুক্তিবিরোধী ও নাস্তিবাদী দিকগুলো বিবেচনা করা হয়। যদিও কিছু কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে আধুনিকতা বিশ শতকেও অব্যাহত হয়েছে, অন্যদের মতে এটি বিলম্বিত আধুনিকতা বা উচ্চ আধুনিকতাবাদে পরিবর্তিত হয়েছে, যে জায়গা পরে উত্তর-আধুনিকতা দখল করে।

[১৯] উত্তর আধুনিকতাবাদ (Postmodernism) আধুনিকতাবাদবিরোধী একটি দার্শনিক আন্দোলনের নাম। বস্তুত উত্তর আধুনিকতার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা অর্থ নেই। তাছাড়া সমসাময়িক কিছু ধারণা যেমন 'পোস্টমর্ডান কন্ডিশন', 'রিএকশনারী মর্ডানিজম', 'কনজ্যুমার পোস্টমর্ডানিজম' ইত্যাদি বিবিধ ধারার অভ্যুদয়ে অবস্থা ঘোলাটে হয়ে পড়েছে। তবে অনুধাবনের স্বার্থে উত্তর আধুনিকতাকে কয়েকটি চরিত্র-লক্ষণের সমষ্টি হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উত্তর আধুনিকতাবাদের বৈশিষ্টের সুনির্দিষ্ট কোনো তালিকা নেই। ফলে কোনো উত্তর আধুনিক বিষয়ে সবগুলো লক্ষণের উপস্থিতি আশা করা যায় না। উত্তর আধুনিকতাবাদের একটি অন্যতম লক্ষণ অনাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো কিছুকে ধ্রুব বা আদর্শ মেনে শিল্প-সংস্কৃতি বা দর্শন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে উত্তর আধুনিকতাবাদী চিন্তাধারা পরিচালিত ও বিকশিত হয় না। এর বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট প্রকরণ ও কাঠামোকে আশ্রয় করে চিন্তা ও সৃষ্টির অভিলাশই আধুনিকতাবাদের পরম বৈশিষ্ট্য। এভাবে উত্তর আধুনিকতাবাদের সাথে আধুনিকতার তুলনা-বিচারের বিষয়টি সহজ হয়। এ থেকে উত্তর আধুনিকতার নিটোল একটি ধারণা পাওয়া হয়তো সম্ভব নয় তবে এই প্রতিতুলনা থেকে উত্তর আধুনিকতাবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, যার সাহায্যে শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে উত্তর আধুনিকতার লক্ষণবিচার সম্ভব। যেমন, জীবনানন্দের কাব্যে উত্তর আধুনিকতার লক্ষণসমূহ খুঁজে বের করা একটি কৌতুহলোদ্দীপক অনুশীলন হতে পারে। আমরা লক্ষ্য করি, জীবনানন্দ কবিতাকে নির্দিষ্ট কাঠামোর আবদ্ধতা, অর্থময়তা, উদ্দেশ্য-নির্ভরতা, নির্মাণের দায়, ব্যাখ্যাসমৃদ্ধির দাবী, যুক্তির শাসন, সমন্বয় প্রভৃতি থেকে সফলভাবে মুক্ত করেছেন। যা হোক, উত্তর আধুনিকতা বলতে বোঝায় সেই অবক্ষয় বা স্বেচ্ছাচারিতা থেকে উত্তরণের প্রয়াসকে, যে অবক্ষয় বা স্বেচ্ছাচারিতা দোর্দণ্ড প্রতাপবান আধুনিকতার আস্তাকুঁড়ে জন্ম লাভ করেছে। উত্তর আধুনিকতাবাদীদের মতে, আমরা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি আধুনিকতার কারণে। অবশ্য কোনো কোনো মহল, যেমন দৃষ্টবাদীরা এমন কিছু মনে করেন না। তাদের মতে, অবক্ষয় বিভিন্ন কারণে আসতে পারে, কিন্তু তাই বলে এর জন্য কেবল আধুনিকতাকে দোষারোপ করা যায় না। যদি করা হয়, তবে পরোক্ষভাবে যুক্তিবাদিতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদির মতো আধুনিক আলোককে নিভিয়ে ফেলা হয়। উত্তর আধুনিকতাবাদীরা আধুনিক পূর্ব সময়ের মিথ, উপকথা, লোকবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস ও দর্শনচর্চাকে সামনে রেখে পুনর্চর্চায় ব্রতী হতে আহ্বান করে।

বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে মানুষের অন্যান্য সত্তাগুলো উপেক্ষিত হয়েছে। উত্তর আধুনিকতা শেখায় যে, শ্রেণিস্বার্থ ও শ্রেণি সংগ্রামের মাপকাঠিতে প্রতিটি সামাজিক বিষয়কে বিচার করলে শ্রেণিসত্তার বাইরে মানুষের যে অন্য সত্তা আছে তাকে ভুলে যেতে হয়। মার্কসবাদে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী ভূমিকার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ, নেতৃত্ব, পার্টি, রাষ্ট্র, প্রলেতারিয়ান একনায়কত্ব ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি–এসব ধারণা সমাজতন্ত্রে এত বেশি গুরুত্ব পেয়েছে যে, অন্যান্য শ্রেণির স্বার্থ ও ভূমিকা অবহেলিত হয়েছে।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যেকার আদর্শের লড়াই যখন প্রচন্ড রূপ ধারণ করে তখন সমাজতন্ত্রের সামনে প্রধান প্রশ্ন ছিল যে, এসব বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক নেতারা সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও আকাঙ্খা বাস্তবায়নের উপযোগী নতুন সমাজ গঠনের পথ ধরে চলতে পারবেন কি-না? যাত্রা আরম্ভের সময় থেকেই সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি ছিল যে, সমাজতন্ত্র বাস্তব উপযোগী নয়। পুঁজিবাদের সমর্থকেরা জোর দিয়ে বলতে থাকেন যে, সমাজতন্ত্র যেসব আদর্শের কথা বলে তা শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু তা বাস্তবে কোনো কাজে আসে না। তারা প্রচার করতে থাকেন যে, সমাজতন্ত্রের অসম্ভব ও অবাস্তব আদর্শসমূহকে সম্ভবপর ও বাস্তব করে তোলার চেষ্টা কোনো ফল বয়ে তো আনবেই না, বরং তা কেবল সামাজিক ভোগান্তিই বাড়িয়ে তুলবে। সমাজতন্ত্র সার্বিকভাবে মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণতা দিতে পারে না। এ মতবাদ এত বেশি অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনার ওপর নির্ভরশীল যে, এটা মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান করবে না। তাছাড়া ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করে সবকিছুকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করার মত বিষয়গুলোও সমাজতন্ত্রকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী নয়। এদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ ত্রুটির কারণেই হোক, পরিবর্তন ও বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, কোনো না কোনো সময়ে তার পরিবর্তন ঘটে। সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বঞ্চিত শ্রেণির অর্থনৈতিক মুক্তির আশাবাদ নিয়ে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব হলেও এক সময় এর পতন ঘটে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতন্ত্র একটি অস্বাভাবিক ব্যবস্থা। সামাজিক সমতার আদর্শ নিয়ে সমাজতন্ত্রের পক্ষে টিকে থাকাটাই অস্বাভাবিক। স্বার্থপরতাই স্বাভাবিক, স্বার্থত্যাগ নয়। স্বার্থপরতাকে মেনে নিয়েই সমাজতন্ত্রের কথা আসে। বঞ্চিত মানুষ সমাজতন্ত্রী হয় নিজের স্বার্থেই। সমাজতন্ত্রী হওয়ার আগে সে আশা করে তার ভাগ্য বদলাবে, দুঃখের অবসান ঘটবে এবং সুখ আসবে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতার মূল কারণ এর অভ্যন্তরে, এই ব্যবস্থার অন্তর্গত উপদানসমূহ ও বৈশিষ্ট্যের ক্রমবিকাশের মধ্যেই তা পাওয়া যাবে বলে নব্য উপনিবেশবাদীরা[২০] মনে করেন। সমাজতন্ত্র মানব স্বভাবের বিকাশ বিরোধী এবং সাধারণ মানুষের মন-মনন-মনীষার বিকাশ প্রতিরোধী বলে তারা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন।

পুঁজিবাদী দেশগুলোর মুনাফা অর্জনকারীদের লোভের বেপরোয়া তাড়না প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহও এমন কোনো উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করতে পারেনি যা প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের সহায়ক বা অপচয় রোধে সক্ষম। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে উৎপাদন সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। ব্যক্তি মালিকানার জায়গায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা হয়, কিন্তু উৎপাদন কৌশলে কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটানোর কথা চিন্তা করা হয়নি। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অবস্থান ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনের দিকে এদের নজর দিতে হয়। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস বিনাশ করা হয়। বিশ্বব্যাপী এ সমস্যার বেড়াজাল থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বেড়িয়ে আসতে ব্যর্থ হয়। ভেতরে সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তির বিকাশ এবং বাইরে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার চাপ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ত্বরান্তিত করে। এক পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটে।

১১. বিশ্ব পুঁজিবাদ ও এর সংকট

অর্থনৈতিক পরাশক্তির অধিকারীরা কীভাবে তাদের লোভ-লালসার প্রকাশ ঘটায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলো বিশ্ব পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদ। অর্থনৈতিক শক্তির প্রকাশ হিসেবে শক্তিশালী দেশগুলো

---

[২০] নব্য উপনিবেশবাদ হলো রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করার এক প্রয়াস মাত্র। নব্য উপনিবেশবাদের কৌশলগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে সাথে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তার পাশাপাশি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও আদর্শ তৃতীয় বিশ্বের জনগণের কাছে পৌছে গিয়ে তাদের নিজস্ব ভাব-ভাবনাকে প্রভাবিত করে চলেছে। ফলে নব্য উপনিবেশবাদ বা সনাতন উপনিবেশবাদ উপনিবেশবাদের সাধারণ ধারণাগুলো থেকে অনেক বেশি ব্যাপক ও সংহারমূলক রূপ ধারণ করেছে। জে. এ. হবসন এ সাম্রাজ্যবাদী ধারণার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হবসন বলেন যে, নব্য উপনিবেশবাদের কোনো উচ্চতর লক্ষ্য ছিল না বা এর পক্ষে কোনো উচ্চতর ধ্যান-ধারণা পোষণ করা হতো না। অর্থনৈতিক লক্ষ্যই ছিল নব্য উপনিবেশবাদের মূল। হবসনের মতে, এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা মুনাফা ভোগ করে বহু মূলধন জমা করে। এর ফরে মূলধনের পাহাড় জমে যায়। এই মূলধন উপনিবেশে বিনিয়োগ করে আরো মুনাফা অর্জনের জন্য পুঁজিপতিরা তাদের নিজ দেশের সরকারকে উপনিবেশ দখলে প্ররোচনা দেয়, কখনও কখনও বাধ্য করে। দখলকৃত উপনিবেশের নতুন শিল্পে মূলধন লগ্নি করে পুঁজিপতি শ্রেণি মুনাফার পাহাড় জমায়। উপনিবেশের কাঁচামাল ও বাজারকে একচেটিয়াভাবে দখল করে তারা ফুলে ফেঁপে ওঠে। সুতরাং নব্য উপনিবেশবাদ বা নব্য সাম্রাজ্যবাদের মূল অর্থনৈতিক শিকড় ছিল উপনিবেশে লগ্নির জন্য বাড়তি মূলধনের চাপ। অর্থাৎ বাড়তি মূলধনের চাপই সাম্রাজ্যবাদী চেতনা বা উপনিবেশ দখলের মূল কারণ।

নিজেদের বাজারের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের বাজার দখল করে নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করে। সাধারণত অন্য জাতি বা সম্প্রদায় কর্তৃক অধিকৃত ভূখন্ড, আশ্রিত এলাকা বা প্রভাবাধীন স্থানে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং সেখানে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগগত সুযোগ-সুবিধা অর্জনের জন্য সরকার যন্ত্র এবং কূটনীতি প্রয়োগ করাই হলো বিশ্ব পুঁজিবাদ বা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রধান লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক শোষণ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেমন ক্ষমতা বলে অন্য দেশকে দখল করে নিজেদের অধীনে নিয়ে এসে শোষণ করতে থাকে, তেমনি অর্থনৈতিক পরাশক্তি অন্যান্য দেশের বাজার দখল করে অর্থনৈতিক শোষণ আরম্ভ করে। বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রধান অভিব্যক্তি হলো বৈদেশিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করা।

শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সময়ের প্রথম দিকে শিল্পের মালিকদেরকে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য বাজারের কথা ভাবতে হতো না, বরং কত শীঘ্র তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুসারে উৎপাদন করতে পারবে তাই ছিল প্রধান সমস্যা। কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে সে অবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। রাস্তাঘাট ও যানবাহনের সুবিধা হওয়ায় উৎপাদনের উপকরণগুলো যোগাড় করা অনেক সহজ হয়ে পড়ে। যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি হওয়ায় উৎপাদনের মাত্রাও বেড়ে যায়। অর্থাৎ উৎপাদন খরচ কমে যাওয়ার সাথে সাথে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই উৎপাদনের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। সকলেই স্বদেশের বাজার স্বদেশের উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য সংরক্ষিত ও নিরাপদ রাখতে চায়। প্রতিটি দেশই এজন্য বিদেশী দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপসহ নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও মুনাফা অর্জনকারীরা পণ্য উৎপাদন বন্ধ করে না, এমনকি উৎপাদন কমাতেও কেউ রাজী হয় না। ফলে শুরু হয় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় বৃহত্তর পুঁজি ছোট ছোট পুঁজিকে পরাভূত করে। প্রতিযোগিতায় ছোট উৎপাদন ধ্বংস হয়; হয় সেগুলো বড় পুঁজির সাথে মিশে যায়, নয়তো অন্তর্হিত হয়ে যায়। এত কিছুর পরও মোট উৎপাদনের পরিমাণ কিন্তু কমে না। উৎপাদনের কাজ পুরোদমে চালালে উৎপাদিত দ্রব্যের কাটতির জন্য প্রয়োজন বিদেশের বাজার। বাড়তি দ্রব্য যদি চালাতে হয় তাহলে বিদেশের বাজার দখল করা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। শুরু হয় বাড়তি মালের বাজার সৃষ্টির জন্য উপনিবেশ দখল। বাড়তি মালের বাজারের জন্য উপনিবেশ দখলের সময় হতেই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের বিকাশের চরম অবস্থা। সাম্রাজ্যবাদের যুগেই পুঁজিবাদ সমাজের বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সব রকমের অর্থনৈতিক বিরোধ এই সময়টাতে তীব্র হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন উদ্ভাবন পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যে

পুরোদমে বিকশিত হয় না এবং এগুলোর যথাযথ প্রয়োগও হয় না। কারণ যতক্ষণ উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে পুঁজিপতির ব্যক্তিগত মুনাফা, ততক্ষণ উৎপাদনের চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের যুগে পুঁজিপতিরা উন্নত ধরনের যন্ত্রের প্রবর্তন করে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। ফলে অগনিত শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এ সময়ে উৎপাদনশক্তি ব্যাপক আকারে বাড়লেও, সে অনুপাতে বিক্রি করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং অর্থনৈতিক সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে, শ্রেণিসংঘাতও তীব্র হয়।

সাম্প্রতিককালে বিশ্ব পুঁজিবাদের দুই ধরনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এর একটিকে বলা হয় নিয়ন্ত্রণবাদী[২১] এবং অপরটি নয়া-উদারতাবাদী[২২]। নিয়ন্ত্রণবাদীরা মনে করেন, সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণা দক্ষতার সাথে কাজ করে না। তবে তারা এই অদক্ষ বাজার ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও সহায়তায় চালু রাখার পক্ষে। অন্যদিকে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির ধারার সাথে সুর মিলিয়ে নয়া উদারতাবাদীরা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন বাজারের পক্ষে। এই দুই পক্ষই পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়ন ও সংকট সমাধান সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন।

---

[২১] দর্শনে নিয়ন্ত্রণবাদ কথাটি মূলত ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই মতবাদের মূলকথা হলো বিশ্ব ও মানবজীবনের সব কিছুই ভাগ্য দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়েই নিয়ন্ত্রণবাদী ধারণা বিকশিত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণবাদীরা বিশ্বাস করেন, সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন একটি চূড়ান্ত শক্তি আছে এবং এই শক্তি কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়কে এড়ানোর সাধ্য কোনো মানুষের নেই। তেমনিভাবে পুঁজিবাদীরা পুঁজির সর্বময় কর্তৃত্বের প্রকাশ ও প্রচার করেন। একটি রাষ্ট্র বা সমাজের সব কিছু, যেমন রাজনৈতিক, সামজিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের ধরণ, কাঠামো ও ক্রমবিকাশ এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ ও বিবর্তন মূলত নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্র বা সমাজে অবস্থিত অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ যেমন, উৎপাদনের উপায়সমূহ, উৎপাদন সম্পর্ক, বিনিময় ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর। কেউ কেউ এ মতবাদকে কার্ল মার্কসের মতবাদ বলে প্রচার করেন। তবে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, "...চূড়ান্ত বিচারে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের দ্বারাই ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয়ে থাকে–আমি বা মার্কস এর বেশি কিছু বলিনি।"

[২২] নয়া উদারতাবাদী প্রক্রিয়া আজ সারা পৃথিবীতে এক বিধ্বংসী পুঁজিবাদী সংস্কার প্রবর্তন করেছে যার সূচনা হয়েছে পশ্চিমের দেশগুলোতে গত শতকের আশির দশকে। এই প্রক্রিয়ায় সেজে ওঠা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের বাসস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলো আর পরিকল্পনার মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় না। যাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর অধিকারই এখানে মূলকথা, দরিদ্র বা নিম্নবিত্তের কাজ করে বেঁচে থাকার প্রশ্নটি একেবারেই গৌণ। সামাজিক ন্যায় ও বহু মানুষের কল্যাণের প্রেক্ষাপট এখানে দৃষ্টির অগোচরেই থেকে যায়। নয়া উদারতাবাদী প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নয়, এর একটি রাজনৈতিক দিকও রয়েছে। এর অর্থনৈতিক ভিত্তিটি হলো পণ্য ও পুঁজির অবাধ প্রবাহ, আর রাজনৈতিক লক্ষ্য হলো বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও আইনি-প্রক্রিয়ার বৈশ্বিকরণ। বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের আইনগত, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর উপস্থিতি বৈশ্বিক বাজার-অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে। সে কারণেই বহুজাতিক পুঁজির কার্যক্রমকে সহজতর করার জন্য বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বিভিন্ন দেশের জন্য একই ধরনের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি বা Structural Adjustment Programme (SAP) বাস্তবায়ন করেছে। মূলত এ সমন্বয় কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল : প্রথম পর্যায়ে অর্থনীতির উদারীকরণ (বাজার মূল্য ঠিক করা বা getting prices right); এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র ও এর প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করা (প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করা বা getting institutions right) যাতে বাজার অর্থনীতি যথাযথভাবে কাজ করতে পারে। অধিকাংশ দেশেই এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে গরিব ও শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রার মান নিম্নমুখী হয়েছে এবং চরম দারিদ্র্য, রাজনৈতিক সংঘাত, অস্থিরতা এবং অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে । এভাবে গত দশক কিংবা তারও বেশি সময় জুড়ে জাতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ, আধিরাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্ব, জাতি রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস, উদার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ব্যবস্থার জোয়ার এবং বিশ্বজুড়ে ভোক্তা সংস্কৃতির গঠন বিভিন্নভাবে পুরো বিশ্বকে অনেকটা একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়ার দিকে ধাবিত করেছে। ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের প্রভাব প্রশ্নাতীতভাবে জাতি রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস করেছে কিংবা জনকল্যাণমূলক কার্যাবলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সীমিত করেছে।

পুঁজির পুঞ্জিভবন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে পুঁজিবাদের প্রধান স্ব-বিরোধিতার রূপ অর্থাৎ বিকাশ ও মন্দার চক্র ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যে নয়া উদারতাবাদী পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার আগে নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের যুগে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন ও সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম পুঁজির পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ায় অতি উৎপাদনজনিত মন্দার ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে বলে দাবী করা হয়। কিন্তু এই একই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধিজনিত কারণে মুনাফা হ্রাসের কারণ হয়ে দেখা দেয়। যখন বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় ও বেকার শ্রমিকের সংখ্যা কমতে থাকে, তখন মুনাফা হ্রাস পায়। পুঁজিবাদের মন্দা নিয়ে কার্ল মার্কস তাঁর *পুঁজি* গ্রন্থের প্রথম খন্ডে যে আলোচনা করেছেন তার সাথে বিষয়টি সঙ্গতিপূর্ণ। তবে প্রকারান্তরে বেকারত্ব বৃদ্ধির ফলে মন্দা পরিস্থিতি নিজেই শ্রমিকের দরকষাকষির সক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে পুঁজিবাদকে সাময়িক মন্দা থেকে রক্ষা করে। কেবলমাত্র যদি এমন একটা পরিস্থিতিতে সরকার হস্তক্ষেপ করে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা হয় তাহলেই শ্রমিকের মজুরি হ্রাসের ঝুঁকি কমে যাবে। এটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাঝে শ্রেণিসংগ্রামের একটা সাধারণ চিত্র যা মুনাফার কতটুকু কে পাবে তা নিয়ে একটি চলমান দ্বন্দ্ব। তবে এর ফলে মজুরি বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির একটা চক্রও চলমান থাকে। এ পরিস্থিতি বিশ্ব পুঁজিবাদের জন্য বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করায় নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের পক্ষে সমর্থন ক্রমাগত কমতে থাকে ও ক্রমে নয়া-উদারতাবাদী পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নয়া-উদারতাবাদী অর্থনীতি অবশ্য পুঁজিবাদকে তার বিকাশ ও পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ার স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত করতে পারেনি। পুঁজিবাদ যখন তার সাম্রাজ্যবাদী রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন বহুজাতিক কর্পোরেশনের সামনে বিনিয়োগের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়। মূলত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের একটা নতুন মাত্রা আনয়ন করে। এছাড়া এসব প্রযুক্তির উৎপাদন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রটিও হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় বিনিয়োগ ক্ষেত্র। এর পাশাপাশি নতুন নতুন স্বল্প মজুরির শ্রম বাজার আবিষ্কার ও উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অভিবাসনের মাধ্যমে স্বল্প মজুরিতে কাজ করতে আগ্রহী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যুগে শ্রমের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির পথকে রুদ্ধ করেছে। শ্রমিকের অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক দুর্বল অবস্থান, রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের অতি সীমিত রূপ এবং পুঁজিপতির জন্য কর পরবর্তী মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা মুনাফার উর্দ্ধমুখী প্রবণতা ও স্থবির মজুরির একটা চরম বৈপরীত্য তৈরি করে। আপাতদৃষ্টিতে এটি পুঁজিপতির ও পুঁজির

আত্মস্ফীতির স্বর্ণযুগ মনে হলেও, এর প্রধান স্ববিরোধিতা হিসেবে উপস্থিত হয় মুনাফা বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত বিনিয়োগ ও তার ফলে সৃষ্ট বর্ধিত উৎপাদন বনাম স্থবির মজুরিপ্রসূত সীমিত ক্রয়ক্ষমতার বৈপরীত্য। এর ফলে দেখা দেয় অতি উৎপাদন এবং এ কারণেই নয়া-উদারতাবাদী অর্থনীতিকেও একইভাবে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ শর্তের ফলে সৃষ্ট মন্দা থেকে মুক্ত বলে ভাবা যায় না। এই নয়া মন্দার সূত্রটি হলো–মুনাফার উচ্চহারের বিপরীতে স্থবির মজুরির উপস্থিতি চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটায় যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিম্নগামী করে। বিশ্বমন্দার পর্যায়ক্রমিক উপস্থিতি ও নয়া উদারতাবাদী তত্ত্বের অসারতা আমাদেরকে পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে বিশ্বব্যাপী যুক্তিগ্রাহ্য কোনো নতুন মতাদর্শের কথা ভাবার দিকে ধাবিত করে।

১২. ভবিষ্যতের সমাজব্যবস্থা

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পুঁজিবাদী দেশসমূহ বেশ জোরের সাথে দাবি করে যে, সমাজব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদই ইতিহাসের শেষ কথা। পুঁজিবাদ থেকে ভিন্ন এবং উন্নততর সমাজব্যবস্থা উদ্ভবের সুযোগ নেই। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদ ফুকুইয়ামা ঘোষণা করেন যে, ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে; পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রই মানব সভ্যতার চূড়ান্ত কথা এবং এর থেকে উন্নততর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার চিন্তা নিরর্থক।[২৩] কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই দেখা যায় পুঁজিবাদী দেশসমূহ নানা দিক থেকে সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজিবাদের হৃৎপিন্ডে এখন আওয়াজ উঠেছে 'পুঁজিবাদ খতম করো'। ১৯৯৯ সালে আমেরিকার সিয়াটলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে শ্রমিক আন্দোলন ও গণবিক্ষোভের সূচনা হয়েছিল এবং ২০১১ সালের শেষ দিকে নিউইয়র্কে 'ওয়াল স্ট্রিট দখল করো' আন্দোলনে যেভাবে হাজার হাজার শ্রমিক, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ নেমে এসেছিল তারই ধারাবাহিকতা দেখা যায় 'পুঁজিবাদ খতম করো' আওয়াজের মধ্যে। এই আওয়াজ এই মুহূর্তে যতই দুর্বল ও সম্ভাবনাহীন মনে হোক না কেন, আশু ভবিষ্যতে এটাই পরিণত হবে এক প্রলয়ংকারী আওয়াজে। একই সঙ্গে এই আওয়াজের ইতিবাচক দিকও স্পষ্ট হবে। কারণ পুঁজিবাদ এখন আর সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে নিজের বৈশ্বিক অবস্থানই যে শুধু টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে চরম সংকটের মুখোমুখি তাই নয়,

[২৩] নজরুল ইসলাম, 'পুঁজিবাদের পর কী?' *সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র*, সংখ্যা ৮, জানুয়ারি ২০১৪, সমাজ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৯১-৯২।

পুঁজিবাদ নিজের দেশেও তার অবস্থান আর আগের মতো টিকিয়ে রাখতে পারছে না, এটাই বর্তমানে পাশ্চাত্যে চলমান পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের মূল বার্তা।[২৪]

সমাজ বিকাশের ইতিহাসে কোনো ভাঙন বা ভাঙনের বার্তা শেষ কথা নয়। ভাঙনের পর গঠনও এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই প্রশ্ন আসে, পুঁজিবাদের পর কী? পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত মূল দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত মালিকানা ও সামাজিক উৎপাদনের দ্বন্দ্বের কোনো সমাধান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়। তাহলে এই দ্বন্দ্বের সমাধান যে ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব তার নাম কি সমাজতন্ত্র? সত্যিই কি এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র একটি যথার্থ প্রস্তাব? একদিকে পুঁজিবাদ সম্পর্কে অসন্তোষ ও পুঁজিবাদ পরবর্তী কিংবা পুঁজিবাদ ভিন্ন অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার তাগিদ অনুভূত হচ্ছে; অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পতনের পর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সংশয়, এরূপ একটি দ্বৈত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সমকালীন রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিকদের সামনে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সামর্থ্য সম্পর্কিত নানাবিধ প্রশ্ন তাদেরকে ভবিষ্যতের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে একটা গোলকধাঁধাঁর মধ্যে রেখে দিয়েছে।

[২৪] দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের মুখে সমাজতন্ত্রের পদধ্বনি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩১৬-৩১৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়
গণতন্ত্রের উদ্ভব, স্বরূপ ও বিকাশ

১. গণতন্ত্রের উদ্ভব

জনজীবন সাধারণ মানুষের ইচ্ছার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে–এ ধারণা বিভিন্ন দেশ-কালে দেখা গেছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে এর এক ধ্রুপদী রূপ দেখা যায় এথেন্সে।[১] খিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শুরুতে সরকারি পদের জন্য সম্পত্তির যোগ্যতা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি এথেনীয় সমান অধিকারে সংসদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন এবং ভোট দিতে পারতেন। তারা সমাজের নীতি ও আইন প্রণয়নের কাজেও অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি পর্যায়ক্রমে জুরি হিসেবে প্রশাসনে সাহায্য করতে এবং প্রশাসনিক পরিষদের সদস্যও তারা হতে পারতেন। প্রথম থেকেই গণতন্ত্রের উদাহরণ সব দেশের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। আবার একই সময়ে এথেন্সের আর্থিক সমৃদ্ধি, নৌ-যুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব ও শিল্প-সংস্কৃতি-দর্শনে সৃজনশীলতা দেখা গিয়েছিল, যা থেকেও অনেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

সুমেরীয় নগর রাষ্ট্রেও প্রাচীন গণতন্ত্রের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিডাস বা প্রাচীন ইরানী জনগণের মধ্যে সাময়িকভাবে এথেন্সের অনুরূপ গণতন্ত্র বা মুষ্টিমেয় লোকের শাসন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পারস্যের মহান সম্রাট দারিয়ুস ঘোষণা করেছিলেন যে, উত্তম রাজতন্ত্র বা উত্তম গণতন্ত্র মুষ্টিমেয় লোকের শাসন ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম। তিনি এ ঘোষণা দেওয়ায় মুষ্টিমেয় লোকের শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে। আধুনিক পন্ডিতদের অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'গণতন্ত্র' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে।[২] প্রাচীনকালে ইউরোপের বাইরের কোনো সভ্যতায় গণতন্ত্র শব্দটি খুব বেশি একটা ব্যবহৃত হতো না। আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে বিশেষ করে আধুনিক নাইজেরিয়ায় 'ইগবো' বা 'ইবো' জাতির সরকারগুলো ছিল গণতান্ত্রিক ধাঁচের।[৩] কিন্তু পরে এসব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটে। সেখানে নাগরিকদের মধ্যে সমতা না থাকায় এ বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, এথেন্সে যে ধরনের সত্যিকার গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করেছিল, তার সঙ্গে আর কোনো নগর রাষ্ট্রের তুলনা করা যেতে পারে না।

---

[১] ডেভিড বিথাম ও কেভিন বয়েল, আলমগীর সিকদার লোটন (সম্পা.), *গণতন্ত্র ৮০ টি প্রশ্ন ও উত্তর*, আকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২১।
[২] ব্যারিষ্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার, *গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৪।
[৩] *প্রাগুক্ত*।

গণতান্ত্রিক উপায়ে নাগরিক সমাজের রক্ষণাবেক্ষণের ইতিহাস দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময়। মানুষের কর্মক্ষেত্র যত বিস্তৃত বা তার গভীরতা যতো সর্বমুখী হয়েছে, তার দূরদর্শিতা ততোই বাস্তবসম্মত হয়েছে এবং সুষ্ঠু নাগরিক সমাজ নির্মাণের উদ্দীপনায় মানুষ গণতন্ত্রের শরণাপন্ন হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ একমাত্র এখানেই নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারে। অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন মাত্রায় গণতন্ত্র এ সুযোগ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে এসেছে। আসলে মানুষ গণতান্ত্রিক ইতিহাসের প্রেরণা লাভ ও সূচনা করেছিল সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন স্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা না থাকলেও প্রাচীনকাল থেকে সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। কোনো কোনো দেশে সমানাধিকারের দার্শনিক ভিত্তির ওপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই গণতন্ত্র শব্দটিকে উদারতাবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে মনে করে।[৪] উদার গণতন্ত্রে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আইনের চোখে সমানাধিকার, অন্যায়ের প্রতিবিধানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানানোর অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং সুশীল সমাজ বিদ্যমান। একথা অনস্বীকার্য যে প্রাচীন গ্রীস হলো গণতন্ত্রের উৎপত্তিস্থল। তবে প্রাচীন রোম, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মতো অন্যান্য সভ্যতাও গণতন্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে মূলত মধ্যযুগীয় ইউরোপ, আমেরিকা ও ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে।

গ্রিক সভ্যতার যুগে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রিক নগররাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, তখন সেসব রাষ্ট্রের নাগরিকরা সরাসরি মতামত দানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করত বটে, কিন্তু নাগরিক বলতে তখন বোঝানো হতো শুধুমাত্র দাস-মালিকদের, যারা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ।[৫] আর জনসংখ্যার বাকি অংশ, অর্থাৎ ক্রীতদাসদের নাগরিক অধিকার তো দূরের কথা, ন্যূনতম মানবিক অধিকারটুকুও ছিল না। অর্থাৎ গ্রিক গণতন্ত্র ছিল সমাজের মাত্র ৬ শতাংশ মানুষের গণতন্ত্র।[৬] পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্রের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আধুনিক গণতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন মূলত সামন্তবাদের ভাঙন ও পুঁজিবাদের উদ্ভবের যুগের উঠতি পুঁজিপতি বা

[৪] ব্যারিষ্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার, *গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৫।
[৫] হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৪৭।
[৬] *প্রাগুক্ত*।

বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া দার্শনিকরা।[৭] বংশানুক্রমে ক্ষমতা ও আভিজাত্যের একচ্ছত্র অধিকারী সামন্ত প্রভূদের বিরুদ্ধে শিল্পবিপ্লবের ফলে উদ্ভূত নব্য ধনিকশ্রেণি বা বুর্জোয়ারা তাদের ক্ষমতা, আধিপত্য ও আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে প্রক্রিয়া হাজির করে, তারই নাম দেয়া হয় গণতন্ত্র। এই বুর্জোয়ারা বা নব্য ধনীরা ব্যাপক জনগণের কথা বলত, কারণ বংশানুক্রমে সামন্তবাদী শোষণের চাপে নিষ্পেষিত ভূমিদাসদের পক্ষে টানা ছিল বুর্জোয়াদের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য। বুর্জোয়াদের এ উদ্দেশ্য সফল হয়। তাদের নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণের সমর্থনে ও সক্রিয় অংশগ্রহণে সামন্তবাদের পতন হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র আসলে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোরই উপরিকাঠামো মাত্র।[৮] ফলে যেসব দেশে পর্যাপ্ত শিল্পায়ন ও পুঁজির বিকাশ ঘটেছে অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রবল সামাজিক শক্তি হিসেবে পুঁজিপতি শ্রেণির বিকাশ ঘটেছে, শুধু সেসব দেশেই কোনো না কোনো ধরনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। আর যেসব দেশে শিল্পায়ন ও পুঁজিবাদ পশ্চাৎপদ, সেসব দেশে গণতন্ত্রও কার্যত পশ্চাৎপদ বা অনুপস্থিত। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহ এবং কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশই তার প্রমাণ। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমালোচকরা বলে থাকেন, এই গণতন্ত্র আসলে ব্যাপক জনগণের নামে, ব্যাপক জনগণকে ব্যবহার করে, ব্যাপক জনগণের ভোট নিয়ে, মুষ্টিমেয় ধনীদের একচেটিয়া স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার।

২. গণতন্ত্রের স্বরূপ

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই গণতন্ত্রের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এর বিকাশের পথ ততটা মসৃণ নয়। রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র প্রাচীনকালের হলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শুরু বিশ শতকে। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিকরা তাদের রচনায় গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। পেরিক্লিস[৯] নাগরিকদের

---

[৭] *প্রাগুক্ত*।

[৮] *প্রাগুক্ত*।

[৯] পেরিক্লিস ছিলেন গ্রীক রাষ্ট্রনায়ক। গণতন্ত্র এই একুশ শতকে যে এখনো স্বমহিমায় টিকে আছে তার পেছনে পেরিক্লিসের অবদান অসামান্য। গণতন্ত্রের আদি পিতা ক্লিসথেনিস। সেই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার নায়ক এই পেরিক্লিস। রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর অবদানের ফলে এথেন্স হয়ে ওঠে গ্রিসের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর-রাষ্ট্র। অভিজাত বংশে জন্ম নেওয়ার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই তিনি গ্রিসের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। এরিস্টটলের মতে, তাকে রাষ্ট্রতত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বাকচাতুর্য শিক্ষা দিয়েছিলেন পাইথেক্লিদেস। জেনোর কাছেও তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন। তবে পেরিক্লিস যার কাছে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি হলেন এনাক্সেগোরাস। এরিস্টটল ও তাঁর ছাত্র আলেকজান্ডার দি গ্রেটের মতো এনাক্সেগোরাস ও পেরিক্লিস গ্রিক সভ্যতার শিক্ষক ও ছাত্রের পারফেক্ট কম্বিনেশনের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। এনাক্সেগোরাসের সুযোগ্য ছাত্র হিসেবে পেরিক্লিস রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দেবেন, এটাই স্বাভাবিক। প্লেটোর মতে, বিপুল প্রতিভার অধিকারী পেরিক্লিস প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করে উন্নত ধরনের বুদ্ধিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। পেরিক্লিস রাষ্ট্রের নাগরিকদের খুব কাছাকাছি থাকতেন এবং তাদের ইচ্ছামাফিক নীতি নির্ধারণ করেন। জনগণের খুশির জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নগরীতে সব সময় উৎসবের আয়োজন করতেন। তিনি জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত করেন। জনসাধারণ যাতে সরকারি পদগুলোতে দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী হয়, তাই তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে এসব পদে লোক নিয়োগ করে তাদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা দেওয়ার প্রথা চালু করেন। এথেন্স আদালতে বিচার কার্যে জনসাধারণ যাতে ন্যায়বিচার পায়, জুরিগণ যাতে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, সেজন্য জুরিদের উচ্চ বেতন-ভাতাসহ সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। রাষ্ট্রীয় সকল কাজে তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনের দ্বার উন্মোচিত করেন।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে 'জনমতের শাসন' বলে অভিহিত করেছিলেন।[১০] এরিস্টটল মনে করেন, প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেই তাকে গণতন্ত্র বলা যায়।[১১] বাস্তবে রাজনীতিতে সকলের অংশগ্রহণের বিষয়টি আসে অনেক পরে। বর্তমানে পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী, এমনকি স্বৈরশাসকগণও গণতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গণতন্ত্র একটি গতিশীল মতাদর্শ ও ভাবাদর্শ। আবার তা রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা।[১২]

গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের[১৩] মতে, জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশ শাসনের নামই হলো গণতন্ত্র।[১৪] তত্ত্বগতভাবে, গণতন্ত্রে জনগণের মতামত ও সংগঠনের অবাধ অধিকারকে স্বীকার করা হয়। আব্রাহাম লিংকনের মতে, গণতান্ত্রিক সরকার হলো সেই সরকার, যে সরকার জনগণেরই সরকার, জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত সরকার এবং জনগণের জন্যই গঠিত সরকার।[১৫] পরিবার, পাড়া, ক্লাব, কর্মক্ষেত্র, সমাজ ও রাষ্ট্র যাই হোক না কেন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা কোনো না কোনোভাবে এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব সংঘ সবসময় সামগ্রিক স্বার্থে কিছু না কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এগুলো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তগুলো মানুষ গ্রহণ করে থাকে পুরোপুরি নিজের স্বার্থে। গণতন্ত্র সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে পড়ে।[১৬] এর মূল আদর্শ এই যে, সমগ্রের খাতিরে যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা যেন সব সদস্য মিলে মেনে নেন এবং তাদের প্রত্যেকের যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে ভাগ নেওয়ার সমান অধিকার থাকে। গণতন্ত্রে তাই দুটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত–সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে জনগণের নিয়ন্ত্রণ এবং সে নিয়ন্ত্রণে সবার সমান অধিকার।[১৭] যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে যদি এই বিষয়গুলো বহাল থাকে তখন তাকে গণতান্ত্রিক বলা যায়।

গণতন্ত্র সভ্য সমাজের নিদর্শন এবং আধুনিক জীবন-পদ্ধতির অন্যতম দিকদর্শন। সার্বজনীন স্বাধীনতা, প্রগতিশীল ও আলোকিত জনগণের অভিমত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সম্ভব। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে গণতন্ত্র যেমন সম্মান করে, তেমনিভাবে সমগ্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা

---

[১০] রতনতনু ঘোষ (সম্পা.),'বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের গতিধারা', *গণতন্ত্র স্বরূপ সংকট ও সম্ভাবনা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৯।

[১১] *প্রাগুক্ত*।

[১২] *প্রাগুক্ত*।

[১৩] এথেনীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ও আইনপ্রণেতা সলোন, ক্লিসথেনিস থেকে শুরু করে এরিস্টটল, জন লক, উইলিয়াম পেন, ব্যারণ ডি. মন্টেস্কু, জ্যা জ্যাক রুশো, টমাস পেইন, টমাস জেফারসন, জে. এস. মিল, সুশান বি. এ্যান্থনি, এ্যামেলিন প্যাংকহার্স্ট, মিলিসেন্ট ফসেট, মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং প্রমূখ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ জনগণের ইচ্ছার প্রাধান্য দেন এবং মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন।

[১৪] হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৪৭।

[১৫] *প্রাগুক্ত*।

[১৬] ডেভিড বিথাম ও কেভিন বয়েল, আলমগীর সিকদার লোটন (সম্পা.), *গণতন্ত্র ৮০ টি প্রশ্ন ও উত্তর*, আকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৯।

[১৭] *প্রাগুক্ত*।

ও জবাবদিহিতার সুযোগ সৃষ্টি করে।[১৮] তাই পৃথিবীব্যাপি মানুষ শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই উন্নয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনার যথার্থ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। গণতন্ত্রকে বিবেচনা করা হয় প্রগতিশীল ও আলোকিত সরকারের প্রতিচ্ছবি হিসেবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, গণতন্ত্র হচ্ছে রাজনৈতিক চর্চার স্বাধীনতা, বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে নিশ্চয়তা দেয়ার সুযোগ।[১৯] খোলা মনে গণতন্ত্রের চর্চা, সংরক্ষণ ও শিক্ষার স্বার্থে নিয়মিতভাবে নির্বাচন, জনপ্রিয় পদ্ধতিতে ভোট দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার যেখানে বলপ্রয়োগ অথবা দমননীতির কোনো অবকাশ থাকবে না। বাস্তবে গণতন্ত্রে যে বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে সমাজের সব স্তরের মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দান।

নগর জীবন নিয়ন্ত্রণে কেউ বড় নয় বা কেউ ছোট নয়। তাই নগর জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে সমান অধিকার। সমান অধিকারের স্বীকৃতি একসময় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার কোনো বিকৃতি বা বিচ্যুতি অবৈধ বলে গণ্য হতে থাকে। ব্যক্তির অধিকার উপনীত হয় প্রাকৃতিক অধিকারের পর্যায়ে। যার যা বলার আছে তার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি মেলে। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। সক্রেটিসের যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেবার অঙ্গীকারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারূপে চিহ্নিত এ প্রক্রিয়া বিকশিত হতে থাকে। তা বিবৃত হয় জনগণের শাসন হিসেবে। বিশ শতক এক অর্থে রূপান্তরিত হয় গণতন্ত্রের শতকে।

একটি নীতিদার্শনিক প্রত্যয় হিসেবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উদ্ভব প্রাচীন গ্রীসে হলেও পুরো পৃথিবীব্যাপী এর বিস্তার ও বিকাশ ঘটেছে। প্রাচীন গ্রীসের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছিল এক ধরনের জীবনদর্শন, যে জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল জনগণ ও জনগণের সার্বিক বিকাশ সাধন। গ্রীসবাসী শুধু গণতন্ত্রের এই মূল্যবোধগুলোর ওপর বিশ্বাসই রাখতেন না, তাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণে, কর্মাদর্শে ও আচার অনুষ্ঠানে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তারা আরও বিশ্বাস করতেন যে, এই মূল্যবোধগুলো থেকে যেকোনো ধরনের বিচ্যুতি দেশ ও জাতির জন্য বয়ে আনবে সীমাহীন দুঃখ-বেদনা, ডেকে আনবে হতাশা, মানুষের জীবনযাত্রা হবে বিপদসংকুল, তাদের বহুদিনের লালিত আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো হবে বিপর্যস্ত–পরিণামে দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি বিলুপ্ত হবে।[২০]

---

[১৮] ধীরাজ কুমার নাথ, 'প্রসঙ্গকথা', *গণতন্ত্র ঃ সংকট ও উত্তরণ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১০।

[১৯] ধীরাজ কুমার নাথ, *গণতন্ত্র ঃ সংকট ও উত্তরণ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১১।

[২০] প্রদীপ কুমার রায়, 'দর্শন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও বাংলাদেশ', শহিদুল ইসলাম (সম্পা.), *মূল্যবোধ ও মানবতা*, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪১।

গ্রীসবাসী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোকে রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। ফলে যেমন তাদের রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও জীবনযাত্রায় জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব বাড়ানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়, তেমনি সমাজের সকল মানুষের অংশগ্রহণের কারণে তাদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নতি হয়েছিল চোখে পড়ার মতো।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় থাকে ব্যক্তি মানুষ। এই কারণে ব্যক্তি মানুষকে 'ব্যক্তি' হিসেবে সমাজে ভূমিকা পালনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হয়। তাছাড়া ব্যক্তি মানুষকে সমাজে ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজন একটি সুদৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ, একথা জেরেমী বেনথাম ও পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিলের 'চিরায়ত উপযোগবাদে' ব্যক্ত করা হয়েছে।[২১] এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে যে পর্যন্ত না 'ব্যক্তি' মানুষ সমাজে ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে সে পর্যন্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বাস্তবায়ন কঠিন হবে। গ্রীসের পর রোমান সভ্যতা, আধুনিক ইউরোপ ও ভারতীয় উপমহাদেশে আজ পর্যন্ত যে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা লক্ষ্য করা গেছে তা সবসময়ই কিছু না কিছু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক হয়েছে। এসব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সব সময়ই ব্যক্তি মানুষের বাক স্বাধীনতা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশগ্রহণ এবং আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সাম্যের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী একটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র বারবার হোঁচট খেয়েছে, আর ব্যবস্থা হিসেবে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের অনেক প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনে অনাকাঙ্খিত ফলাফল এ ভাবনাগুলোকে নতুন করে জাগিয়ে তুলছে। আজকের গণতান্ত্রিক দেশগুলো শাসিত হয়েছে স্বৈরাচারী কায়দায়-কখনো সরাসরি সামরিক কর্তৃত্বে, কখনো বেসামরিক ছদ্মবেশে। এখন মূল প্রশ্নটি হলো ব্যবস্থার ন্যায্যতার কী মূল্য থাকে যদি আদর্শ এবং মূল্যবোধের ন্যায্যতা না থাকে? আদর্শের অনুপস্থিতি কার্যত মূল্যবোধের অবক্ষয় ডেকে আনে। আর মূল্যবোধের ক্ষয় পাওয়ার অর্থ মনুষ্যত্বের গভীর সংকট সৃষ্টি হওয়া। বিশ্বব্যাপী সেই সংকট নানাভাবে ফুটে উঠেছে। বিশ্ববাসীকে বিশেষভাবে ভাবতে হচ্ছে, গণতন্ত্রের পরিণতি নিয়ে, গণতন্ত্রে মনুষ্যত্বের সংকট নিয়ে। ভোটের মূল্যেই মানুষের মূল্য নির্ধারণ করে দিচ্ছে যে রাজনীতি, তার নিজের কোনো মূল্যবোধ নেই। এই রাজনৈতিক আদর্শ দেশ ও মানুষের সেবার অধিকারের সঙ্গে কর্তৃত্বের চাবিকাঠিও বিজয়ীর

[২১] *প্রাগুক্ত*।

হাতে তুলে দেয়। সেবা একটি মূল্যবোধ, তাই এর একটি কেতাবি কিংবা অলংকারিক মূল্য আছে, কিন্তু প্রকৃত মূল্য হলো ক্ষমতার। তাই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সব বিজয়ীই চান প্রশ্নাতীত ক্ষমতা ও অবস্থান, অর্থাৎ জবাবদিহিমুক্ত স্বাধীন অধিকার।

৩. গণতন্ত্রের মানদণ্ড হিসেবে নির্বাচন ও সুশাসন

আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উপায় হিসেবে নির্বাচনের সার্বজনীন ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্বাচন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধিকে বেছে নেয়। সতের শতক থেকে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। *দ্যা স্পিরিট অব দ্যা লজ*[২২] গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মন্টেস্কু বলেছেন যে প্রজাতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র যে কোনো ক্ষেত্রের ভোটেই হয় দেশের প্রশাসক হও অথবা প্রশাসনের অধীনে থাকো-এই দুই অবস্থার মধ্যেই পর্যায়ক্রমে ভোটারদের থাকতে হয়। নিজেদের দেশে কোন সরকার ক্ষমতায় আসবে তা বাছাই করার 'মালিক' বা 'মাস্টার' হিসেবে কাজ করে ভোটাররাই। ভোট দিয়ে একটি সার্বভৌম শাসন ব্যবস্থাকে চালু রাখে জনসাধারণই।

নির্বাচনী ব্যবস্থা হলো একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংবিধানিক বন্দোবস্ত এবং ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা, যা ভোটকে বদলে দেয় একটি নির্ধারণকারী ব্যবস্থায় যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার জন্য নির্বাচিত হয়। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতাকে গণতন্ত্রের স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং তারাই আদৌ ক্ষমতায় থাকবে কি না তা নিয়ে ভোটারদের রায় জানতে নির্ধারিত সময়ে তারা আবার ভোটারদের মুখোমুখি হবে। নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র হয় না আবার গণতন্ত্র ছাড়া নির্বাচন প্রায় অর্থহীন। তাই দেশে দেশে গণতন্ত্র পাওয়ার আশায় শত শত বছর ধরে নির্বাচনব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

সুশাসন একটি অংশগ্রহনমূলক শাসন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন কথাটি ব্যাপকভাবে আলোচিত ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনই সুশাসনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। শাসন কজে দুর্বলতা থেকে

[২২] দেখুন, Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, eds. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller and Harold Samuel Stone, Cambridge Texts in the History of Political Thought, Cambridge, 1989.

উত্তরণের ভাবনা থেকেই সুশাসনের ধারণার সৃষ্টি। প্লেটোর *রিপাবলিক*[২৩] গ্রন্থে সর্বপ্রথম সুশাসনের ধারণা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সুশাসনের অনুপস্থিতির কারণে সব অর্জন ম্লান হয়ে যায়। টেকসই উন্নয়ন ও গণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার তাগিদ বেশ জোরালো। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয় নিয়ে সাম্প্রতিককালে সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রশ্নের। বিভিন্নভাবে ব্যাহত হচ্ছে সুশাসন। সুশাসনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বিচ্যুতি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় একটি দেশকে পেছন ফেলে দেয়।

সুশাসনের জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। সুশাসন মূলত একটি ত্রিমুখী প্রত্যয়। এখানে একপক্ষে জনগণ ও অন্যপক্ষে সরকার, আর এ দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে নির্বাচনব্যবস্থা। নির্বাচনী স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজন সুশাসন। সুশাসন নাগরিকদের অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা দেয়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে রাষ্ট্রাচারও গতিশীল ও সুশৃঙ্খল হয়। আইনের শাসন, মানবাধিকার সংরক্ষণ, শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা, সব ক্ষেত্রে সমতা, সবার প্রতি ন্যায়পরায়ণতা, জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও জাতীয় শুদ্ধাচার সুশাসনের চালিকাশক্তি। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ। আবার প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি অপরিহার্য বাস্তবতা। মানবাধিকারের অন্যতম চেতনা হলো উদার গণতন্ত্র এবং সব ক্ষেত্রেই সুশাসন নিশ্চিতকরণ। রাষ্ট্রকে কল্যাণকামী ও গণমুখী করতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। কেননা গণতন্ত্র হলো সুশাসনের প্রাণ। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিতে পারে। গণতন্ত্র মানেই জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনব্যবস্থা জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা।

উন্নয়ন ও মানবাধিকারের জন্য প্রয়োজন যথার্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ। যথার্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশের নিশ্চয়তার জন্য ত্রুটিহীন নির্বাচনব্যবস্থা ও রাষ্টের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। গণতন্ত্রকে গুরুত্ব দেওয়ার সাথে সাথে আইনের শাসনেরও গুরুত্ব থাকতে হবে। গণতন্ত্রের চর্চা প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মধ্যে সব ধরনের স্বাভাবিক অধিকার, জীবনের নিশ্চয়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা–এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা জরুরী। মানুষের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তাও যেহেতু উন্নয়নের মধ্যে পড়ে, তাই গণতন্ত্রকে টেকসই করতে হলে যথাযথ নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

---

[২৩] দেখুন, Griffith, Tom, *Plato: The Republic*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

৪. বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের অবস্থান

প্রতিবছর যুক্তরাজ্যের ইকোনমিস্ট গ্রুপের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) সূচক এক নজরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে। তাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত বিশ্বের বড় বড় কিছু গণতান্ত্রিক দেশ এখন আর পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক দেশ নয়। তাদের গণতন্ত্র এখন ত্রুটিপূর্ণ। তাদের বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচক ২০১৬ অনুযায়ী উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো এখন আছে হাইব্রিড গণতান্ত্রিক দেশের কাতারে।

গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি তাদের ২০১৬ সালের নবম প্রতিবেদনটিতে ১৬৫ টি সার্বভৌম দেশ ও দুটি অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঁচটি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে আলাদা স্কোরিংয়ের মাধ্যমে তৈরি হয় সার্বিক স্কোর ও সূচক। সেগুলো হলো নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্তি, নাগরিক স্বাধীনতা, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি। বিভিন্ন মানদণ্ডে প্রাপ্ত স্কোর নিয়ে দেশগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে চার শ্রেণির দেশে। এগুলো হলো পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক দেশ, ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ, হাইব্রিড তথা শংকর ধারার গণতান্ত্রিক দেশ এবং স্বৈরতান্ত্রিক দেশ।

এক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয় ওই সব দেশগুলোকে, যেখানে অবাধ নির্বাচনব্যবস্থা রয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে দুর্বল শাসনব্যবস্থা, অনুন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি, কম রাজনৈতিক অংশগ্রহণ। ইআইইউ এর নবম প্রতিবেদনে এই শ্রেণির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বীকৃতি পাওয়া অন্যান্য দেশের কয়েকটি হলো জাপান, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত। এসব দেশগুলোতে সরকার, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর জনগণের আস্থা কমে যাওয়া এর জন্য দায়ী। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সুষ্ঠুভাবে কাজ করা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর মানুষের আস্থা। পিউ, গ্যালাপ ও অন্যান্য জরিপ প্রতিষ্ঠানগুলোও নিশ্চিত করেছে, এসব দেশে সরকারের ওপর থেকে মানুষের আস্থা ঐতিহাসিক পর্যায়ে নেমে এসেছে। গণতন্ত্রের মানের ক্ষেত্রে এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা প্রভাব ফেলেছে।

ইআইইউ বলেছে, বিশ্বের অন্য উন্নত দেশও জনগণের আস্থা নিয়ে একই রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে। যাতে বোঝা যাচ্ছে, সমসাময়িককালে গণতন্ত্র এক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশের তালিকায় রয়েছে নরওয়ে। এর পরের অবস্থান যথাক্রমে আইসল্যান্ড, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড ও ডেনমার্কের। যৌথভাবে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে কানাডা ও আয়ারল্যান্ড। ইতিমধ্যে স্বৈরতান্ত্রিক দেশের মর্যাদা পেয়েছে উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, চাদ ও মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের কয়েকটি দেশ। হাইব্রিড গণতন্ত্রের দেশগুলোর নির্বাচনব্যবস্থা বেশ কিছু অনিয়ম ও ত্রুটিতে ভরা। হাইব্রিড দেশের তালিকায় বাংলাদেশের সঙ্গে আছে থাইল্যান্ড, মায়ানমার, তুরস্ক ও মরক্কোর মতো কিছু দেশ। এ দেশগুলোর নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নাগরিক স্বাধীনতা শ্রেণিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি যা গণতন্ত্রের পথচলাকে নির্বিঘ্ন করতে পারে।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ নারীস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু কমায়। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রে উন্নীত হয়েছে এমন ৬০ টি দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা এই মত দিয়েছেন। এর মধ্যে বেশ কিছু দেশে নারীস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ও শিশুমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশের সঙ্গে শিশুমৃত্যু হারের সম্পর্ক নিয়ে বেলজিয়ামের লিকস সেন্টার ফর ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড ইকোনমিক পারফরমেন্স, ইটালির মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিকস, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ মেথডস এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড দ্যা এনভায়রনমেন্টের চার জন গবেষক এই গবেষণা করেছেন। তাঁদের এই গবেষণা রিপোর্ট প্রভাবশালী চিকিৎসা সাময়িকী *ল্যানসেট*-এ ছাপা হয়েছে।[২৪] স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে আসার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ দেশসমূহে সব সরকারের আমলেই নারীস্বাস্থ্য ও শিশুদের কল্যাণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষকে সহজে সচেতন করা যায়। সবাই স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে বলে ভালো কর্মসূচি তৈরি করা সম্ভব হয়।

গবেষণায় আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার ৬০ টি দেশের শিশুমৃত্যু পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে দেশগুলো স্বৈরতান্ত্রিক

[২৪] সূত্র: *প্রথম আলো*, ৩১ আগস্ট, ২০১৬।

ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে। গবেষণাপত্রের শুরুতে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যের ওপর রাজনৈতিক সরকার পদ্ধতির প্রভাব কী, তা পরিষ্কার নয়। তবে সাধারণভাবে যুক্তি দেখানো হয়, গণতন্ত্র স্বাস্থ্যের জন্য ভাল, কারণ এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মতামত ব্যক্ত করতে পারে। এর ফলে ভালো জনস্বাস্থ্য নীতি পাওয়ার সুযোগ থাকে। অন্য কারণ হচ্ছে, গণতন্ত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে, যা উপার্জন ও স্বাস্থ্যে অবদান রাখে।

বিশ্বব্যাপী জনমত সংগঠনে প্রযুক্তি এখন কার্যকর ভূমিকা রাখছে। গত শতাব্দীতে কোনো দাবির পক্ষে গণসমর্থন পেতে রাজনৈতিক কর্মী বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগঠকদের দিনের পর দিন কাঠখড় পোড়াতে হতো। কিন্তু এখন অনলাইনে কেউ একটি আবেদন করার পর মাত্র কয়েক ঘন্টায় হাজার হাজার–কখনো কখনো লাখ লাখ মানুষ তাতে নাম লিখিয়ে ফেলে। বৈশ্বিক কয়েকটি নাগরিক অধিকার সংগঠন এখন প্রায় প্রতিদিনই এ ধরনের অনলাইন আবেদন চালু করে থাকে এবং যেসব আবেদনে সুফল মেলে তা স্বাক্ষরদাতাদের ই-মেইলে জানিয়ে দেয়। 'চেঞ্জ ডট অর্গ' এবং 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' এক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে আছে। অনলাইন ব্যবস্থার ফলে পাশ্চাত্যে অনেক বৈশ্বিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নাগরিক বা ভোক্তা অধিকার বিষয়ক প্রতিবাদ সফল হওয়ার নজির আছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেখা যায় গণজাগরণ মঞ্চ, কোটা সংস্কার আন্দোলন ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের মতো বিষয়গুলো ব্যাপকতা লাভ করেছিল অনলাইনে ভাইরাল হওয়ার কারণে। নাগরিক সমাজের এই সক্রিয়তা এবং অধিকার চেতনা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাগুলোকে আরও খোলাসা করে দিচ্ছে। অনলাইন ব্যবস্থার প্রসার নাগরিকদের এই ক্ষমতায়নকে ভবিষ্যতে কোথায় নিয়ে যাবে, তা রীতিমত রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শদিকদের ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে কর্তৃত্ববাদী ও নিয়ন্ত্রণমূলক সমাজে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠনে অনলাইনের ব্যবহার নানা কালাকানুন দ্বারা সীমিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ডিজিটাল আইন এক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা হতাশাব্যঞ্জক পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়।

বিশ্ব গণতন্ত্র দিবস (১৫ সেপ্টেম্বর) ২০১৬ উপলক্ষে আইপিইউ (ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন) তাদের বিবৃতিতে বলেছে, একটি ন্যায্যতর বিশ্ব প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য জাতিসংঘের ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে তুলে ধরা হয়েছে, তা বিশ্বব্যাপী কেবলমাত্র অধিকতর গণতন্ত্রের[২৫]

[২৫] দেখুন, আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'গণতন্ত্র ও নয়াগণতন্ত্র', রতনতনু ঘোষ (সম্পা.), *গণতন্ত্র স্বরূপ সংকট ও সম্ভাবনা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৭৯-১৯৩।

মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। বিশ্বনেতারা ২০১৫ সালে যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) নির্ধারণ করেছেন তার সঙ্গে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণের দাবিকে সম্পৃক্ত করার জন্য আইপিইউ ঐ বিবৃতিতে বিশ্ব রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। আইপিইউ গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে রাজনীতিতে সরলভাবে বহুমতের জায়গা করে দেওয়া এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে পার্লামেন্টগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এসডিজির লক্ষ্য, অগ্রাধিকার এবং সূচকসমূহ ঠিক করায় জনগণের মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করার জন্যও পার্লামেন্টগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে টেকসই উন্নয়নসূচি বাস্তবায়নের নিরিখে সব পার্লামেন্টের প্রতি গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সৃজনশীল চিন্তারও আহ্বান জানানো হয়। আইপিইউ তাদের বিবৃতিতে দাবী করে, অধিকতর গণতন্ত্র টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক বাস্তব অগ্রগতি এনে দিতে পারে।

এসব ধারণা নিয়ে অনেক দিন ধরেই নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহে ধীরে ধীরে হলেও ইতোমধ্যেই অনেক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ রকম একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের চর্চা। এই ব্যবস্থায় এক লাখ ভোটারের স্বাক্ষরে কোনো বিষয়ে আলোচনার দাবী উঠলে পার্লামেন্ট সেই বিষয়ে বিতর্ক আয়োজন করে থাকে। এ ধরনের নাগরিক দাবীর মুখেই একুশ শতকের প্রথম দিকে বিবিসি রেডিওর একটি মিউজিক চ্যানেল রেডিও সিক্স বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছিল।[২৬] তবে এই ব্যবস্থায় যে সব সময় কাজ হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সে কারণেই ইউরোপ থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত প্রশ্নে অনুষ্ঠিত গণভোটের রায় বিভ্রান্তিকর দাবি করে দ্বিতীয় দফা গণভোট দাবি করার আবেদনে ৪০ লাখেরও বেশি সই পড়ার পরও গণরায় নাকচ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

[২৬] দেখুন, Busfield, Steve (5 July 2010). "BBC 6 Music: Is its reprieve a triumph for social media?". *The Guardian*. London. Archived from the original on 8 July 2010. Retrieved 27 July 2010.) বিবিসি রেডিওর মিউজিক চ্যানেল রেডিও সিক্স ছিল মূলত ব্যাতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য বিখ্যাত। এই চ্যানেলের সম্প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল Indie guiter music এর পরিবেশনা। এছাড়াও প্রতিমাসে যেসব নতুন ধারার সঙ্গীতের সৃষ্টি হতো সেগুলো সর্বপ্রথম প্রচারিত হতো এই চ্যানেলে। বিগত ৪-৫ দশকের যুগান্তকারী সব সঙ্গীতের পরিবেশনা হতো নিয়মিত। বিবিসি আর্কাইভে স্থান পাওয়া সঙ্গীতসমূহের প্রচার ছিল বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, প্রতিবছর যুক্তরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি জায়গায় অনুষ্ঠিত সঙ্গীত উৎসবের সরাসরি সম্প্রচার করা হতো এই চ্যানেলে। ভিন্নধর্মী এবং শ্রোতাদের কাছে খুব পছন্দের চ্যানেল হওয়া সত্ত্বেও ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাণিজ্যিক দিকের ওপর জোর প্রদান করতে গিয়ে বিবিসি ট্রাস্ট মিউজিক চ্যানেল রেডিও সিক্স বন্ধের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত এ বন্ধের প্রতিবাদে জার্ভিস কুকার নামক প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী 'SaveBBC6Music' শিরোনামে তৎক্ষণাৎ ক্যাম্পেইন শুরু করেন। মুহূর্তেই টুইটার ও ফেসবুকে তা ভাইরাল হয়। নানামুখী প্রতিবাদের মুখে অবশেষে বিবিসি ট্রাস্ট ২০১০ সালের জুলাই মাসে সে বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করে।

গণতান্ত্রিক দিবস পালনে নানা দেশের পার্লামেন্ট নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করে থাকে। এ ধরনের দিবস পালনে কোনো দেশে গণতন্ত্রের যে খুব একটা উপকার হয়েছে তেমন দাবী করা যায় না। এই দিবস পালনকে কেন্দ্র করেই থাইল্যান্ড তার জনসাধারণের জন্য এক সপ্তাহ পার্লামেন্ট ভবন খুলে দিয়েছিল। অথচ সেই থাইল্যান্ডেই কয়েক বছর ধরে চেপে আছে সামরিক শাসন। রাজনীতিবিদরা বক্তৃতা-বিবৃতিতে অধিকতর গণতন্ত্রের কথা বললেই নাগরিকরা যে সব স্বাধীনতা পেয়ে যাবেন, এমন প্রত্যাশা না করাই ভালো। কাজেই দিবস উদযাপনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নাগরিকদের ক্ষমতায়নের প্রশ্ন বা তাদেরকে ক্ষমতায় সম্পৃক্ত করার বিষয়টি।

বিশ্ব গণতন্ত্র দিবসে জাতিসংঘের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, নাগরিক সমাজের স্বাধীনতাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গণতন্ত্রে প্রয়োজন অংশগ্রহণমূলক নাগরিকত্ব, স্বচ্ছতা, বহুত্ববাদ এবং অন্তর্ভুক্তি।[২৭] ইইউর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নাগরিকদের সাথে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ এবং আস্থার সম্পর্ক প্রায়ই টানাপোড়নের মুখে পড়ে, যাতে সামাজিক উত্তেজনা ও রাজনৈতিক বিভাজনের সৃষ্টি হয়। ইইউ তাই বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র সংহত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার কথা বলেছে।[২৮] বিশ্ব গণতন্ত্র দিবসে সবাই গণতন্ত্রের গুণগান করবেন, সেটাই স্বাভাবিক; পাশাপাশি গণতন্ত্র থেকে অধিকতর বা উচ্চতর গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে গণতন্ত্রের ধারণায় ঘাটতি প্রকট, সেখানে অধিকতর গণতন্ত্রের বাণী অনেকটা পরিহাসের মতো শোনায়। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র কার্যকর থাকলেই তবে অধিকতর গণতন্ত্রের প্রশ্ন আসে।

---

[২৭] ইউরোপীয় ইউনিয়ন ক্ষমতায়িত সুশীল সমাজকে যেকোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে। সুশীল সমাজ বহুত্ববাদকে প্রতিনিধিত্ব ও লালন করে। তারা আরও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়নে এবং অংশগ্রহণমূলক ও স্থায়ী উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। বিরোধ মীমাংসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের, তথাপি রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের সংস্থাগুলোর (সিএসও) যৌথ প্রচেষ্টা দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান অসাম্য, সামাজিক বঞ্চনা এবং অস্থিতিশীল উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা করে। নাগরিকদের স্বার্থ তুলে ধরার মাধ্যমে সুশীল সমাজের সংস্থাগুলো অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে পূরণ করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর সংস্থা নিশ্চিত করতে, আরও জবাবদিহিমূলক ও আইনসঙ্গত রাষ্ট্র গঠনে এবং সামাজিক সংযোগ ও গণতন্ত্রের উন্নয়নে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজের সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন মনে করে, সিএসও-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সব অ-রাষ্ট্রীয়, বেসরকারি, অলাভজনক ও অরাজনৈতিক কাঠামো যেগুলোর মাধ্যমে জনগণ তাদের সাধারণ লক্ষ্য ও আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে চায়, হোক তা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক। ইউরোপীয় ইউনিয়ন সুশীল সমাজের সংস্থাগুলোকে তাদের বৈচিত্র্য ও সুনির্দিষ্টতা অনুসারে মূল্যায়ন করে। সামাজিক অগ্রগতি এবং শান্তি, স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও মানবিক মর্যদার মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের যৌথ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ইইউ সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করে। (বিস্তারিত দেখুন, সুশীল সমাজের সাথে সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক ইইউ'র কান্ট্রি রোডম্যাপ।)

[২৮] দেখুন, সুশীল সমাজের সাথে সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক ইইউ'র কান্ট্রি রোডম্যাপ।

৫. গণতন্ত্রে বাক স্বাধীনতার গুরুত্ব

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ দেশসমূহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাক-স্বাধীনতা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের নীতি ও কাজের সমালোচনা করা হয়। মতদ্বৈততা গণতন্ত্রের প্রাণ। বিরোধী দল ও সাংবাদিকদের কাজ হচ্ছে সরকারের নীতি, কাজ ও সংস্থার গঠনমূলক সমালোচনা ও ভুল চিহ্নিত করা। সমালোচনার সুযোগ না থাকলে রাষ্ট্র জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারবে না। সরকার জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে না জানলে তার রাজনৈতিক পরিণতি অশুভ হতে পারে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক দেশেই এই ধরনের মতভিন্নতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যার দ্বারা জনমনে সরকারের প্রতি ঘৃণা ও রাজনৈতিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

উদারনৈতিক সমাজে বাক স্বাধীনতার বিষয়টি একটি অন্যতম বাদানুবাদপূর্ণ বিষয়। যদি বাক স্বাধীনতার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন না করা হয়, বাক স্বাধীনতার সাথে সাথে অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। বাক স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার বিষয়টি সব সমাজে, সব রাষ্ট্রে, সবসময়ই বিতর্কিত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাক স্বাধীনতা বিষয়ক যেকোনো ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় এর ওপর সবসময়ই সীমাবদ্ধতা আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। সব সমাজই বাক স্বাধীনতার ওপর কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে কেননা, এটি সবসময়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মূল্যবোধের ধারক হয়ে থাকে।

নীতিদার্শনিক মিল[২৯] সর্বপ্রথম বাক স্বাধীনতার সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। মিল মনে করেন, বিষয়টির যদি ন্যূনতম কোনো বৈধতা থাকে তাহলে নৈতিক বিচারে নৈতিক-অনৈতিক সব ধরনের মত ও মতবাদ ব্যক্ত করা এবং সেগুলোর বিষয়ে আলোচনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। বাক স্বাধীনতার পক্ষে এটি একটি শক্তিশালী ও অলঙ্ঘনীয় যুক্তি। মিল বলেন, কোনো মতবাদ তা যতই অনৈতিক হোক না কেন, তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। পূর্ণ বাক স্বাধীনতার একটা যৌক্তিক সীমা থাকা উচিত। তা কখনোই সমাজে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী হিসেবে উপনীত হওয়া কাম্য নয়। ব্যক্তিমর্যাদা রক্ষার জন্যই এরূপ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

---

[২৯] দেখুন, John Stuart Mill, *On Liberty*, London: John W. Parker & Son, 1859, p. 3-19. মিল সমাজ ও রাষ্ট্রে নৈতিক পদ্ধতি হিসেবে উপযোগবাদের প্রচার করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কর্তৃপক্ষের সাথে ব্যক্তিস্বাধীনতার একটি মেলবন্ধন তৈরি করা। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর জোর দেন। কেননা একে তিনি সর্বাধিক সুখের পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করেন। তিনি তার পূর্ববর্তী সময়কালীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষাবলম্বনকারী নীতিদার্শনিক চিন্তার সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন, রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে এ সময়কালের গণতন্ত্র অধিকাংশের সমর্থিত সরকারের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল যা কর্তৃত্ববাদেরই নামান্তর।

এর পাশাপাশি মিল রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ব্যক্তির আচরণ ও বাক স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আচরণবিধি প্রণয়নের কথা বলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করেন খুব সাধারণ একটি নীতির মাধ্যমে, আর তা হলো 'অনিষ্ট নীতি'। এ নীতির মূলকথা হলো সভ্য সমাজের যেকোনো সদস্যের ওপর তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে কেবল সমাজের অন্যদেরকে অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, তার অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য। 'অনিষ্ট নীতি' বাক স্বাধীনতার ওপর কিছুটা সীমাবদ্ধতা আরোপ করার কথা বলে। যেসব উক্তি অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করে, অধিকার বিনষ্ট করে এবং জীবননাশের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সেগুলোকে মিল তাঁর নীতির মাধ্যমে সীমিত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, যেসব উক্তি স্পষ্টত ও প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘন করে সেগুলোকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আইনের মাধ্যমে সীমিত রাখা অবশ্য কর্তব্য।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী। একটি দেশের সরকার যতই শক্তিশালী হোক না কেন, গণমাধ্যম নিজের অবস্থানে অটল থাকলে তা সোচ্চার হতে পারে। সত্য প্রকাশ করে বলেই গণমাধ্যম সরকারকে বা ক্ষমতাবানকে জনগণের কথা শুনতে বাধ্য করে। পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক দেশেই দেখা যায়, গণমাধ্যমের খবরে সরকারের ইতিবাচক প্রভাব, ভাবমূর্তি প্রকাশিত না হলে সাংবাদিকদের প্রকাশ্যে কটাক্ষ করা হয়, এমনকি হুমকি-ধামকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের হয়রানিও করা হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, অনেক দেশেই সরকারের বিরোধী মনোভাবের খবর প্রকাশ করায় গণমাধ্যমের একাংশের সম্প্রচার কিছুকালের জন্য বা চিরতরে বন্ধ করে দেবার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এর ওপর রাজনৈতিক দলের চাপও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াজুড়েই গণমাধ্যম চাপের মধ্যে রয়েছে। গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, বিশেষ করে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে।

বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমকর্মীরা চাপের মুখে আছেন। কারণ, অন্যান্য আইন দিয়ে তাদের হাত-পা বেঁধে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজারবাইজান, তুরস্ক ও জাম্বিয়ায় সন্ত্রাসবিরোধী আইন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে সরকারের সমালোচনাকারী সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা হয়েছে। সাইবার অপরাধ বিষয়ক আইন নিয়েও গণমাধ্যমকর্মীরা উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন দেশের সরকার বলে থাকেন এটা সাংবাদিকদের জন্য নয়। যারা অনলাইনে অপরাধ করে তাদের জন্য এ আইন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এই আইন ব্যবহার করে সমালোচনামূলক সাংবাদিকতার রাশ টেনে ধরা হয়েছে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার হলো মানুষের আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়ন। সেক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। গণমাধ্যম যদি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে কাজ করে তাহলে জনগণের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। মুক্ত ও স্বাধীন সাংবাদিকতার সাথে গণতন্ত্রের একটি সম্পর্ক আছে। গণতন্ত্রের মান দুর্বল হতে থাকলে গণমাধ্যমের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা কঠিন। অর্থাৎ গণতন্ত্রের মান উন্নয়ন বা গণতন্ত্রকে জোরদার করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমেরও ভূমিকা রয়েছে।

আবার সরকারের চাপ সামলানো গণমাধ্যমের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিটি দেশ, গণমাধ্যম এবং সাংবাদিক ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেন। কিন্তু আমরা এর মধ্যে একটা প্রবণতা চিহ্নিত করতে পারি। আর এ প্রবণতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয় হলো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। গণমাধ্যমের মূল কাজ হলো মানুষকে তথ্য জানানো, তাদের শিক্ষিত করে তোলা ও বিনোদন দেওয়া। তাদের মূল উদ্দেশ্য কোনো না কোনোভাবে সমাজের উন্নয়ন। গণমাধ্যমের প্রধান কাজ হলো তথ্যের মধ্যে থাকা, এর নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ। আর সত্যটা কী, তার নিরন্তর অনুসন্ধান। আমরা যদি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে সত্যিকার গণতন্ত্রের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম পূর্বশর্ত বিরোধী দল। বিরোধী দলকে নিজেদের মতো কাজ করতে দেয়া উচিত। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে শক্তিশালী বিরোধী দল নেই। কিন্তু দেশে শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকা গণতন্ত্রের জন্য ভাল নয়। সমালোচকই শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সরকারের নিজের স্বার্থেই সমালোচনার পরিসর উন্মুক্ত আর বাধাহীন করা উচিত। কার্যকর বিরোধী দল যখন না থাকে, তখন বাক স্বাধীনতা, প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা, সমবেত হওয়ার ও বিক্ষোভ করার স্বাধীনতা সরকারের নিশ্চিত করা উচিত। মানবাধিকার রক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে সরকারকে আন্তরিক হতে হবে।

৬. গণতন্ত্রে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় সরকারব্যবস্থা অপরিহার্য। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনেকগুলো অন্তর্নিহিত দুর্বলতা রয়েছে। জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা, সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তকরণের অভাব ইত্যাদি হলো এসব সীমাবদ্ধতার অংশ। একটি শক্তিশালী তথা ক্রিয়াশীল স্থানীয় সরকারব্যবস্থা এসব সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারে। ফলে যেসব সিদ্ধান্ত মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে, সেগুলোর সমাধানে তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তৃণমূলের গণতন্ত্র হলো সাধারণ জনগণের গণতন্ত্র যা গণতন্ত্রকে গভীরতা প্রদান করে। এর মাধ্যমেই গণতন্ত্রের সত্যিকারের গণতন্ত্রায়ন হতে পারে। আর এ কারণেই বিভিন্ন দেশের সংবিধানে প্রশাসনের সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে একটি স্বশাসিত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশনা দেওয়া আছে। এভাবেই তৃণমূলের শাসন কার্যকর করার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যা বিভিন্ন দেশে বিরাজমান প্রতিনিধিত্বশীল বিকল্প থেকে নিঃসন্দেহে উন্নততর। অর্থাৎ নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ছাড়া গণতন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা জড়ো হতে না দিয়ে এ ব্যবস্থা সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতার পৃথকীকরণে সহায়তা করে।[৩০]

একটি কার্যকর স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শুধু গণতন্ত্রকেই সুসংহত করে না, উন্নয়ন কার্যক্রমকেও ত্বরান্বিত করে। প্রতিনিয়ত মানুষ যেসব সমস্যার সম্মুখীন, তার অধিকাংশই স্থানীয় এবং এগুলোর সমাধানও স্থানীয়ভাবেই হওয়া উচিত। যেমন–শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়োনিষ্কাষণ, পানীয় জল সরবরাহ, পরিবেশ উন্নয়ন, নারীর অবস্থার পরিবর্তন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অপরাধ দমন, এমনকি আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ স্থানীয়ভাবেই গ্রহণ করা যায়। একটি সত্যিকারের ও কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেই স্থায়ীভাবে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। স্থানীয় সরকারব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হলো স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা। গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ওপর স্থানীয় শাসনের ভার অর্পন করার কথা বলা হয়, জনকল্যাণমূলক সরকারি সেবা প্রদান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

[৩০] ডেভিড বিথাম ও কেভিন বয়েল, আলমগীর সিকদার লোটন (সম্পা.), *গণতন্ত্র ৮০ টি প্রশ্ন ও উত্তর*, আকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৭৫।

এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব পালন যার অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বনেতারা যে যুগান্তকারী ও সার্বজনীন 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'[৩১] (এসডিজি) অনুমোদন করেছেন–যে লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্য ২০৩০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে ও টেকসইভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করা–সেগুলোও স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এ জন্যও প্রয়োজন হবে সত্যিকারের বিকেন্দ্রীকৃত ও স্বশাসিত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা। ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রকল্পভিত্তিক বা সমাজকল্যাণমূলক, বৈদেশিক অনুদান বা ঋণ বিতরণ বা খয়রাতি সাহায্য হিসেবে কর্মসূচি গ্রহণ যথেষ্ট নয়। এর জন্য জনগণের অধিকার সচেতনতা, তার সংগঠন করার ক্ষমতা, স্থানীয় পর্যায়ে স্ব-শাসিত সরকারের কার্যক্রমে তার অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়াতে হবে।

একটি আদর্শ রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের বিষয় হলো মানবাধিকার, সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। এজন্য রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের ক্ষমতায়ন ও অধিকতর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা জরুরী। কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর গণতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বা তৃণমূলের পরিষদের কাছে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পন করা দরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা যায়। সর্বস্তরে স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে অধিকতর ক্ষমতাশালী ও দায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য অপরিহার্য।

ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের ভূমিকার গুরুত্ব আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও দেখতে পাই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এমডিজি ও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে এক ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক পার্টনারশিপ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও হাতে-কলমে সহায়তার মাধ্যমে

[৩১] টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংকান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। জাতিসংঘ লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন করেছে এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে প্রচার করছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে প্রতিস্থাপন করেছে যা ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এসডিজি এর মেয়াদ ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। এতে মোট ১৬ টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৬৯ টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৯৩ টি দেশ এসব লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে একমত হয়েছে। ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে UN Sustainable Development Summit এ বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানদের আলোচনার মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্মেলনের বিষয়বস্তু *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sutainable Development.*

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের সভা, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন, স্থায়ী কমিটিকে কার্যকর করা ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের জীবনমানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী এমডিজি ও এসডিজির গৃহীত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কৌশল অত্যন্ত কার্যকর। সর্বোপরি, যেহেতু দলমত নির্বিশেষে সমাজের সব ক্ষেত্রের মানুষ এই প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত এবং তারা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে, তাই দেখা যায় চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা বা যেকোনো ধরনের আপদকালীন সময়েও এ কাজের সাথে যুক্ত স্থানীয় সরকারগুলো থাকে সংঘাতমুক্ত। যে তৃণমূলের নাগরিক সমাজ যেখানে যত বেশি সক্রিয়, সেখানেই স্থানীয় সরকার পরিষদ তত বেশি কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছে ও জনগণ তত বেশি উদ্যোগী হয়েছে এবং মানুষের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন তত বেশি হয়েছে। কাজেই বিশ্বব্যাপী স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যক্রম যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে তা কাজে লাগাতে প্রতিটি দেশের সরকারের উচিত এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৭. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতি

একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রচর্চা। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা বা তার পরিবারবর্গ ছাড়া অন্য কেউ দলের বা সরকারের প্রধান হতে পারবে না, এটা গণতান্ত্রিক রীতিবিরুদ্ধ। নতুন দলপতি মনোনয়ন এবং নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হওয়া জরুরী। তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহে দলীয় সভাপতি বা দলীয় প্রধান দলের প্রতিষ্ঠাতা বা তার পরিবারবর্গ ছাড়া সর্বসম্মতিক্রমে অন্য কেউ অনুমোদিত হবে, এটা কল্পনা করা যায় না। সাধারণত মনে করা হয় এটা সম্ভব নয়, এটা অচিন্তনীয়। দেখা গেছে, এসব দেশে ছোট-বড় সব দল এমনকি এদের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনসমূহের মধ্যে পরিচালনায় গণতন্ত্রের চর্চার অভাব। তৃণমূল থেকে শীর্ষ পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে দলে নেতা মনোনয়ন প্রায়ই অনুপস্থিত। দলীয় প্রধান বা দলের সভাপতি হিসেবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলের সংহতির জন্য জনপ্রিয় এবং বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দরকার হয়। কিন্তু এর স্থায়িত্ব দীর্ঘদিন হলে দলের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বে সংকটের আশংকা থাকে। এজন্য দরকার প্রতিটি রাজনৈতিক দলে তৃণমূল থেকে গণতন্ত্র

পরিচর্যা, প্রতিটি স্তরে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা নিযুক্ত করা এবং প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি নিশ্চিত করা। এই নিশ্চয়তা আসা উচিত দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে। দলের প্রতিটি পর্যায়ে নেতা-কর্মী মনোনয়নে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার অনুশীলন যাতে হয়, তা নিশ্চিত করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি দেশের সরকারকে নানা ধরনের প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশেই সরকার এসব চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশসমূহে বিরোধী দলগুলো সরকারি সিদ্ধান্ত, নির্বাচন বর্জন এবং নির্বাচন বাতিল করতে নানা ধরনের সহিংস কার্যক্রম চালায়। এ প্রেক্ষিতে সেসব দেশে সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে সবসময় আশংকা থেকেই যায়। বিদেশিদের কাছে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তবে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশ ভালভাবেই সরকারের মেয়াদ পূর্ণ করে এবং সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থার ওপর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। বিদেশিদের কাছেও সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন বা দ্বিধা থাকে না। এটা মূলত গণতন্ত্রের সাফল্য। গণতান্ত্রিক এসব দেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো দ্রব্যমূল্যের সহনশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্যের হার কমানো এবং ব্যাপক পরিমাণ মানুষের কর্মসংস্থান। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে এসব দেশ উর্দ্ধগামী।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত বিরোধী দল। কোনো দেশের বিরোধী দল যদি রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়, তারা যদি কোনো ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তারা যদি অপরিচ্ছন্ন ও দিকনির্দেশনাহীন হয়, যেনতেনভাবে ক্ষমতায় যেতে চায়, তাহলে দলটি নিজেও যেমন খাদের কিনারে চলে যায়, দেশকেও ঠেলে দেয় অনিশ্চয়তার পথে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অবস্থানও সম্মানজনক। বিরোধী দলে থেকেও মানুষের জন্য অনেক কিছু করা সম্ভব। তাদেরকে অবশ্যই জনগণকে আস্থায় নিতে হবে এবং আস্থার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যেনতেনভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তা তাদেরকে পরিহার করতে হবে। কোনো দেশের সব দলের সহযোগিতা থাকলে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব এবং দেশের সব মানুষের আস্থার ভিত্তিতে সরকার গঠন সম্ভব।

গণতন্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য হলো গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও বাসনা সকল নাগরিকেরই থাকে। সাম্য, স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বপ্ন

প্রতিটি দেশের প্রতিটি নাগরিক দেখলেও, বাস্তবে দেখা যায় অনেক দেশেই গণতন্ত্র সুসংহত হয়নি, সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং বৈষম্য তীব্রতর হয়েছে, মানবিক মর্যাদাও ভূলুণ্ঠিত। জনপ্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক পূর্বশর্ত। কিন্তু অনেক গণতান্ত্রিক দেশেই সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের সমস্যা একটি স্থায়ী সংকটে পরিণত হয়েছে। কোনো দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ তা সরকার হোক বা বিরোধী দলই হোক, তাদের সদিচ্ছার অভাবেই মূলত গণতন্ত্রের সংকটের উৎপত্তি হয়।

গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষমতাসীন দলকে মনে রাখতে হবে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে বিরোধী পক্ষের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এটাই নিয়ম, এটাই রীতি। কোনো দেশের বিরোধী দলসমূহ বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকলে সেটা শাসক দলের জন্যও কল্যাণ বয়ে আনে না। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তা সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সরকার ও বিরোধী দল কঠিন রাজনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সংলাপের পথ বেছে না নিয়ে যদি সংঘাতের পথে যায়, তবে তা সাধারণ নাগরিকদের হতাশ করে এবং রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন হতে বাধ্য করে। এর ফলে আন্তর্জাতিকভাবে বিরাজনীতিকরণের সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠছে। কোনো স্বাধীন দেশে সাংঘর্ষিক রাজনীতি জনগণের প্রত্যাশিত নয়। সব নাগরিকই চায়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলসমূহ জটিল রাজনৈতিক সমস্যাগুলো কীভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে আন্তরিক হবে ও সিদ্ধান্ত নেবে, বৃহত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কল্যাণের পথ বেছে নেবে।

৮. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা

একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচনী প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচনী প্রশাসনের ওপর দেশের নাগরিক সমাজ ও বিজ্ঞজনদের মতামত সহযোগী ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হলো দেশটির রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদেরা। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে প্রত্যেক রাজনীতিবিদ ও সরকার নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতের মতো শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ ইতোমধ্যেই তার সাক্ষর রেখেছে। এসব দেশে নির্বাচন কমিশন এতটাই শক্তিশালী যে নির্বাচনকালীন তা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভূমিকা পালন করে। এসব দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করা হয়েছে এবং সব সরকার এসব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে বলেই আজ তারা গণতন্ত্রের উদাহরণ হতে পেরেছে।

নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের ওপর রাজনৈতিক দল ও সাধারণ ভোটারদের আস্থার সংকট হলে নির্বাচনের ফলাফল জনসাধারণ মেনে নেয় না। তখনই গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনের আস্থার সংকট শুরু হয়, বিশেষ করে দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশে তাদের নিয়োগের পর থেকেই। এসব দেশে সব সময়ের নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ নিয়ে বিতর্কের কারণে কমিশন প্রথম থেকেই আস্থার সংকটে পড়ে। তাই এ নিয়োগপদ্ধতি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। গণতান্ত্রিক দেশসমূহের নির্বাচন কমিশনের নিয়োগপদ্ধতি নিয়ে তাই বিশ্বব্যাপী নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো বিভিন্ন দেশের সংবিধানে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের কথা থাকলেও অধিকাংশ দেশেই আজও সংবিধান মোতাবেক কোনো আইন তৈরি হয়নি। এসব দেশে ক্ষমতাসীন সরকারের সুপারিশেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। যেসব দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত শক্ত রয়েছে, সেসব দেশে নির্বাচন কমিশন আস্থার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন যদি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে তাহলে গণতন্ত্রের ভিত রচিত হয়।

যেকোনো দেশেই দলীয় সরকারের অধীনে নিয়োজিত নির্বাচন কমিশন সব সময়ই আস্থার সংকটে পড়ে। শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য এ সমস্যার সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যে কমিটি তৈরি হবে, তাতে নির্বাচনের শরীক বলে আখ্যায়িত রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি থাকলে হয়তো এই আস্থার সংকটের অবসান হতে পারে। কমিটির গঠন নিয়ে যদি কোনো বিতর্কের সূত্রপাত হয়, তা নিরসন করার দায়িত্ব বিদ্যমান সরকারের। সেক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের বিকল্প হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তাতে হয়তো বিতর্কের অবসান যেমন হবে, তেমনি নির্বাচন কমিশনের ওপর সবার আস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইউরোপ-আমেরিকা এবং এশিয়ার কিছু দেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তাই এসব দেশে উত্থাপিত হয় না, কালেভদ্রে হলেও তা সংসদ অকার্যকর করে না। সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে তুরস্কে এরদোগান, ভারতে নরেন্দ্র মোদি, আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হতে পেরেছেন। এসব নির্বাচন নিয়ে জনগোষ্ঠীর একটি বিপুল অংশের গভীর আক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনের ফলাফল সব রাজনৈতিক দল মেনে নিয়েছে। এর

কারণ নির্বাচনব্যবস্থার সততা নিয়ে মানুষের আস্থা। এই আস্থা বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, উজবেকিস্তান ও উগান্ডার মানুষের নেই। নির্বাচনব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের আস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাই প্রতিটি দেশে স্বীকৃত। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেই তাই নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হয়, এসব প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও স্বাধীন করার জন্য সহায়ক বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে কিছু কিছু দেশের নির্বাচন কমিশন জনগণের আস্থা বহুলাংশে অর্জন করতে পারলেও, বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশেই তা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই আবার দেখা যায়, একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন সম্পর্ক মানুষের আস্থা আরও বিনষ্ট হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের গঠন এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কে এসব দেশের বিরোধী দলসমূহ তাই সবসময় কিছু দাবী ও প্রস্তাব পেশ করে থাকে।

বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনকেন্দ্রিক যেসব দাবী ও প্রস্তাব উত্থাপন করে, সেগুলোর কিছু নীতিগত, কিছু পদ্ধতিগত। তারা নীতিগতভাবে সবার ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলেন এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের কমিশনে রাখার কথা বলেন। নীতিগত এসব প্রস্তাবের অন্যতম দিক হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনে এবং কমিশন গঠন করার জন্য বাছাই কমিটিতে নিয়োগ। এসব জায়গায় নিরপেক্ষ, সৎ, অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। পদ্ধতিগত দিকে রাজনৈতিক দলগুলো কমিশন গঠনের জন্য সরাসরি কিছু নাম প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন দলের প্রস্তাবিত নামসমূহ হতে বাছাই কমিটি সর্বসম্মতভাবে কমিশন গঠন করবে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো কিছু আইন সংস্কারমূলক প্রস্তাবও দিয়ে থাকে, যা বাস্তবসম্মত। আইন সংস্কারের প্রস্তাবে নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা এবং তাদের সহায়তায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে নির্বাচনকালে সেনাবাহিনী ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো ইউনিটের প্রধান বা নীতি নির্ধারক যাতে সরাসরি রাজনৈতিক বক্তিত্ব না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তা জরুরী।

নির্বাচনব্যবস্থার সততার অন্যতম বিষয় হলো নির্বাচিত সরকারের অধীনেই সব থাকবে ও পরিচালিত হবে। অনুন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিরোধ সমাধানের চেষ্টা করছে। তাদেরকে আরও বাহ্যিক নানান অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ফলে দেশগুলো আরও অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে। অভ্যন্তরীণ বিরোধ সৃষ্টিকারী প্রধান বিষয়টি হচ্ছে সম্মিলিত বিরোধী দলের সাথে শাসক দলের চলমান দ্বন্দ্ব। বিবাদমান এ পক্ষগুলো যা চায়, তার মূলকথা হলো, প্রতিপক্ষকে একদম রাজনীতি থেকে দূরে রাখা, যাতে পরবর্তী নির্বাচনে নিজেরা জয়ী হতে পারে। এ কারণে দেশগুলোর প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, এমনকি আদালত পর্যন্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে দেশগুলোতে চরম অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

গণতান্ত্রিক দেশে তিন মডেলের অর্থাৎ স্বাধীন, মিশ্র ও সরকারনিয়ন্ত্রিত নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সংবিধান দ্বারা গঠিত স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণ তথা ভোটারদের আস্থা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে নব্য গণতান্ত্রিক দেশগুলো সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনই বেছে নেয়। এক গবেষণা জরিপের ফল অনুযায়ী, বিশ্বের যে ১৮৭ টি দেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে ১৩১ টি দেশে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। বাকী দেশগুলোর ৩৩ টিতে সরকারি এবং ২৩ টি দেশে মিশ্র মডেলের নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা রয়েছে। অবশ্য এ ৫৬ টি দেশের সিংহভাগই পশ্চিমা ও জাপানের মতো প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশ।[৩২]

একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু সাংবিধানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারাই পূর্ণভাবে স্বাধীন হয় না। তবে কাঠামোগত স্বাধীনতা নিরপেক্ষ নির্বাচনের ধারণাকে পোক্ত করে। কাঠামোগত ছাড়াও আরও যে ধরনের স্বাধীনতা আবশ্যক, তার মধ্যে রয়েছে আর্থিক দিক, কমিশনের সদস্য-কর্মচারীদের নৈতিক অবস্থান ও স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা। কাঠামোগত স্বাধীন নির্বাচন কমিশন তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা এবং কমিশনের সদস্যরা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আর এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো কী পদ্ধতিতে এবং কী ধরনের ব্যক্তি দ্বারা নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। কাজেই নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে কাজ করার মনোবৃত্তি এবং দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

[৩২] সূত্র: *প্রথম আলো*, ৭ ডিসেম্বর, ২০১৬।

নির্বাচন কমিশন অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ কারণে প্রতিটি দেশের সংবিধানে নির্বাচন কমিশনকে বিশেষভাবে ক্ষমতায়ন করা হয়ে থাকে। আর এ কারণেই নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে, যেসব গণতান্ত্রিক দেশে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করার বিষয়টি সংবিধানসম্মত। যেসব দেশে গণতান্ত্রিক ভিত দুর্বল, গণতন্ত্রের সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী নয়, সেখানে এসব প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া উচিত সরকার এবং অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলের। সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় এ যাবৎ বাংলাদেশের ন্যায় বিভিন্ন দেশে যেসব কমিশন গঠিত হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এখন যা প্রয়োজন তা হলো, এই বিতর্ক হ্রাস করতে সংবিধানে উল্লেখিত আইন তৈরি না করা পর্যন্ত সর্বদলীয় অথবা ন্যূনতম রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে কমিশন গঠিত হওয়া।

৯. গণতন্ত্র ও উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে গণতন্ত্রের সাথে আপস করতে হয়। এই ধারণা বিভিন্ন দেশের সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত বাস্তবতা নিরূপণ করা কঠিন হয়, যদি গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থা বিশ্ববাসীকে ব্যাপকভাবে উদ্বিগ্ন করেছে। সদর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, বিগত কয়েক দশকে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে সামষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এই অবস্থাকে ইতিবাচকই বলতে হয়, এই অর্থে যে দেশগুলোর জাতীয় আয় ও প্রবৃদ্ধি দুটোই স্থিতিশীল ছিল। তবে এ সময়কালে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশের প্রবাসী আয় কমেছে। সেটা অবশ্য বৈশ্বিক মন্দার সাথে সম্পৃক্ত।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী নানা ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারি ব্যাংকসমূহ আর্থিক অনিয়মে জড়িয়ে পড়েছে। সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে দুর্নীতির ঝুঁকি অনেক বেড়েছে। কারণ, এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ তেমন একটা চোখে পড়েনি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়গুলো আলোচিত হলেও বিগত বছরগুলোর তুলনায় এসব অনিয়মের হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর প্রভাবে সার্বিক সেবা খাত চরম দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। বড় বড় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে দুর্নীতির কারণে জাতীয় আয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিটি দেশের সরকার বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রতিটি দেশের জন্য জরুরী। কিন্তু যত বেশি অর্থ বিনিয়োগ হয়, তত বেশি দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। শুধু ওপরের স্তরেই নয়, তৃণমূল পর্যায়েও উন্নয়ন প্রকল্পে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বরাদ্দ রাখা ও খরচ দেখানো হয়। বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পে সেই ঝুঁকি চরমভাবে বিদ্যমান বলে ধরা যায়। প্রতিটি দেশেই অভিযোগ রয়েছে, এই পদ্ধতিতে সরকারের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ হাতিয়ে নিজেরা লাভবান হচ্ছেন। জবাবদিহিতা ছাড়াও উন্নয়ন ঝুঁকিপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত দুর্বল হয়েছে। জবাবদিহি সরকারের রাষ্ট্রপরিচালনায় সাফল্যের জন্যই দরকার। বিগত কয়েক দশকের পৃথিবীতে দেখা গেছে, মানবাধিকারের বাস্তবতা গণতন্ত্রের চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের ওপর চাপ এ সময়কালে আরও প্রকট হয়েছে। কিছু কিছু দেশে আবার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই সংকোচনকে প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়েছে। অধিকাংশ দেশেই শিশু ও নারী অধিকারের বেলায় অবনতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার হরণ অব্যাহত ছিল। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বিশেষভাবে বলা হলেও, এ বিষয়ে সরকারের সাথে বিচার বিভাগের টানাপোড়েন ক্রমে বেড়েই চলেছে। এসব দেশে জাতীয় অনেক বিষয়েই আইন প্রণয়ন হয়েছে বটে, কিন্তু সেসব জায়গায় বিরাজ করছে প্রাণহীন পরিবেশ। কারণ, এসব বিষয়ে প্রশ্ন করা, প্রতিবাদ করা, জবাবদিহিতার ঘাটতি বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে।

গণতান্ত্রিক দেশগুলো স্বাধীনতা চায়, উন্নয়ন চায়। স্বাধীনতা ও উন্নয়ন চাইলে গণতন্ত্রের বিকল্প নেই। তা না হলে নিচের দিকে থাকা মানুষ কখনো লাভবান হবে না। এজন্য অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থায় যেতে হবে। সবার জন্য উন্নয়ন বা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নই গণতান্ত্রিক পন্থা। যদিও বেশ কিছুদিন ধরে পৃথিবীব্যাপী একটা আলোচনা হচ্ছে যে গণতন্ত্র নয়, অগ্রাধিকার হওয়া উচিত উন্নয়ন। এই নীতি অনুসরণ করে কিছু দেশ সাফল্যের মুখও দেখেছে। যেমন চীনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। চীনে একদলীয় ব্যবস্থা চালু আছে। সেখানে কোনো ধরনের প্রতিবাদ উঠলে তা সঙ্গে সঙ্গে দমন করা হয়। সুতরাং বলা যায়, এটি একটি দক্ষ ব্যবস্থা, তবে সম্পূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। চীন এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে কনফুসিয়ান সভ্যতার নীতি অনুসৃত হয়, যেটি হলো কর্তৃত্ববাদী এবং ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের সামাজিক ঐতিহ্য হচ্ছে গণতন্ত্র। কর্তৃত্ববাদীতা এর সঙ্গে মেলে না। যেহেতু বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ জনমতই গণতন্ত্রের পক্ষে এবং তারা মনে করে তাদের জন্য গণতন্ত্রই উপযোগী, তাই উন্নয়নের নামে গণতন্ত্র খর্ব করা ঠিক নয়।

টেকসই উন্নয়নের জন্য কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা উত্তম তা নিয়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাত্ত্বিক আলোচনার শেষ নেই। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের[৩৩] (সানেম) দ্বিতীয় বার্ষিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে গণতন্ত্রের ঘাটতি প্রসঙ্গে যে কথাটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো, উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রের ঘাটতি মেনে নেওয়া যায় না। সানেম এর আলোচকবৃন্দ যে কথাটি বিশেষভাবে বলেছেন তা হলো, উন্নতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে ভালো শাসনব্যবস্থা। স্বৈরতন্ত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় স্বল্পমেয়াদি ও টালমাটাল। অন্যদিকে, গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হয়। এ ব্যবস্থায় মানবসম্পদের উন্নতি বেশি হয়।

উন্নয়ন কেবল আর্থিক দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উন্নয়ন বলতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারকেও বোঝায়। এদিক দিয়ে গণতন্ত্র উন্নয়নের একটা অংশ। শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে যে তাত্ত্বিক বিতর্ক রয়েছে, সে বিষয়ে বলা যায়, তত্ত্বের জায়গায় এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রের চেয়ে ভালো। একইভাবে গণতন্ত্র উন্নয়নের পথে বাধাও তৈরি করে না। স্বৈরাচার যখন দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে চায়, তখন উন্নয়ন এগিয়ে নেয়। তবে স্বৈরাচারের প্রবৃদ্ধি স্বল্পমেয়াদি হয় ও অনিশ্চয়তা থাকে। এ বিষয়ক সব তাত্ত্বিক আলোচনা বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে, উন্নয়ন এগিয়ে নিতে গণতন্ত্র স্বৈরশাসনের চেয়ে ভালো। এটা প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে, মানবসম্পদের উন্নতি করে, বিনিয়োগকারীদের আস্থা দেয়।

১০. গণতন্ত্র চর্চায় নির্বাচন

নির্বাচনই সাধারণ নাগরিকদের মতামত প্রতিফলনের উপায় হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রের নাগরিকদের দাবি সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের জবাবদিহি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার অন্যতম উপায় হলো নির্বাচন। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিকদের চাহিদাগুলোকে তাদের নীতির সঙ্গে সমন্বয় করতে পারে। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র চর্চা হয়, বিশ্বে এমন দেশের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা

[৩৩] ২০০৭ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হলো সানেম। নিবন্ধনভূক্ত কতিপয় জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ফার্ম এর উদ্যোক্তা। দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ওপর জোর প্রদানের জন্য একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা এর প্রধান লক্ষ্য। উৎপাদন, বিনিময় ও প্রচারণা কৌশলকে উন্নত করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সামষ্টিক অর্থনীতি, দারিদ্র্য বিমোচন, শ্রমবাজার, শ্রমপরিবেশ, রাজনৈতিক অর্থনীতি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থান এর বিবেচনার অন্যতম ক্ষেত্র। এ প্রতিষ্ঠানটি নৈর্ব্যক্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, সর্বোৎকৃষ্ট গুণগত মানের নিশ্চায়ন এবং দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোর নীতি ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে গবেষণা করে। সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানটি তাদের গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আছে এমন দেশের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের ২০১৭ সালের 'সুশাসন ও আইন' শীর্ষক বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে[৩৪] একথা বলা হয়েছে। গত তিন দশকে বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক চর্চার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক বলেছে, ১৯৮৫ সালে ৪০ টির বেশি দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চর্চা হয়েছিল। ২০১৫ সালে এসে এমন দেশের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯০ টির বেশি। অন্যদিকে ১৯৮৫ সালে ৯০ শতাংশের বেশি নির্বাচনই সুষ্ঠু ও অবাধ হতো। এখন তা ৬০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। 'বনেদিরাই ক্ষমতার বিভিন্ন পর্যায়ে থাকে'-বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে এমনটাই বলা হয়েছে। বিশ্বের ছয়টি অঞ্চলের ১২ টি দেশের গত ১০০ বছরের রাজনৈতিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছে বিশ্বব্যাংক। দেশগুলো হলো বলিভিয়া, ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, কোরিয়া, রাশিয়া, রুয়ান্ডা, স্পেন, শ্রীলংকা, তিউনিসিয়া ও তুরস্ক। এসব দেশে বনেদি শ্রেণিই নীতিনির্ধারণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বনেদি শ্রেণির অন্যতম হলো সরকার প্রধান, আইন প্রণেতা, বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, স্থানীয় সরকার, আমলা, গণমাধ্যম, অর্থনীতিবিদ ও সুশীল সমাজ।

প্রতিবেদনে আরও দেখানো হয়েছে যে, সব কটি দেশের সরকার প্রধানই নীতিনির্ধারণের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। রাশিয়া, রুয়ান্ডা ও তুরস্কে নীতিনির্ধারণে সরকার প্রধানের একক আধিপত্য থাকে। বাকি সব দেশেই সরকার প্রধানের পাশাপাশি আইন প্রণেতার অংশগ্রহণ আছে। ব্রাজিলেই শুধু নীতিনির্ধারণে গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ রয়েছে। আর একমাত্র বলিভিয়ায় সুশীল সমাজ ও স্থানীয় সরকার নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বে এখন গণতন্ত্রের অভিন্ন মডেল নেই। একেক অঞ্চল ও একেক দেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে নানা অবস্থা বিরাজ করছে। যেমন, ভারতের গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা যায়, সেখানে রাজনীতিতে বনেদি শ্রেণির পাশাপাশি সাধারণ মানুষ প্রবেশ করছে। আবার শ্রীলংকায় বনেদি শ্রেণির হাতে রাজনীতি রয়ে গেছে। রাশিয়ায় গণতন্ত্র চর্চার কথা বলা হলেও সেটি আন্তর্জাতিক মানের নয়। আফ্রিকার গণতন্ত্রের ধরন আবার ভিন্ন। এভাবে একেক দেশে একেক অবস্থা বিরাজ করছে। বিশেষ করে আইনের মারপ্যাঁচে ও গায়ের জোরে নির্বাচন প্রক্রিয়া কুক্ষিগত করার নানা চেষ্টা ও নির্বাচনী কারচুপি অনেক দেশেই লক্ষ্যণীয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের চর্চা বাড়লেও তার মান বাড়েনি এবং গ্রহণযোগ্যতা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

---

[৩৪] দেখুন, 'Governance and the Law' *World Development Report 2017,* A World Bank Group Flagship Report, 1818 H. Street, NW, Washington DC, 20433.

১১. গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সুদীর্ঘ ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, জাতিগঠন ও রাষ্ট্রগঠনে গণতন্ত্রের আকাঙ্খা কতটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও অধিকাংশ দেশই গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় খুব বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেনি। কারণ, দেশগুলো এখন পর্যন্ত 'নির্বাচনী গণতন্ত্র'-এর প্রাথমিক স্তরটিও অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। এসব দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এখনও ভোটের রাজনীতিতে ব্যস্ত। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত দলীয় কার্যক্রম ও রাজনীতি গণতন্ত্রের আপাতসৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেও ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের রাজনীতির জন্য শঙ্কাজনক পরিস্থিতি তৈরি করছে। আবার সাম্প্রতিককালে উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশগুলোর সাফল্য নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে যতটা সাড়া দেখা যাচ্ছে, উন্নয়নকে গণতন্ত্রের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ ততটা দেখা যাচ্ছে না।

এখন যে প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয় তা হলো, এসব দেশের গণতন্ত্রের কি তাহলে কোনো অর্জনই নেই? আপাত সব অর্জনই কি পুরোপুরি ব্যর্থ হলো? নির্বাচনী গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী? টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র এসব দেশে আদৌ ভূমিকা রাখতে পারবে কি? তাহলে এসব দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতটা কেমন হতে পারে? এ কথা সত্য, এসব দেশের গণতন্ত্র এখন পর্যন্ত সুসংহত হতে পারেনি। তাই বলে গণতন্ত্রের কোনো উপাদানই তারা অর্জন করতে পারেনি, তা বলা ঠিক হবে না। রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিবর্তন, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, জনমিতিতে শিক্ষিত ও সচেতন মানুষের নিয়ত প্রসার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দাবি প্রভৃতি এসব দেশের গণতন্ত্রকে সঠিক পথে রাখার একটি অদৃশ্য চাপ সৃষ্টি করেছে।

গণতান্ত্রিক দেশের জাতীয় ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক এ পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতা থাকলেও এ নিয়ে চিন্তাভাবনা ও বিতর্কের জায়গা আছে। রাজনৈতিক এসব পরিবর্তনকে পাশ কাটিয়ে এগোনোর কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। আগামী দিনে এসব দেশের জাতীয় ও স্থানিক নির্বাচনগুলোতে গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন, রাজনৈতিক সহিংসতা ও সংস্কৃতির অসারতা, নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও পেশাদারি, গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা প্রভৃতি এসব দেশের গণতন্ত্রের রাজনীতিতে ক্রমশ নিয়ামক হয়ে উঠবে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং উন্নয়নবিদ মনে করেন, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রকে টেকসই গণতন্ত্রে রূপান্তর করতে হলে সামাজিক ও

রাজনৈতিক সুযোগের পাশাপাশি নাগরিকের অর্থনৈতিক সুযোগ ও সমতা থাকা দরকার। সমসাময়িককালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গণতান্ত্রিক দেশগুলো ব্যাপক সাফল্য অর্জন করলেও ধনী-গরিব ও শহর-গ্রামের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কারণে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের সব অর্জন ম্লান করে দেওয়ার শঙ্কা দেখা যাচ্ছে। কারণ, বুর্জোয়া গণতন্ত্র এমন এক হাইব্রিড ব্যবস্থা, যা আপাত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দিতে পারলেও জনগণের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। দীর্ঘমেয়াদি এই ব্যবস্থা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে আবার উসকে দেয়। তাই গণতন্ত্রকে কেন্দ্র ধরে যদি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগের সমান বন্টন করা না যায়, তাহলে টেকসই গণতন্ত্র সম্ভবত এসব দেশের জন্য স্বপ্নই হয়ে থাকবে।

গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা যতটা রয়েছে, ততটাই রয়েছে নানামুখী চ্যালেঞ্জ। এসব দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনগুলো গণতন্ত্রের বহুমাত্রিকতাকে যেভাবে উন্মোচন করছে, তার পরিচর্যা ও বিকাশ টেকসই গণতন্ত্রের পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম। দক্ষ ও কর্মক্ষম জনসম্পদ, কৃষিতে বিপ্লব, প্রবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে যেকোনো দেশের জন্য আশার বাণী বহন করে। তবে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যেকোনো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শুধু অর্থনৈতিক বা অবকাঠামোগত উন্নয়নই যথেষ্ট নয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য চাই একটি অংশীদারিত্বমূলক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারসম্পন্ন , জনকল্যাণমূলক, সহিষ্ণু, শান্তিকামী ও সমৃদ্ধ সমাজ। এর জন্য স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক রাজনীতির কোনো বিকল্প নেই। আজকের রাজনীতিই ঠিক করবে আগামী দিনের রাজনৈতিক পৃথিবী কেমন হবে। ভিন্নমত ও আদর্শের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাব ক্রমেই বাক, ব্যক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা সংকুচিত করে বৈশ্বিক রাজনীতিতে এক দমবন্ধ পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। এ পরিস্থিতি সৃষ্টিশীলতা বিকাশের পরিপন্থী। সুস্থ রাজনীতির জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। আইনের শাসন, সুযোগের সমতা, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সম-অধিকার ও সম-অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্রের পথেই যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়
পুঁজিবাদের উদ্ভব, স্বরূপ ও বিকাশ

১. পুঁজিবাদের উদ্ভব

উনিশ শতকের শুরু থেকে 'পুঁজিবাদ' শব্দটি বিশেষ এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে।[১] সাধারণ অর্থে নয়, এক বিশেষ ঐতিহাসিক পর্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'পুঁজিবাদ' শব্দটি উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজের ফসল। এটি একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যার একাধিক পর্ব আছে। কার্যত সতের শতক থেকে অদ্যাবধি এর বিস্তার। 'পুঁজিবাদ' বিশেষণটি সমগ্র সমাজের বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সমন্বিত সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। 'পুঁজিবাদ' এবং 'বুর্জোয়া' শব্দ দুটি প্রায়শই একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২] তবে শব্দ দুটি পরিপূরকভাবে ব্যবহৃত হলেও শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। মার্কসীয় পরিভাষায় 'পুঁজিবাদ' শব্দটি বিশেষার্থে একটি উৎপাদন পদ্ধতিকে বোঝায় এবং 'বুর্জোয়া' শব্দটি সমাজের আদলটিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩]

এক বৈপ্লবিক এবং প্রগতিশীল রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামন্তবাদী সমাজ পুঁজিবাদী সমাজের রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে উৎপাদন যন্ত্র তথা উৎপাদন কৌশলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। সামন্ত সমাজের কাঠামোগত এবং গুণগত পরিবর্তনের ফলে পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব ঘটে। পূর্বের ভূমিদাসরা হয় মুক্ত শ্রমিক, পণ্য উৎপাদন যায় বেড়ে। নগর ও বাজারের প্রসার ঘটে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। তাই পুঁজিবাদী সমাজ সভ্যতার বিকাশে এক প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত। পুঁজিবাদী সমাজের উন্মেষ ও বিকাশের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানা, মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন, শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ভৌগোলিক আবিষ্কার, উদারনৈতিক তথা ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন, অবাধ বাণিজ্য নীতি ইত্যাদি উপাদানসমূহের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

---

[১] শোভনলাল দত্তগুপ্ত ও উৎপল ঘোষ, *মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০, পৃ. ৯২।
[২] *প্রাগুক্ত*।
[৩] *প্রাগুক্ত*।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয় নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে। তার মধ্যে দিক নির্ণয় যন্ত্র, বন্দুক, ছাপাখানা, জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব, নতুন ভূভাগ আবিষ্কার, কলোনী স্থাপন, খ্রিস্ট ধর্মের সংস্কার ও প্রচার ইত্যাদি প্রধান। এ প্রসঙ্গে অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বও কম নয়। পূর্বে অধিকাংশ জনসমাজ সামন্ত প্রভূ বা গোত্র প্রধানের পরিচালনাধীনে ছিল। সুগঠিত কোনো রাষ্ট্র ছিল না। ক্রমে ক্রমে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। সামন্ত রাজাদের ভূভাগকে একত্রিকরণের মাধ্যমে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। পূর্বে মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাদের চাহিদাও বেশি ছিল না। পৃথিবীর এক অঞ্চলের মানুষের সাথে অন্য অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সমাজ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বের দাবিদার ছিল দিক নির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার। এ আবিষ্কারের ফলে বিশেষত নাবিকগণ পৃথিবীর অনেক ভূভাগ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এতে করে এক অঞ্চলের মানুষের সাথে অন্য অঞ্চলের মানুষের পরিচয় ঘটে। গোলাবারুদ ও বন্দুক আবিষ্কারের ফলে শক্তি পরীক্ষায় যারা বলবান, সেসব নৃপতি বৃহত্তর আয়তনের এলাকার ওপর প্রাধান্য করতে সক্ষম হয়। যাদের হাতে এ ধরনের শক্তি ছিল, তারা সহজেই নিজ রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করে। এভাবে জন্মলাভ করে জাতীয় রাষ্ট্র এবং অবসান হয় সামন্ত রাষ্ট্রের।

ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে প্রচারের ব্যাপক সুবিধা হয়। এতে করে মানুষ ভালমন্দ সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে আবিষ্কার হয় নানা ধরনের যন্ত্রপাতি যা শিল্প-কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়ক হয়। কৃষিভিত্তিক সমাজ ছেড়ে মানুষ শহর জীবনে বসবাস করতে শুরু করে। এভাবে ব্যক্তিগত সম্পদের সৃষ্টি হতে থাকে এবং পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার গোড়াপত্তন হয়। অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলকথা হলো অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি অবাধ সুবিধা পাবে। সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি ইচ্ছামতো আয়-উপার্জন ও ব্যয় করতে পারবে। এভাবে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষ কৃষি ছেড়ে ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ব্যবসায় প্রচুর লাভ হওয়ার ফলে মানুষ কৃষি ছেড়ে ব্যবসার দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠে। নতুন বণিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এই বণিক শ্রেণি হলো পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণির পূর্বসূরী। নতুন নতুন ভূভাগ আবিষ্কার হওয়ার ফলেই এটা সম্ভব হয়ে ওঠে। বিদেশে জিনিসপত্রের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য বণিক শ্রেণি হস্তচালিত

শিল্পের মালিকদের কিছু অর্থ যোগান দিতে থাকে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তারা সেগুলো অন্যত্র বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়। প্রাথমিকভাবে চাহিদা মেটানো সম্ভব হলেও পরবর্তীতে চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেজন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর উৎপাদনক্ষম মাধ্যম আবিষ্কারের। এভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কৃষি জমির ওপর সামন্ত প্রভূদের প্রাধান্য তো ছিলই, এ সুযোগে কল-কারখানার মালিক ও ভূস্বামীরা ক্রমে ক্রমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। তাদের হাতে সমস্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয় এবং এভাবে পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ লাভ ঘটে। ঠিক কোন সময়ে পুঁজিবাদের উৎপত্তি হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, পুঁজিবাদের ধারণা কৃষিনির্ভর সমাজ থেকেই উদ্ভব হয়েছে এবং এর চরম প্রকাশ ঘটে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে।

মার্কসীয় মতে, সামন্তবাদকে অপসারিত করে তার স্থলে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা হলো পুঁজিবাদ।[৪] উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর ব্যক্তিমালিকানা এবং উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণই পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি। দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় ও ভোগকেন্দ্রিক সৃষ্ট সঙ্কট, ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট বেকারত্ব, জনগণের দারিদ্র্য, পুঁজির মালিকদের অবাধ প্রতিযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি পুঁজিবাদের উদ্ভবের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সামন্তবাদের পটভূমিতে এর ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল, কেননা পুঁজিবাদ তখন সামন্তবাদের তুলনায় উচ্চতর শ্রম উৎপাদনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল।[৫] ষোড়শ শতকে পুঁজিবাদী ধারণার উদ্ভব হলেও বিশ শতকে এসে পুঁজিবাদ তার চূড়ান্ত স্তর সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছে যায়, স্থাপিত হয় একচেটিয়াত্ব ও কুবেরতন্ত্রের আধিপত্য। আরও উদ্ভব ঘটে রাষ্ট্রীয় মনোপলি পুঁজিবাদের যা মনোপলিসমূহের শক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতার সম্মিলন ঘটায় এবং প্রচন্ডভাবে সমরবাদ ও প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উদ্ভবের ফলে পুঁজিবাদ এক ধরনের সঙ্কটের মুখোমুখি হয়। তখন থেকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা আঞ্চলিক যুদ্ধ, স্থানীয় উত্তেজনা সৃষ্টি, স্নায়ুযুদ্ধ, প্রভাববলয় সৃষ্টি, অর্থনৈতিক আগ্রাসন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সমাজবিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য তারা বিভিন্ন সংস্কারমূলক ও আপোসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিণামে অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা ও গতিহীনতার দরুন বিশ শতকের আশির দশক থেকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ভিত ভেঙ্গে

[৪] হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩, পৃ. ২৩৯।
[৫] *প্রাগুক্ত*।

পড়তে শুরু করলে পুঁজিবাদ পরিবর্তিত বিশ্ব ও জাতীয় পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে আজও পৃথিবীর বুকে টিকে রয়েছে।

২. পুঁজিবাদের স্বরূপ

জীবনধারণের প্রয়োজনে পৃথিবীর যে কোনো জনগোষ্ঠীকেই দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও বন্টন করতে হয়। উৎপাদন ও বন্টনের একটি বিশেষ পদ্ধতি হলো পুঁজিবাদ।[৬] পুঁজিবাদ হলো এমন একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে তোলার ও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা মুনাফা লাভের অবাধ স্বাধীনতা থাকে। বস্তুত ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হলো পুঁজিবাদের প্রকৃত রূপ। অর্থনৈতিক দিক থেকে এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপায় ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে, আর যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল প্রেরণা হিসেবে থাকে পুঁজির সঞ্চয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমাজ ও সভ্যতার উন্নতির এমন একটি স্তর যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থা, কলকারখানা ও শ্রমিকের শ্রম নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

পুঁজিবাদ বলতে মূলত শিল্প সমাজের একটি বিন্যাসকে বোঝানো হয়, যেখানে উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত এবং অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ বিদ্যমান থাকে।[৭] মৌলিকভাবে পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার ভিত্তিমূলে থাকে মুনাফা প্রাপ্তির প্রবণতা। সেজন্য এ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থ উপার্জনের জন্য এর পরিপূর্ণ প্রয়োগ, ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, লগ্নি পুঁজির ব্যবহার এবং মজুরি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার একদিকে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ও শ্রমকে ব্যবহার করে, আর অন্যদিকে ক্রেতাদের জন্য ভোগ্যপণ্য পছন্দ করে নেয়ার স্বাধীনতা অব্যাহত রাখে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে নব নব আবিষ্কার সম্ভব হয় এবং উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পায়। ভোক্তার চাহিদা বিবেচনা করে উৎপাদনকারী দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান নির্ধারণ করে। আবার

---

[৬] লিউ হুবারম্যান, 'সমাজতন্ত্রের অ আ ক খ' (সম্পা.) শরীফ শমশির, *সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে*, ঢাকা: গণপ্রকাশন, ২০১৩, পৃ.১১।

[৭] David Walker and Daniel Gray, *Historical Dictionary of Marxism*, Lanham, Maryland, UK: Scarecrow Press, 2007, p-45.

ভোগকারীর নিজস্ব পছন্দ, ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী যে কোনো দ্রব্য, যে কোনো পরিমাণে এবং যে কোনো সময়ে অবাধে ভোগ করার স্বাধীনতা থাকে বলে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে অবাধ দরকষাকষির ফলেই দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। এখানে কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় না। উৎপাদনকারীরা তাদের নিজস্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে এবং মুনাফার প্রতি দৃষ্টি রেখে উৎপাদন করে। পুঁজিবাদে মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার ফলেই পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়। এ ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উদ্বৃত্তের মালিক। শ্রমিকদের শোষণ করে দিন দিন তাদের পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ ঘটে। উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণের মাধ্যমে দিন দিন তাদের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে আয়ের অসমতার সাথে সাথে সম্পদের অসমতা বৃদ্ধি পায়। আয়ের অসমতা তথা সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকার কারণে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত প্রভৃতি শ্রেণির উদ্ভব হয়।

কার্ল মার্কস বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পুঁজিবাদের ব্যাখ্যা করেছেন।[৮] উনিশ শতকে মার্কসীয় দর্শনের উদ্ভব হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন একদিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও চিরায়ত জার্মান দর্শন বিকাশ লাভ করেছিল, অন্যদিকে পুঁজিবাদী বৈরি সামাজিক সম্পর্ক ও মানবিক সংকট বিরাজ করছিল।[৯] ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী, সাধারণভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ তথা বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন পদ্ধতিই তার সামাজিক জীবনের ভিত্তি।[১০] মার্কস মনে করতেন, উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি পুঁজিবাদী ধারণার বিকাশে সহায়ক হয়েছে। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে কতগুলো শক্তির সমন্বয়ে। যেমন, বাণিজ্য পুঁজির আবির্ভাব, মুদ্রা খাটিয়ে মুদ্রা অর্জনে পুঁজির আগমন, পুঁজির সার্বিক নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা, কাঁচামালকে দক্ষতা সহকারে ব্যবহার করে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করার বৃহত্তর সম্ভাবনা সৃষ্টি, ক্রমবর্ধমান হারে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি মুদ্রার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া ইত্যাদি।[১১]

---

[৮] *Ibid.*

[৯] হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৪৮।

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫।

[১১] দেখুন, David Walker and Daniel Gray, *Historical Dictionary of Marxism*, Lanham, Maryland, UK: Scarecrow Press, 2007, p-46.

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে শিল্প কারখানা ও শ্রমিকদের শ্রম পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি একটা পণ্য হিসেবে গণ্য হয়। শ্রমশক্তি এমন একটা পণ্য যা নিজের মূল্যের চেয়ে বেশি পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে। শ্রমিক শিল্প কারখানায় খেটে তার শ্রমশক্তির মূল্যের চেয়ে যেটুকু মূল্য বেশি সৃষ্টি করে তা হলো উদ্বৃত্ত মূল্য। পুঁজিপতি তার একটা অংশ শ্রমিককে মজুরি হিসেবে দিয়ে থাকে। অবশিষ্ট অংশ পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে। উৎপাদিত সামগ্রীর ওপর পুঁজিপতির নিরঙ্কুশ অধিকার থাকে। পুঁজিপতির একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা বৃদ্ধি। শ্রমিকগণ উৎপাদিত দ্রব্যের সামগ্রিক মালিকানা থেকে বঞ্চিত বলে মুনাফা থেকেও বঞ্চিত। ফলে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার ভিত্তিতে সমাজ পুঁজিপতি ও শ্রমিক এ দুটো পরস্পরবিরোধী শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ক শোষণের রূপ নেয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদ হলো এমন একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তি মালিকানার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং সেই সঙ্গে সুনিশ্চিত হয় উৎপাদনের উপকরণের ওপর মালিকানা ও মুনাফা। এ ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর মালিকের একচেটিয়া অধিকার থাকে এবং শ্রমিকেরা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন করলেও উৎপাদিত দ্রব্যের মালিকানা ও তার মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয়।

৩. পুঁজিবাদ বিকাশের ধাপসমূহ

মার্কসবাদীদের মতে, সামন্ততন্ত্রের গর্ভ থেকেই জন্ম হয় পুঁজিবাদের। ক্রমবিকাশের ধারায় পুঁজিবাদ দুটি স্তর অতিক্রম করেছিল।[১২] স্তর দুটি হলো-প্রাক একচেটিয়া স্তর এবং একচেটিয়া স্তর। উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানা ও মজুরির বিনিময়ে নিযুক্ত শ্রমিককে শোষণ প্রাক একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের গতিপথ নির্ধারণ করেছিল। একচেটিয়া স্তরে প্রতিযোগিতা ও উৎপাদন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হলো শিল্পোন্নয়নের এক বিশেষ পর্যায়। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের পরিবর্তে বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন থেকেই শ্রম শিল্পের প্রসার হতে থাকে। আমরা পুঁজিতন্ত্র বিকাশের মূলত তিনটি ধাপ দেখতে পাই। ধাপগুলো হলো-বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ, শ্রমশিল্পনির্ভর পুঁজিবাদ এবং অর্থনির্ভর পুঁজিবাদ।

পুঁজিবাদ বিকাশের প্রথম ধাপ হলো বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ। সামন্ত প্রভূদের ভোগ-বিলাস যতই বেড়ে চলল বণিক শ্রেণি ততই তাদের যোগান দিতে লাগল। সামন্তবাদের শেষ পর্যায়ে বণিক শ্রেণি

[১২] দেখুন, David Walker and Daniel Gray, *Historical Dictionary of Marxism*, Lanham, Maryland, UK: Scarecrow Press, 2007, p-46.

আইন করে জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করে এবং জমিদারেরা চাষীদের নিজেদের কারখানায় নিয়োগ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৈধ বলে স্বীকৃত হওয়ার ফলে এখানে কেউ কারও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ব্যক্তিগত ইচ্ছায় সম্পত্তি বাড়াতে গিয়ে একদল লোক ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে, অন্যদল আস্তে আস্তে নিঃস্ব হয়ে হয়ে যেতে থাকে। কল-কারখানার মালিকেরা ক্রমেই ধনী হতে থাকে, আর সে কল-কালখানায় যারা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ছিল সে শ্রমিকেরা হতে থাকে গরিব। অর্থাৎ সমাজে দেখা দিল দুটি শ্রেণি। একটি হলো বুর্জোয়া, আর অন্যটি হলো প্রলেতারিয়েত। সামন্ততন্ত্রের শেষ দিকে সদ্যজাত বুর্জোয়া শ্রেণিই ছিল বৈপ্লবিক। এরাই সামন্ততন্ত্রের কাঠামো ভেঙ্গে পুঁজিবাদের জন্ম দেয়।

নগর বাজারের প্রসার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এভাবে বাণিজ্যের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ ঘটে। সতের শতকে গ্রীস, রোম ও আরব এবং আঠার শতকে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে যে পুঁজির বিকাশ ঘটে তা বাণিজ্যনির্ভর পুঁজিবাদের সূচনা করে। মানুষ অধিক উৎপাদনের জন্য কলকারখানার সাহায্য গ্রহণ করতে থাকে। হস্তচালিত শ্রম রূপান্তরিত হলো কল-কারখানার উৎপাদনের মাধ্যমে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই উৎপাদন ব্যবস্থা শুরু হলো শিল্পভিত্তিক। আর এ উৎপাদন ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল। সূচনা হলো শিল্পনির্ভর পুঁজিবাদের। আঠার শতকে শিল্প বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে তার ফলে শিল্পনির্ভর পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ ঘটে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তখন উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নতির দিকে পুঁজিপতিদের আর তেমন নজর থাকে না। ব্যবস্থাপক শ্রেণি এবং টেকনোক্র্যাটরা তখন সে দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে থাকে। পুঁজিপতিরা তখন কেবলমাত্র আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেই সন্তুষ্ট থাকে এবং এভাবেই তারা মুনাফার সিংহভাগ দখল করে। আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্ব শুধু শিল্প কল-কারখানায়ই নয়, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাংক, বীমা ইত্যাদিতে অর্থ লগ্নি করে পুঁজিগঠন অব্যাহত রাখে। এভাবে অর্থনির্ভর পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে।

৪. পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পর্কিত ওয়েবারের তত্ত্বের বিশ্লেষণ

ম্যাক্স ওয়েবার পুঁজিবাদী সমাজ ও এর বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মের সাথে অর্থনীতির সম্পর্কের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ ধর্ম কীভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটায়

সেটাই ছিল তাঁর আলোচনার মুখ্য বিষয়। তিনি *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*[১৩] গ্রন্থে প্রোটেস্টান্টদের ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে অর্থনীতির সহসম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। ষোল ও সতের শতকে পশ্চিমে কেন পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল সে বিষয়ে তিনি প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নৈতিকতার কথা বলেন। তবে প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতাকে তিনি পুঁজিবাদী কাঠামোর সাথে সরাসরি যুক্ত করেননি। তিনি মনে করেন, প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতা পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং যে উদ্দেশ্য পুঁজিবাদের বিকাশকে সম্ভব করেছে তার সাথে সম্পৃক্ত।

ওয়েবার আধুনিক ইউরোপীয় পুঁজিবাদের বিকাশে প্রোটেস্টান্টিজম বিশেষত ক্যালভিনিজম এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি অ-বুদ্ধিজাত ও বুদ্ধিজাত এ দুই ধরনের পুঁজিবাদকে চিহ্নিত করেন। অ-বুদ্ধিজাত পুঁজিবাদ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন প্রোটেস্টান্ট ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে বিদ্যমান পুঁজিবাদকে। বুদ্ধিজাত পুঁজিবাদ বলতে বোঝানো হয়েছে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের নীতিবোধকে যা সে সময়ে ইউরোপীয় সমাজে সঞ্চালিত হয়েছে। অন্য কথায় এটি হলো আধুনিক ইউরোপীয় পুঁজিবাদ। বুদ্ধিজাত ও অ-বুদ্ধিজাত পুঁজিবাদের মধ্যে বিভক্তি রেখা তৈরি করে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম ও তার নৈতিকতা।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা এমন এক মানসিকতার জন্ম দেয় যার মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। অর্থ সংগ্রহই এখানে প্রধান এবং সেটি যত বেশি সম্ভব সংগ্রহ করা। কিন্তু ওয়েবার বলেছেন এই মনোবৃত্তি শুধু পুঁজিবাদে নয়, সব শ্রেণি-পেশার জনগণ এবং সব সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে। তিনি বলেন অসীম লোভ পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য নয়, এটি তার স্পিরিটও নয়। পুঁজিবাদে মুনাফা আত্মসাৎ করা হয় ঠিকই, কিন্তু সেটি ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে যৌক্তিক উপায়ে সংগৃহীত হয়। *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* গ্রন্থে আধুনিক পুঁজিবাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে ওয়েবার প্রথমেই পুঁজিবাদী উদ্যোগ থেকে মুনাফাকে পৃথক করেন। তিনি মনে করেন সম্পত্তির প্রতি লোভ সব সময় সব স্থানে পৃথিবীতে ছিল, কিন্তু পুঁজিবাদী কার্যক্রম গ্রহণে এর কোনো ভূমিকা নেই। সম্পদ সর্বত্র অর্জিত হতো অর্থনৈতিক বিনিময়ের মাধ্যমে।

---

[১৩] দেখুন, Max Waber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, translated by, Talcott Parsons & Anthony Giddens, Unwin Hyman: London & Boston, 1930.

ব্যবিলন, প্রাচীন মিশর, চীন, ভারতবর্ষ এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপে পুঁজিবাদ বানিজ্যিক কার্যক্রমের আকারে টিকে ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র পশ্চিমে অতি সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদী কর্মকান্ড শ্রমের যৌক্তিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছে। শ্রমের যৌক্তিক সংগঠন বলতে ওয়েবার নিয়মানুগ ও বিবেচনাপ্রসূত প্রশাসনিক কার্যক্রমকে বুঝিয়েছেন যা পুঁজিবাদী কর্মপ্রচেষ্টায় কাজ করে যাচ্ছে। একটি মৌলিক পুঁজিবাদী উদ্যোগ গ্রহণে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে-শৃংখলাবদ্ধ শ্রমশক্তি এবং পুঁজির নিয়মিত বিনিয়োগ। এ দুটো বিষয়ই পুরনো ঐতিহ্যবাহী অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ধারণা থেকে পৃথক।

আধুনিক পুঁজিবাদের পূর্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণির প্রাধান্য থাকলেও তা কেন যৌক্তিক হয়নি ওয়েবার সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন বিশ্বব্যাপী মজুতদার, পাইকারী ব্যবসায়ী অথবা বহিঃবাণিজ্যের সাথে যুক্ত বণিক শ্রেণির আধিক্য ছিল। সে সময়ে ব্যাংক ছিল এবং ব্যাংক বহুমূখী কর্মতৎপরতার জন্ম দিয়েছে। মহাজন ও হুন্ডি ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতায় অংশীদার হয়েছে। এরা যুদ্ধ বা লুটতরাজের পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছে, উপনিবেশে দাসশ্রম কাজে লাগিয়েছে, রাজনৈতিক দলকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। ফলে কালোবাজারি ও মজুতদারির জন্ম হয়েছে। এ সকল অর্থনৈতিক তৎপরতার মধ্যে বাণিজ্য ও ব্যাংকের লেনদেন ছাড়া কোনোটাই যৌক্তিক ছিল না। অর্থাৎ এ ধরনের পুঁজিবাদে প্রজ্ঞা ও যুক্তি কাজ করেনি, কাজ করেছে শক্তি ও জোরপূর্বক কিছু করার মানসিকতা। বিপরীত দিকে আধুনিক পুঁজিবাদ হলো মুক্ত শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন পুঁজিবাদ। ওয়েবারের মতে এই পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হলো মুক্ত শ্রম। এর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রজ্ঞাভিত্তিক শিল্প সংগঠন যেখানে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য হলো যুক্তি। ওয়েবার আরো দুটি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। প্রথমত, কৃষি ও গৃহস্থালীর কাজ থেকে ব্যবসা পৃথকীকরণ এবং যুক্তিশীল হিসাব সংরক্ষণ। এর সাথে আরো যোগ করা যেতে পারে প্রশাসনিক ও আইনের যুক্তিনিষ্ঠ কাঠামো। ওয়েবার এখানে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো পুঁজিবাদ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের সচেতন কর্মকান্ডের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং তা প্রজ্ঞাপ্রসূত। দ্বিতীয়ত, মানুষের প্রকৃতিতে এই প্রজ্ঞার আবির্ভাবের পেছনে একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ ক্যালভিনবাদ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ওয়েবার লক্ষ্য করেছেন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় প্রটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বীরা পুঁজির মালিকানায় প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

গতানুগতিক ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাস করা হয় যে, চার্চ ব্যক্তি ও ঈশ্বরের মাঝে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম এবং চার্চই ব্যক্তির মুক্তি এনে দিতে পারে।[১৪] এই বিশ্বাসের বদৌলতেই চার্চ ঈশ্বরের দয়ার দানে বৃহৎ কোষাগার হিসেবে গড়ে ওঠে। এটা পুঁজিবাদ উদ্ভব ও বিকাশের জন্য সহায়ক নয়। অন্যদিকে প্রোটেস্টান্টরা ঈশ্বর কর্তৃক স্বর্গবাসের জন্য পূর্ব নির্ধারণে বিশ্বাসী ছিল। তাদের মতে, সবাই মুক্তিযোগ্য নয় এবং ঈশ্বর কর্তৃক স্বর্গবাসের জন্য নির্ধারিত হবে না। প্রোটেস্টান্টবাদের একটি ধরন হিসেবে ক্যালভিনবাদই[১৫] পুঁজিবাদকে যুক্তিশীল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কারণ ক্যালভিনবাদ মনে করে, পরজগতে কে ঈশ্বরের কৃপায় ধন্য হবে অধবা কে ঈশ্বর কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হবেন তা কারও জন্মের পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। সুতরাং মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কোনো জাগতিক পন্থা বা ধর্মীয় তৎপরতা কোনোভাবেই কার্যকরী হয় না। এটি ক্যাথলিক ধর্মীয় বিশ্বাসের পুরোপুরি বিপরীত।

ধর্মীয় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ ক্যালভিনবাদে জন্ম নিয়েছে পরজগতের প্রতি পার্থিব অনীহা। যেহেতু শত চেষ্টা করলেও মানুষের ভাগ্য অপরিবর্তনীয় থাকবে, তাই ক্যালভিনবাদে পার্থিব জগৎকেই ঈশ্বরের আহ্বান এবং নির্দেশ অনুযায়ী সাজিয়ে নেওয়ার প্রবণতা জন্ম নেয়। নিজের পারিপার্শ্বিকতাকে ধর্মীয় আহ্বানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলে ঈশ্বরের কৃপালাভের সমপরিমাণ তৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব–এ ধরনের একটা বিশ্বাস জন্ম নেয়। তাই ক্যালভিনবাদে পার্থিব জগৎকে ঘিরে জন্ম নিয়েছে কিছু নীতিমালার। যেমন, সময় অপচয় না করা, সময় মানেই অর্থ, পরিমিত ব্যয় করা, সংযমশীল হওয়া ইত্যাদি। এগুলোই মানুষের অভ্যন্তরীণ জগৎকে প্রজ্ঞাভিত্তিক করেছে যার প্রভাবেই আধুনিক যৌক্তিক পুঁজিবাদের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে।

ক্যালভিনবাদ জনগণকে কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করে। কারণ তারা যদি অধ্যাবসায়ী হয় তবেই তারা অর্থনৈতিক সাফল্যের মাধ্যমে তাদের মুক্তির পথ উন্মোচিত করতে পারবে। ক্যালভিনবাদ মানুষকে পার্থিব জগতে কাজ করার জন্য প্রচন্ডভাবে চাপ দেয় যেন সে

---

[১৪] খ্রিস্টান ক্যাথলিক গীর্জা সাধারণ ধর্ম বিশ্বাসীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মযাজকদের কেউ কেউ এক প্রকার মুক্তিপত্র (Indulgence) বিক্রি করত। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে যে কেউ এই মুক্তিপত্র ক্রয় করে পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে বলে ঘোষণা দিলে সমাজের বিত্তবান মানুষেরা পাপমুক্তির আশায় তা ক্রয় করতে থাকে।

[১৫] জন ক্যালভিন ও তার অনুসারীদের প্রচারিত শিক্ষা, অনুশাসন ও উপদেশমালা নিয়ে গঠিত ধর্মীয় মতবাদ হলো ক্যালভিনিজম। এ মতবাদ নিয়তি, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব, বাইবেলের সর্বময় কর্তৃত্ব এবং ঐশ্বরিক দুর্নিবার করুণার কথা ঘোষণা করে।

কর্মবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ হতে পারে।[১৬] তাই ওয়েবারের মতে, ক্যালভিনিজম থেকেই পুঁজিবাদী কর্মোদ্যোগের নৈতিক প্রেরণা ও প্রণোদনা এসেছিল। ক্যালভিনের মতবাদসমূহকে ওয়েবার চিহ্নিত করেছেন ইস্পাত কঠিন বিশালতা হিসেবে, যা তার অনুসারীদের কাছ থেকে নিয়মানুবর্তিতা আশা করে। সংযমশীল আত্মনিয়ন্ত্রণের উপাদান প্রোটেস্টান্ট অন্যান্য উপদলগুলোর মাঝেও আছে কিন্তু ক্যালভিনবাদে সেই গতিশীলতা নেই। ক্যালভিনবাদ খৃস্টধর্মের যে নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করে তারই ব্যবহারিক পরিণতি হিসেবে প্রটেস্টান্ট দেশগুলোতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। মানব নিয়তির পূর্বনির্ধারণ, কর্মনিষ্ঠার দ্বারা ঈশ্বরের সেবা, আলস্য ও বিলাসিতার অনৌচিত্য, মিতব্যয়িতা ও সুদের ন্যায্যতা ইত্যাদি ক্যালভিনীয় ব্যাখ্যা প্রটেস্টান্টদের মধ্যে কঠোর সংযমবাদী নৈতিকতার উদ্রেক করে এবং পুঁজিবাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটায়।

ওয়েবার প্রজ্ঞাসম্পন্ন পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েই প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার কথা বলেছেন। মানব জীবনের সময়কালের স্বল্পতা বিবেচনায় প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতায় বলা হয়েছে সামাজিকতার মাধ্যমে সময় নষ্ট করা, অলস আলোচনা, বিলাসিতা, প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ঘুমানো ইত্যাদি সবকিছুই নৈতিকভাবে চরম দণ্ডনীয়। এ কারণেই সময়ের অপচয় সব পাপের মধ্যে প্রথম এবং অন্যতম পাপ বলে বিবেচিত হয়। সময় অশেষ মূল্যবান কারণ প্রতিটি মুহূর্ত অপচয়ের অর্থ হলো ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্তে যে শ্রমশক্তি মানুষের আছে তার অপচয়। একইভাবে কর্মহীন ধ্যান বা গভীর চিন্তাও মূল্যহীন। শ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে এখানে উৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবেই যৌক্তিক কর্মসূচি একটি জীবন দর্শন যা মূলত প্রোটেস্টান্টবাদের মধ্য দিয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে এবং তা আধুনিক পুঁজিবাদী শিল্পোদ্যোগ এবং জীবনাচরণকে অনুপ্রাণিত করেছে। ধর্মীয় এসব আহ্বান পালন করতে হলে অবশ্যই ব্যক্তির ভোগ-বিলাসকে ত্যাগ করতে হবে। ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ও কাজ করতে হবে। আর এ প্রবণতা থেকেই জন্ম নেয় পুঁজিবাদী স্পিরিট।

ওয়েবারের আলোচনায় আমরা আরও দেখতে পাই পুঁজিবাদী মনন বিকাশের পেছনে প্রোটেস্টান্টদের ধর্মীয় নৈতিকতা কাজ করে। এক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য ধর্ম যেমন-হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদী ও ইসলাম ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন চীন ও ভারতে পুঁজিবাদের

[১৬] George Ritzer, *Sociological Theory*, Newyork: Mcgraw Hill Inc. 1992, p. 254.

উন্মেষের পেছনে সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান থাকাকালীন সময়েও কনফুসিয়াসবাদ, হিন্দুধর্ম বা ইসলাম ধর্মীয় মতবাদ পুঁজিবাদী মননে ভূমিকা পালন করেনি। হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ও শান্তিভোগের মতবাদের সাথে জাতি-বর্ণ প্রথার ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে বলে ওয়েবার মনে করেন। যেকোনো মানুষ তার জাতিবর্ণের বাধ্যবাধকতার আলোকে আচরণ করে এবং সেটাই তার পরবর্তী পুনর্জন্মকালীন জীবনে ভাগ্য নির্ধারণের জন্য কাজ করে। পৃথিবীতে মানুষ যদি সঠিকভাবে তার কর্ম সম্পাদন করে যায় তবে পরবর্তীকালে সে স্বর্গপ্রাপ্তির চিন্তা করতে পারে। ওয়েবার মনে করেন হিন্দু ধর্মেও সংযমশীলতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কিন্তু সে সংযমশীলতা পার্থিব নয়, পরজগৎমুখী। যখন ভারতবর্ষ ব্যবসা-বাণিজ্যে সুসংগঠিত হয়েছিল এবং শিল্প ব্যবস্থাপনার বিকাশের শীর্ষে পৌঁছেছিল, তখন হিন্দু ধর্ম এবং এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জাতি-বর্ণ প্রথার প্রভাব ভারতবর্ষকে আধুনিক ইউরোপীয় পুঁজিবাদের সমতুল্য হওয়ার মতো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে বাধা দিয়েছিল। ওয়েবার মন্তব্য করেছেন, ধর্মীয় আইন যদি যেকোনো পেশাগত পরিবর্তন কিংবা যেকোনো প্রযুক্তিগত কর্ম পরিবর্তনকে শ্রেণি বা পদমর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর বলে মূল্যায়ন করে, তবে তার মধ্যে কখনোই অর্থনৈতিক কিংবা প্রযুক্তিগত বিপ্লব সাধনের চিন্তা করা যায় না।

বৈশ্বিক ধর্মের ক্ষেত্রে ওয়েবারের অন্যতম গবেষণার বিষয় ছিল প্রাচীন ইহুদীবাদ। প্রাচীন প্যালেস্টাইনে ইহুদীবাদ যে ঐতিহ্য চালু করেছিল তাকে বলা হয় 'নৈতিক ভবিষ্যৎ বাণী' যা তারা স্বর্গীয় ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত কাজ বলে মনে করত। নৈতিক ভবিষ্যৎ বাণীমূলক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই নবী বা রাসূল স্বর্গীয় আদেশ প্রচারে অধিক সক্রিয়। এ কারণে ইহুদীবাদ ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা সব সময় পাপ ও পরিত্রাণের দোদুল্যমানতায় ভুগেছে এবং ধর্মীয় রূপান্তরে এটি শক্তি যুগিয়েছে। এর অভাব প্রাচ্য দেশীয় ধর্মসমূহেও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রাচ্যের ধর্মানুসারীরা এ কারণেই পরলৌকিক ধর্মচিন্তায় মত্ত থেকেছে বেশি। ভারতবর্ষের মতো চীনেও একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসা এবং শিল্প কারখানার বিকাশ বেশ উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। চীনে মুদ্রা ব্যবস্থা এবং আইন কাঠামোর বিকাশ ঘটেছিল। ওয়েবারের মতে এসবই ছিল ইউরোপে যৌক্তিক পুঁজিবাদ বিকাশের অবশ্যম্ভাবী পূর্বশর্ত। চীনে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল এবং জনগণের মাঝে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা ও দক্ষতা উভয়ই ছিল। সেখানে সমাজ-সংঘ ছিল এবং সেগুলোতে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বহু মূল্যবান ধাতুর ব্যাপক প্রচলন ছিল। এইসব এবং অন্যান্য বস্তুগত অবশ্য পালনীয় শর্তাবলি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও চীনে পুঁজিবাদের বিকাশ না হওয়া প্রসঙ্গে ওয়েবার মনে করেন, চীনে সামাজিক,

কাঠামোগত এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা পুঁজিবাদের বিকাশকে প্রতিহত করেছিল। তার মানে অবশ্য এ নয় যে চীনে পুঁজিবাদ পুরোপুরিই অনুপস্থিত ছিল। সেখানে সুদে টাকা ধার নেওয়ার প্রচলন ছিল এবং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহকারী এবং সরবরাহকারীও ছিল। তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য যে ধরনের বাজার দরকার সে বাজার এবং অন্য উপাদানগুলো অনুপস্থিত ছিল।

ওয়েবার দেখান যে, পার্থিব জগৎকে ঘিরে ক্যালভিনবাদে জন্ম নিয়েছে কিছু নীতিমালার যা মানুষের অভ্যন্তরীণ জগৎকে যৌক্তিক করেছে। এর প্রভাবে সম্ভব হয়েছে এক ধরনের আধুনিক যৌক্তিক পুঁজিবাদের। যদিও এ বক্তব্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু তৎকালীন সমাজের পুঁজিবাদ বিকাশের ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন। সর্বোপরি, ওয়েবার বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রোটেস্টান্ট ধর্মের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ এ ধর্মের লোকদের এমন এক ধরনের আচরণ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে যা আধুনিক পুঁজিবাদের উৎপত্তির সাথে জড়িত। ক্যালভিনিস্টরা বস্তগত সাফল্য এবং সম্পদকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে দেখেছিল। ওয়েবারের মতে ক্যালভিনবাদ পশ্চিমে ব্যক্তির পরিত্রাণ লাভের প্রচেষ্টাকে নৈতিক বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে যেমন নিয়ন্ত্রণ করেছে তেমনি ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে কেন্দ্রীভূত করেছে। আর এ প্রবণতাই জন্ম দিয়েছে পুঁজিবাদী স্পিরিটের।

৫. পুঁজিবাদী শ্রম প্রক্রিয়া

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনায় সমাজের উৎপাদন শক্তি এক অনন্য মাত্রা লাভ করেছে এবং এর বিকাশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক ভূমিকা রাখছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষ উৎপাদন পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই শ্রম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। গতানুগতিক শ্রম প্রক্রিয়ার পরিবর্তন সাধন করতে তার সাথে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পেশাদারি জ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়েছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রম প্রক্রিয়ার দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। একদিকে, উৎপাদনের উপায় পুঁজিপতির সম্পত্তি এবং কেবল পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করলেই এ দুইয়ের সম্মিলন ঘটা সম্ভব। কাজেই অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির শ্রমপ্রক্রিয়ায় মজুরি শ্রমিক পুঁজির সাথে বাঁধা। শ্রমিকের শ্রমশক্তির ওপর তার নিজস্ব কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তা পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় পুঁজিপতির দ্বারা। অন্যদিকে, উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার বদৌলতেই উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী পুঁজিপতির সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়। প্রাক-পুঁজিবাদী সরল উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমিক নিজেই

উৎপাদন উপায়ের মালিক হতো, নিজের ইচ্ছামতো উৎপাদন করত এবং শ্রমের ফসলেরও অধিকারী হতো। কিন্তু পুঁজিবাদে শ্রমিকেরাই সকল সামাজিক সম্পদ তৈরি করলেও তার এক কানাকড়িরও মালিকানা পায় না। কারণ উৎপাদনের উপায়ের ওপর তাদের কোনো অধিকার নেই। আপাতদৃষ্টিতে শ্রমিক শ্রেণি স্বাধীন হলেও পুঁজিবাদী শোষণ থেকে তাদের কোনো মুক্তি নেই। আইনগতভাবে স্বাধীন হলেও মজুরি শ্রমিক অর্থনৈতিকভাবে পুঁজির সাথে বাঁধা।

বাজারের অন্যান্য সব পণ্যসামগ্রীর ন্যায় শ্রমশক্তি নামক পণ্যটিরও ব্যবহারিক মূল্য ও সামগ্রিক মূল্য রয়েছে। পরিবারবর্গসহ শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম সময় দ্বারা শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হয়। আর শ্রমশক্তির ব্যবহারিক মূল্য হলো শ্রমিক মোট যে মূল্য সৃষ্টি করে। মজুরি শ্রমিক নিজের শ্রমশক্তির মূল্য হিসেবে প্রাপ্য মূল্যের উপরে বাড়তি মূল্য বা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত মূল্যের ছিটেফোঁটাও শ্রমিককে না দিয়ে এর পুরোটাই আত্মসাৎ করে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্যই হলো উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা। পুঁজিবাদীরা মনে করেন, যে শ্রম উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে পারে না, সে শ্রম উৎপাদনশীল নয়। অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রম যদি উৎপাদনের উপায়ের মালিককে উদ্বৃত্ত মূল্য প্রদান করে এবং তাকে পুঁজিপতিতে পরিণত করে তাহলে সেই পুঁজিপতির দৃষ্টিতে তা হলো উৎপাদনশীল শ্রম।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পরপরই সমাজের উৎপাদিকা শক্তিতে উৎপাদনের বৈষয়িক বুনিয়াদের বিপ্লবাত্মক কোনো ভাঙ্গন না ধরিয়ে শ্রমের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে পুঁজিবাদ। এই পর্বের বিশেষত্ব হলো শ্রমের অনানুষ্ঠানিক পুঁজিনির্ভরতা, অর্থাৎ শ্রম তখনও পরিপূর্ণভাবে পুঁজির কুক্ষিগত হয়নি। শ্রমের অন্তর্বস্তুতে তখনও গভীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। উৎপাদনের এমন সব উপায়ের প্রয়োগের ভিত্তিতে শ্রম সম্পাদিত হতো যেগুলো শ্রমের প্রযুক্তি পরিবর্তন করত না। উৎপাদনের বৈষয়িক ভিত্তি আগের মতোই থেকে যায়, সেই কায়িক শ্রম।[১৭] কালের অগ্রগতির সাথে তাল রেখে উৎপাদনের পদ্ধতিতে যেমন পরিবর্তন আসে, শ্রমের প্রকৃতিতেও তেমনি গুণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক প্রভূত্ব ও দাসত্বের জায়গায় চলে আসে ব্যক্তিগত মালিকানা ও মজুরি শ্রম। আস্তে আস্তে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জন করা। প্রভূত পরিমাণে উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিরা যখন শ্রমিকদের ওপর শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে শুরু করে এবং কর্মকাল বৃদ্ধি করতে থাকে তখনই শ্রমের আনুষ্ঠানিক পুঁজিনির্ভরতার পর্বের শুরু হয়।

[১৭] পল সাভচেনকো, 'পুঁজিতন্ত্রে শ্রমের প্রক্রিয়া' *পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র*, (সম্পা.) রতনতনু ঘোষ, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১১, পৃ. ৭০-৭১।

শ্রমের আনুষ্ঠানিক পুঁজিনির্ভরতার মধ্য দিয়ে শ্রমের চরিত্র ও শ্রমের অন্তর্বস্তুর বিরোধ দেখা দেয়। শ্রমের পুঁজিনির্ভর প্রযুক্তিগত ভিত্তি কায়িক শ্রমের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হওয়ার কারণে শ্রমিকদের প্রতি নানাবিধ আইনের বেড়াজাল আরোপ, তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ, বাধ্যতামূলকভাবে পুঁজিপতিদের উদ্যোগগুলোতে কাজ করতে নিয়ে আসা, নিয়োগকর্তাদের ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে না পারার আইন, একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত উৎপাদনকর্মে নিযুক্ত থাকা ইত্যাদি নানা ধরনের শ্রমিক শোষণমূলক পদক্ষেপের সূচনা ঘটে। এ সময়ে পুঁজিপতির স্বার্থের বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য শাস্তির বিধানসহ কর্মকাল বাড়াতে বাড়াতে একেবারে শ্রমিকের শারীরিক সীমারেখা পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়। শারীরিক সীমারেখা ছাড়াও যে শ্রমিকের সামাজিক সীমারেখা যা তার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চাহিদা পরিতৃপ্তির সাথে জড়িত, সে ব্যাপারে ন্যুনতম দৃষ্টিপাত না করে কেবল শোষণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির পায়তারা চালানো হয়।

শ্রমের সামাজিক বিভাজনে এবং আলাদা আলাদা পুঁজিবাদী উদ্যোগে শ্রম বিভাজনের গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে জীবন্ত শ্রমের ওপর আগের বাস্তবায়িত শ্রমের প্রভূত্ব বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে শিল্পবিপ্লব শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে জীবনধারণের উপকরণসমূহের মূল্যও হ্রাস পায়। জীবনধারণের উপকরণের মূল্য হ্রাস পাওয়ার পরিণামস্বরূপ শ্রমশক্তির মূল্যও হ্রাস পায়। এভাবে আবশ্যিক শ্রম সময়ের হ্রাস এবং তার দরুন উদ্বৃত্ত শ্রম সময়ের বৃদ্ধি ঘটে।[১৮] উদ্বৃত্ত শ্রম থেকে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ করতে থাকায় তাদের পুঁজি দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সর্বশেষ স্তরে বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় শর্ত গড়ে উঠেছিল বলে যন্ত্রব্যবস্থা প্রয়োগের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল শিল্প-প্রতিষ্ঠান। শ্রম যন্ত্রপাতির সহযোগিতাকারী রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে, শ্রমিকের শ্রমকে পুঁজির দাসত্ববন্ধনে বাঁধার এক নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়, শ্রমিক যন্ত্রের লেজুড়ে পরিণত হয়। পুঁজিতান্ত্রিক উপায়ে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে, শ্রম সজহসাধ্য হওয়ার ফলে বিপুল পরিমাণে শ্রমিক বেকার হয়ে যেতে থাকে। এভাবে শ্রমের পুঁজিনির্ভরতা একদিকে যেমন শ্রমের প্রকৃতি ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়, তেমনি শ্রম-প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটায়।

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২।

৬. পুঁজিবাদী উৎপাদন ও পুঁজির সঞ্চয়

পুঁজিবাদী উৎপাদন একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া। পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল প্রেরণা হলো মুনাফা। প্রতিটি উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষে পুঁজিপতি মুনাফা অর্জন করে।[১৯] আর মুনাফার উৎস হলো উদ্বৃত্ত মূল্য। পুঁজিপতি শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে মুনাফার প্রতি তাদের লোভের শেষ নেই। তারা চায় ক্রমাগত মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে। সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মূলত বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদন ঘটে। কারণ, সরল পুনরুৎপাদনের প্রতি স্তরেই উৎপাদনের পরিমাণ এক থাকে, ফলে উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের পরিমাণও একই থেকে যায়, যদি না উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের হারের কোনো পরিবর্তন হয়। এ অবস্থায় কেবলমাত্র এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উৎপাদন বাড়িয়ে, অর্থাৎ বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদন করে উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়, অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণ বাড়ানো যায়। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে হলে উৎপাদনে নিযুক্ত পুঁজির পরিমাণ অবশ্যই বাড়াতে হয়। পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে হলে আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত মূল্যের সবটুকু বা তার একটি অংশ নতুন পুঁজি হিসেবে উৎপাদনে নিযুক্ত করতে হবে, অর্থাৎ পুঁজিপতিকে তার আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত মূল্যের কিছু অংশ সঞ্চয় করে পুঁজির সঞ্চয় বাড়াতে হবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের পুনরাবৃত্তি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনালগ্নে আমরা দেখেছি যে, এক সময়ে কিছু লোক উৎপাদনের উপাদানগুলোর মালিক হয়ে বসে, আর সেই সাথে কিছু লোক উৎপাদনের সব ধরনের উপাদান থেকে বঞ্চিত হয়ে মজুরি শ্রমিকে পরিণত হয়। যে নিষ্ঠুর, নৃশংস বঞ্চনা ও আত্মসাতের মধ্য দিয়ে পুঁজির আদি সঞ্চয় ঘটে তার ইতিহাসও আমাদের জানা। আমরা দেখেছি যে, সেই আদি সঞ্চয় ঘটে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে। আর এখন আমরা দেখছি পুঁজিবাদী উৎপাদনের মধ্য দিয়ে কীভাবে নতুন ধারায় বঞ্চনা ও আত্মসাতের কাজটি চলছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত সমস্ত পণ্যের মালিক হলো পুঁজিপতি শ্রেণি। এমনকি, শ্রমিক ও তার পরিবার যে সমস্ত জিনিসপত্র ব্যবহার করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে, তাও তাকে পুঁজিপতিদের নিকট থেকেই কিনতে হয়। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে এসব দ্রব্যসামগ্রী কিন্তু শ্রমিক শ্রেণিই নিজের শ্রমে উৎপন্ন করে পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। পুঁজিপতি

[১৯] দেখুন, হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ৪০।

শ্রেণি শ্রমিককে মজুরি দেয় টাকায়। সেই টাকা নিয়ে ঘুরে সে আবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে যায় পুঁজিপতি শ্রেণির কাছেই। এভাবে নিজের হাতে তৈরি জীবনধারণের উপায় শ্রমিকশ্রেণিকে মজুরি হিসেবে হাত পেতে গ্রহণ করতে হয় পুঁজিপতি শ্রেণির নিকট থেকে। পুঁজিবাদী উৎপাদনে শ্রমিকশ্রেণি বারবার পণ্যে যে নতুন মূল্য সৃষ্টি করে, তাতে থাকে মজুরি মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য। অথচ পুঁজিপতি শ্রেণি সমস্ত পণ্যই নিজের দখলে নিয়ে নেয়। পরে তারা সেই পণ্যভাণ্ডার ও সঞ্চয় থেকে মজুরি দিয়ে শ্রমিকশ্রেণিকে বাঁচিয়ে রেখেছে বলে প্রচার করে, বাহাদুরি করে। আবার বর্ধিত হারে উৎপাদনের সময় দেখা যায়, শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের মোট পুঁজিও বাড়িয়ে নিতে পারে।

পুঁজিপতিরা মনে করে, তারা শ্রমিককে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে তো রাখেই, ওপরন্তু শ্রমিকের পরিবারও বাঁচে তাদের দয়াতেই। কিন্তু মার্কস মনে করেন, পুঁজিপতি পুনরুৎপাদনের স্বার্থে অর্থাৎ নিজের স্বার্থেই শ্রমিক ও তার পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখে, দয়া-দাক্ষিণ্যের তাগিদে নয়। তিনি বলেন, বস্তুত পুঁজিপতি "...এক ঢিলে দুই পাখি মারে। শ্রমিকের কাছ থেকে সে যা পায় শুধু তা থেকেই নয়, সে শ্রমিককে যা দেয়, তা থেকেও মুনাফা কামায়।"[২০] শ্রমিকের কাছ থেকে সে আদায় করে উদ্বৃত্ত মূল্য, আর শ্রমিককে সে যে মজুরি দেয়, তা থেকে পায় নিত্যনতুন শ্রমশক্তির জোগান। শ্রমিক মজুরির পয়সায় ভোগের মাধ্যমে শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন করে, তার পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখে পুঁজিপতির জন্য নতুন শ্রমিকের জোগান নিশ্চিত করে। শ্রমিকের নিজের দিক থেকে বিচার করলে তার ব্যক্তিগত ভোগ তার কাছে অনুৎপাদক, কারণ তা একটি অভাবগ্রস্থ জীব ছাড়া অন্য কিছু পুনরুৎপাদন করে না। পুঁজিপতি ও রাষ্ট্রের কাছেই মাত্র তা উৎপাদক ভোগ, তা তাদের জন্য সম্পদ সৃষ্টিকারী শক্তি উৎপাদন করে।[২১] সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকের অস্তিত্ব তার নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধি করে না। সেখানে তার কোনো স্বতন্ত্র সামাজিক অস্তিত্ব নেই। শ্রমিক যখন সাক্ষাৎভাবে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত থাকে তখন সে একটি সাধারণ শ্রমযন্ত্রের মতোই পুঁজির লেজুড় মাত্র।[২২] নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে অনবরত তাকে শ্রম বাজারে হাজির হতে হয়, খুঁজতে হয় এমন পুঁজি যা তাকে নিযুক্ত করবে। তবে সে তার নিজের ও পরিবারবর্গের অস্তিত্ব বজায় রাখার মতো প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে, সাথে সাথে তৈরি করে দিতে পারে তার মালিকের বিলাস-ব্যসনের উপায় তথা পুঁজির সঞ্চয়।

---

[২০] কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৫৭২।
[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৩।
[২২] *প্রাগুক্ত*।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনার মূল শর্তের অন্যতম হলো, একদিকে থাকবে পুঁজি বা মূল্যের মালিক, অন্যদিকে থাকবে মূল্য সৃষ্টিকারী শক্তি, অর্থাৎ শ্রমশক্তির মালিক। একদিকে থাকবে উৎপাদনের উপাদান ও জীবন ধারণের উপায়ের মালিক, অন্যদিকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত সর্বহারা শ্রমিক অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রমশক্তির মালিক। আর শ্রম বাজারে তারা পরস্পরের মুখোমুখি হবে ক্রেতা ও বিক্রেতা হিসেবে। পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে এই শর্ত ক্রমেই বিস্তৃততর হয়ে গোটা সমাজকে ঘিরে ফেলে। মার্কস বলেন, "একদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়া অনবরত বস্তুগত সম্পদকে পুঁজিতে, অর্থাৎ আরও অধিক সম্পদ সৃষ্টির উপায়ে এবং পুঁজিপতিদের ভোগ-বিলাসের উপায়ে পরিণত করে, অন্যদিকে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ঢোকার মুখে শ্রমিক যে অবস্থায় ছিল, ছাড়ার সময়ও তাই থাকে, অর্থাৎ সম্পদের উৎস হিসেবেই থাকে অথচ সেই সম্পদ নিজের করে নেওয়ার সমস্ত উপায় থেকে সে বঞ্চিত।"[২৩] সুতরাং পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন কেবলমাত্র অনবরত পণ্য ও উদ্বৃত্ত মূল্যই সৃষ্টি করে না, তা ক্রমবর্ধমান হারে মজুরি শ্রমিকও পুনরুৎপাদন করে। এই ব্যবস্থা ক্রমাগতই সাক্ষাৎ উৎপাদকের সংখ্যাগুরু অংশকে মজুরি শ্রমিকে পরিণত করে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন যেখানে একবার শেকড় গেঁড়ে বসে সেখানে অন্য সমস্ত প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থাকে– যেমন, নিজস্ব উদ্যোগে নিযুক্ত উৎপাদনকারী বা কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য পণ্য হিসেবে বিক্রয়কারীদেরকে ধ্বংস করে। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথমে পণ্য উৎপাদনকে সাধারণ নিয়মে পরিণত করে এবং পরে ধাপে ধাপে সমস্ত পণ্য উৎপাদনকে পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদনে পরিণত করে।[২৪] এমনি করে পুঁজিবাদী উৎপাদন একবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, আরও বিকাশের মুখে এই বিচ্ছেদকে শুধু পুনরুৎপাদনই করে না, বরং এর পরিধি দূর থেকে আরও দূরে বিস্তৃত করে, যতদিন পর্যন্ত না এ ব্যবস্থাই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়।[২৫]

পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতি পণ্য হিসেবে শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে মজুরি দিয়ে ক্রয় করে। সেই পণ্য পুঁজিপতি ভোগ করে শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করে। পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমশক্তিরূপে পণ্য ভোগ করার প্রক্রিয়া ও পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া এক ও অভিন্ন। আবার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শুধু অনবরত পণ্যই উৎপাদন করে না, পুঁজিরও পুনরুৎপাদন করে। আর

---

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭০।
[২৪] কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-১, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৩৬।
[২৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।

এই পুঁজি হলো সেই শক্তি, যা শুধু তার উৎপাদনকারীকেই শোষণ করে না, উৎপাদনের উপাদান ও উৎপাদনকারী উভয়কেই শাসন করে। পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক অনবরত বস্তু ও বাস্তব সম্পদ উৎপন্ন করে, কিন্তু তা করে পুঁজিরূপে, অর্থাৎ তারই একটি শত্রু-শক্তিরূপে, যা তাকে শাসন ও শোষণ করে।[২৬]

মুনাফার প্রতি পুঁজিপতি শ্রেণির লোভের শেষ নেই। পুঁজিপতি সবসময়ই চায় মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে। আর মুনাফা যত বাড়তে থাকে পুঁজিপতির লোভও তত বাড়তে থাকে। মুনাফা বাড়াতে হলে চাই উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বাড়ানো। আবার উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের হার অপরিবর্তিত থাকলে উৎপাদন পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়েই উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। তাই পুঁজিপতি সবসময়ই চেষ্টা করে কী করে মুনাফার পরিমাণ তথা পুঁজির পরিমাণ বাড়ানো যায়। কিন্তু একমাত্র মুনাফার লোভই যে পুঁজিপতিকে তার উৎপাদন পুঁজি বাড়াতে উৎসাহিত করে, তা নয়। উৎপাদন পুঁজি বাড়ানোর প্রশ্নটি পুঁজিপতি হিসেবে তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নের সাথেও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাজারে প্রতিটি উৎপাদনকারী চায় অন্য উৎপাদনকারীকে হটিয়ে দিয়ে নিজেই বেশিরভাগ বাজার দখল করতে। সে যদি অন্য উৎপাদনকারী থেকে কম দামে পণ্য দিতে পারে, তবেই তা সম্ভব হয়। তাই সে উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে বা উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তার উৎপাদন ব্যয় কমাতে চেষ্টা করে। আর এ জন্য প্রয়োজন হয় আরও অধিক পরিমাণ পুঁজি। এ অবস্থায় কোনো পুঁজিপতি যদি প্রতিযোগিতার মুখে নির্মূল হয়ে যেতে না চায়, তবে তাকে অবশ্যই উৎপাদনের পদ্ধতির উন্নতি করতে হবে, নতুন নতুন উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে, অর্থাৎ তার পুঁজির সঞ্চয় বাড়াতে হবে।

পুঁজিপতি কীভাবে তার পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে পারে সে প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজির আদি সঞ্চয়নের যুগে পুঁজিপতিরা পুঁজির জন্য লুঠতরাজ, জোর-জুলুম, হত্যা ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের বদৌলতে সে একটি সহজ উপায়ের সন্ধান পেয়েছে। এখন সে সর্বহারা মজুরি শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন মূল্যের একটি অংশ উদ্বৃত্ত মূল্য হিসেবে আত্মসাৎ করছে। সেই উদ্বৃত্ত মূল্যকে সে যদি নতুন উৎপাদন পুঁজি হিসেবে লগ্নী করতে পারে, তবেই তার পুঁজি ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। ক্রমাগত এভাবে পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়ে, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে যাওয়াই বর্ধিত হারে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনকে সম্ভব করে। আর এভাবেই পুঁজিপতি তার পুঁজির সঞ্চয় বাড়িয়ে যেতে পারে।

---

[২৬] কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৫৭১।

৭. পুঁজিবাদী উৎপাদন ও সঞ্চয়ের বর্ণনামূলক-ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক যেভাবে শোষিত হয় বা যেভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয়, মার্কস তার একটা বর্ণনামূলক-ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি মনে করেন, পূর্বেকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা আবির্ভুত হয়েছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে তিনি বলেন, এ "...নিজেই হচ্ছে পূর্ববর্তী প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক ফল ও ফসল...সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সহগামী সম্পর্কযুক্ত–সামাজিক জীবনের প্রতিক্রিয়ায় যে সম্পর্কসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে –সেগুলি ধারণ করে একটি সুনির্দিষ্ট, ঐতিহাসিক ও অচিরস্থায়ী চরিত্র..."[২৭] মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পর্ককে ইতিহাস বিকাশের একটি পরিণতি হিসেবেও বিবেচনা করেন। পুঁজিবাদী উৎপাদন ও সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে কী করে আবির্ভুত হয় এবং ক্রিয়া করে তিনি তার একটা নৈর্ব্যক্তিক বিষয়গত বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্ককে অর্থনীতির এক দীর্ঘ বিকাশ প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট ব্যবস্থা হিসেবে দেখেন। এদিক থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভুত একটি সম্পর্ক।[২৮] এ কারণে পুঁজিবাদী উৎপাদন ও সম্পর্ক সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত রূপ।[২৯]

মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদনের এই ঐতিহাসিক বিবেচনা থেকে উৎপাদন সম্পর্কের ঐতিহাসিক রূপ–যেখানে শ্রমিক ঐতিহাসিকভাবেই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির প্রত্যক্ষ উপায় হিসেবে আবির্ভুত হয় তাকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি এই ইতিহাসগত বিবেচনায় কীভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতির কাছে যায় তা তুলে ধরেন, উদ্বৃত্ত মূল্যের ওপর পুঁজিপতির অধিকারের ঐতিহাসিক ধরনকে ব্যাখ্যা করেন। উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতির দখলে যাওয়ার বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা হলো বিষয়গত-ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা। মার্কস একটা ঐতিহাসিক কালপর্বের উৎপাদনের নিয়মানুযায়ী কীভাবে অধিকার কায়েম হয় তাকে ব্যাখ্যা করেন। মার্কস বলেন, "...উদ্বৃত্ত শ্রমের কালপর্বে, শ্রমশক্তির ফলভোগাধিকার পুঁজিপতির জন্য একটা মূল্য সৃষ্টি করে, তার জন্য তাকে কোনো তুল্য মূল্য ব্যয় করতে হয় না।"[৩০] এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন পর্বে উদ্বৃত্ত মূল্যের ওপর পুঁজিপতির অধিকার কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পুঁজিপতি মূল্য আত্মসাৎ করার সুযোগ লাভ

[২৭] কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, ষষ্ঠ খন্ড, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৪১০।
[২৮] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ১৬।
[২৯] মার্কস, *পুঁজি*, ষষ্ঠ খন্ড, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৩৫৩।
[৩০] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৪২।

করে সেটা বলেন। এটা তারই একটা বিষয়গত-ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষ্য। উদ্বৃত্ত মূল্যটা কী করে ঐতিহাসিকভাবে পুঁজিপতির দখলে যায়, সেটা একটা বর্ণনামূলক প্রশ্ন।

মার্কস মনে করেন, একটি প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ী সেই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মানদণ্ড দিয়েই শাসক শ্রেণি উৎপাদন সম্পর্কের যৌক্তিকতা বিবেচনা করেন। মার্কস বলেন, "...উৎপাদনের এজেন্টদের মধ্যে লেনদেনের ন্যায়নীতি দাঁড়িয়ে আছে এই ঘটনার ওপর যে, এগুলোর উদ্ভব ঘটে উৎপাদন সম্পর্কসমূহ থেকে স্বাভাবিক ফল হিসেবে। যে আইনগত রূপগুলির মধ্যে এই অর্থনৈতিক লেনদেনগুলি দেখা দেয়...যখনি তা হয় উৎপাদন পদ্ধতির অনুরূপ এবং তার সঙ্গে সুসঙ্গত...।"[৩১] এটা মার্কসের একটা বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা।

মার্কস পুঁজির সভ্যতা বিস্তারী দিকের ওপরও আলোকপাত করেন। তিনি একদেশদর্শীভাবে পুঁজির শোষণকেই শুধু দেখেন নি, তিনি পুঁজির সভ্যতা বিস্তারকারী গুণের প্রসঙ্গটিকে গুরুত্ব দেন। পুঁজিবাদে শোষণ থাকা সত্ত্বেও তা যে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ সাধন করে, এ দিকটিকে সদর্থকভাবে ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিক বিবেচনায়ও মার্কস নতুন ও উন্নততর সমাজের আবির্ভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদের অভ্যুদয়কে দেখেন। মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদ তার পূর্ববর্তী ক্রীতদাসত্ব ও ভূমিদাসত্বমূলক ব্যবস্থা থেকে উন্নততর এক সমাজ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদের আবির্ভাব তার পরবর্তী সমাজ আগমনের বস্তুগত শর্ত তৈরি করে।[৩২] ফলে ইতিহাসে বুর্জোয়া যুগটা নতুন জগতের আবির্ভাবের বৈষয়িক ভিত্তি তৈরি করে। এ থেকে বলা যায়, মার্কস স্পষ্টভাবেই পুঁজির সভ্যতা বিস্তারী ঐতিহাসিক দিককে বিবেচনা করেন।

এঙ্গেলস বলেন, পুঁজিবাদে ব্যাপক শোষণের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মার্কস পুঁজির শোষণমূলক অবস্থানের জন্য সামন্তবাদ অভিমূখীনতার বিরোধিতা করেন।[৩৩] এঙ্গেলস মনে করেন, সামন্তবাদ শ্রমিককে জমির সাথে বেঁধে রাখে। পুঁজিবাদ তাকে সামন্তবাদী দাসত্বের বদলে স্বাধীন শ্রমিকে পরিণত করে এবং শোষণ করে, যা একই সাথে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের শর্ত তৈরি করে। তাই শোষণ সত্ত্বেও পুঁজিবাদ সামন্তবাদের চাইতে অগসর সমাজ। মার্কস শোষণ অবসানের জন্য পেছনের সমাজে

---

[৩১] মার্কস, *পুঁজি*, পঞ্চম খন্ড, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪২।
[৩২] মার্কস, *পুঁজি*, ষষ্ঠ খন্ড, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৩৫৪।
[৩৩] আখতার সোবহান খান, *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ১২৭।

ফিরে যাবার বিরোধী ছিলেন। এঙ্গেলস বলেন, দাস প্রবণ আত্মার সৃষ্টিকারী গ্রামীণ ছোট শিল্প থেকে বরং মার্কস আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প, যেখানে জমির বন্ধন ও উত্তরাধিকার মুক্ত যুথবদ্ধ প্রলেতারিয়েত থাকবে তাকেই পছন্দ করেন।[৩৪] পুঁজিবাদে কৃতকৌশল, প্রযুক্তি ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটার ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। মার্কস একে ইতিবাচকভাবে দেখেন। কেননা, এর পরিণতিতে ঘটে সামাজিক রূপান্তর, যা ঐতিহাসিকভাবে পুঁজিবাদের অস্তিত্বের শর্তকে লোপ করে।[৩৫] এটা স্পষ্ট যে, মার্কস বাস্তব ইতিহাসের বিষয়গত বিকাশকে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করেন। পুঁজিবাদে শোষণের উপস্থিতি সত্ত্বেও তা সামন্তবাদের তুলনায় অগ্রসর সমাজ বলে এই দুইয়ের মধ্যে তুলনায় তিনি পুঁজিবাদকে অগ্রসর সমাজ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। একই সাথে পুঁজিবাদী শোষণকে সমর্থন আবার তার উচ্ছেদ–এমন স্ববিরোধী অবস্থান মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে ছিল না। তাঁরা পুঁজিবাদ আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে যেমনিভাবে বিবেচনা করেন, তেমনিভাবে আবার পুঁজিবাদী শোষণের বাস্তবতা প্রত্যাখ্যান করেন। অর্থাৎ তাঁরা যুগপৎ বাস্তব উৎপাদন ও তার গতির বাস্তব ব্যাখ্যার সাথে সাথে বিষয়গত, ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ব্যাখ্যাও প্রদান করেন।

৮. উৎপাদন সম্পর্কের সামাজিক স্তর

পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ এমন যে তা উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজিপতি কর্তৃক ভাড়াটে শ্রমিকের শ্রম শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের এই সামাজিক স্তরে উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য হলো বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা করা। সামাজিক কল্যাণ বা পণ্যের যথেচ্ছা ব্যবহার পুঁজিবাদের আদর্শের বিরোধী। বাজার এখানে শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে কেনাবেচার ব্যবস্থা করে দেয়, যার ফলে শ্রমিক মজুরি বা বেতন পায়। সামাজিক প্রয়োজন বা সম্পত্তি নিরপেক্ষ উৎপাদনকারীদের দ্বারাই পুঁজিবাদে উৎপাদন সাধিত হয়। এই উৎপাদন পদ্ধতির মালিকানা মূলত ব্যক্তিগত, অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রও এই উৎপাদন পদ্ধতির মালিক হয়ে থাকে। পুঁজিবাদের উদ্ভবের ইতিহাস পুঁজির আদি সঞ্চয়নের সাথে জড়িত। সরল পণ্য উৎপাদনের ভিত্তিতে পুঁজিবাদের বিকাশ সাধিত হয়। শ্রমশক্তি পণ্যে পরিণত হয় পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এসে। পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপকরণ বা উপায়সমূহের কেনাবেচা হয় বলে তারা পণ্য। এই সমাজে পণ্যের মূল্য আছে এবং তা মুদ্রায় পরিবর্তিত হতে পারে। অন্যদিকে মুদ্রার বিনিময়ে লোকে সর্বদাই উৎপাদনের উপায় পেতে বা ক্রয় করতে পারে।

---

[৩৪] এঙ্গেলস, 'বাস-সংস্থান সমস্যা', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ২৩৪-২৩৫।
[৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬।

পুঁজিবাদের প্রধান অর্থনৈতিক নিয়ম হলো উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন এবং পুঁজিপতি কর্তৃক তা আত্মসাৎ। অবিরাম প্রতিযোগিতা অনবরত পুঁজিপতিদের পুঁজি বাড়াতে এবং উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধনে বাধ্য করে। এর ফলে উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটে এবং পুঁজিবাদের প্রধান বিরোধ তথা উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও তার ফলভোগের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী রূপের বিরোধটি তীব্রতর হয়। কালে কালে আবির্ভুত অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের বিরোধ প্রকাশ পায়।[৩৬] পুঁজিবাদে যে প্রতিযোগিতা থাকে তাই এক পুঁজিপতি থেকে অন্য পুঁজিপতিকে উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে প্রণোদিত করে। এই অর্থে পুঁজিবাদে উৎপাদন শক্তি বাড়তে থাকে। বাড়তি উৎপাদন প্রতিযোগিতার মনোভাবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন আপন সংকটে তথা অস্তিত্বের সংকটে জড়িয়ে পড়ে। তখন প্রয়োজন হয় নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার।

পুঁজিবাদী সমাজে শাসক শ্রেণি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক। অথচ এখানে উৎপাদন শক্তিগুলো পুরোপুরি সমাজিকৃত, তার কাজ-কারবার চলে বিশ্ববাজারে। পুঁজিবাদের উদ্ভবের ফলে সমাজে দুটো প্রধান ঘটনা ঘটে, প্রথমটি হলো অল্প কিছু সংখ্যক লোকের হাতে সম্পদের সঞ্চয়ন এবং পরেরটি হচ্ছে বিপুল সংখ্যক মানুষের নিঃস্ব হয়ে যাওয়া। নিঃস্ব এসব মানুষ ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন হলেও এদের না থাকে উৎপাদনের উপকরণ, না থাকে জীবনধারণের উপায়। ফলে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ পুঁজিবাদী সমাজে মজুরি দাস হয়ে যায়। এদেরকে মার্কস ও এঙ্গেলস শিল্পসংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত বাহিনী বা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা[৩৭] বলেছেন। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রের মধ্যই রয়েছে পুঁজির ক্রমাগত বৃদ্ধির অনিবার্যতা। কার্ল মার্কস বলেন,

> একমাত্র মূর্তিমান পুঁজি হিসেবেই পুঁজিপতি সম্মানীয়, এভাবে সে ধন হিসেবে ধনের প্রতি কৃপণের প্রবল আসক্তির শরিক। কিন্তু কৃপণের পক্ষে যা খেয়ালমাত্র, পুঁজিপতির পক্ষে তা হলো সমাজ-যন্ত্রের ক্রিয়া, যে সমাজ-যন্ত্রের সে একটি চাকামাত্র। উপরন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশ একটি নির্দিষ্ট শিল্পে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ অবিরত বৃদ্ধি করে যাওয়াকে প্রয়োজনীয় করে তোলে, আর প্রতিযোগিতা প্রতিটি বিশেষ পুঁজিপতিকে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সহজাত

[৩৬] সোফিয়া খোলদ, *সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ*, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৮৩-৮৪।
[৩৭] দেখুন, কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ১৫৭-১৭১।

> নিয়মগুলোকে এমনভাবে অনুভব করায় যেন তারা কতগুলি বহিরাগত উৎপীড়নকারী নিয়ম। প্রতিযোগিতা তাকে বাধ্য করে তার পুঁজিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাকে অবিরত প্রসারিত করে চলতে, কিন্তু একমাত্র ক্রমবর্ধমান হারে সঞ্চয়নের সাহায্য ছাড়া সে তা প্রসারিত করতে পারে না।[৩৮]

পুঁজিবাদী উৎপাদন স্বতঃস্ফূর্ত ও এলোমেলোভাবে বিকশিত হতে চায় এবং তাতে অর্থনীতির একক ক্ষেত্র ও শাখাগুলোর বিকাশে অসামঞ্জস্য দেখা দেয় এবং এর ফলে বিপুল লোকসান, উৎপাদনের ধারায় মারাত্মক বিঘ্ন ও অর্থনৈতিক সংকট ঘটে। এগুলো হচ্ছে উৎপাদন ও পরিভোগের বিপর্যয় ঘটার কুফল।[৩৯] পুঁজিবাদে শিল্পের পরিকল্পনাহীন ও বিশৃঙ্খলভাবে মুনাফার জন্য ঘোড়দৌড়ের দরুন উৎপাদনের সীমাহীন সম্প্রসারণের ঝোঁক দেখা দেয়। কিন্তু পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলো ঝোঁকের সামনে অলঙ্ঘনীয় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজির শোষণের ফলে বিশাল প্রলেতারিয়েত জনগণের ভোগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদের আওতায় বিক্রয়ের পরিস্থিতির সাথে উৎপাদনের পরিস্থিতির সমন্বয় ঘটে না। মুনাফার বন্য তাড়নার ফল হিসেবে পুঁজি সঞ্চয়ন পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এতটা বাড়িয়ে দেয় যে, বাজার তা গ্রহণে বা আত্মীকরণে ব্যর্থ হয়, প্রকৃত মজুরির পরিসর মেহনতিদের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা সীমিত করে রাখে। সত্যিকারের সব সংকটের চূড়ান্ত কারণ সর্বদাই নিহিত থাকে দারিদ্র্য ও জনগণের সীমিত পরিভোগে। সংকট দেখা দেয় উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না হওয়ার দরুন। এজন্য নয় যে জনগণের তা প্রয়োজন নেই, আসলে মেহনতিদের এগুলো ক্রয়ের ক্ষমতা থাকে না। পুঁজিবাদের এই অর্থনৈতিক সংকট অনিবার্য ও অপরিহার্য। এই সংকট জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পুঁজিবাদের নিত্যসঙ্গী।[৪০] পুঁজিবাদের আকারগত চরিত্র দেখে এর বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। দাস যুগে ক্রীতদাসদের সমস্ত শ্রমই প্রতিভাত হয় দাম-না-দেওয়া শ্রম হিসেবে। বিপরীত দিকে, মজুরি শ্রম প্রথায়, উদ্বৃত্ত শ্রম বা দাম-না-দেওয়া শ্রমকেও দাম-দেওয়া শ্রম বলে মনে করা হয়। আর এ থেকেই সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তির। কার্ল মার্কস লিখেছেন,

> এই যে বস্তুগত রূপ প্রকৃত সম্পর্ককে অদৃশ্য করে রাখে, এবং বস্তুত, সেই সম্পর্কের ঠিক বিপরীতটাই দেখায়, সেই রূপটিই শ্রমিক ও পুঁজিপতি সম্পর্কে সমস্ত আইনগত ধারণার, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী সম্পর্কে সমস্ত হেঁয়ালি সৃষ্টির, স্বাধীনতা সম্পর্কে সমস্ত মোহের, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য স্থূল অর্থনীতিবিদদের সমস্ত ছলের ভিত্তি।[৪১]

---

[৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২।

[৩৯] আ. বুজুয়েভ, *পুঁজিতন্ত্র কী*, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৮৮-৮৯।

[৪০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।

[৪১] কার্ল মার্কস *পুঁজি*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৪৯।

পুঁজিবাদ হলো সেই সমাজ সংগঠন যাতে উৎপাদন সম্পর্ক, অর্থাৎ কেনাবেচার সম্পর্ক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে পরিবার ও রাষ্ট্র থাকে কিন্তু পরিবার ক্রমাগত ক্ষুদ্র নিঃসঙ্গ পর্যায়ে নিছক বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার জায়গায় গিয়ে ঠেকে। রাষ্ট্র এখানে জবরদস্তির হাতিয়ারগুলো ধরে রাখে। তবে ক্রমেই সে বাণিজ্যিক স্বার্থের খপ্পরে পড়ে, তার কার্যক্রম সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে সেবা কেনাবেচার দালালিতে গিয়ে ঠেকে।[৪২] রাষ্ট্র হলো শোষক শ্রেণির নিজস্ব ব্যবস্থাপনা। এই অর্থে রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার রক্ষাকর্তা। রাষ্ট্র হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা শোষক শ্রেণির নিয়ন্ত্রিত নিজস্ব শক্তিকেন্দ্র। যেহেতু শোষক শ্রেণির ভেতর অভ্যন্তরীণ বিরোধ বর্তমান থাকে, তাই তাদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব-বিরোধ সমাধানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকে। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাই রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্র তাই শোষক শ্রেণির শক্তি কেন্দ্র। শক্তি আর মতাদর্শ দিয়েই রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব রক্ষা করে।[৪৩]

সমাজ বিকাশের একটি স্তরে যখন একদল উৎপাদনের উপকরণের ও উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক এবং অন্যদল উৎপাদনকারীতে বিভক্ত হয়ে পড়লো তখনই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কারণ যারা উৎপাদনের উপকরণের মালিক তারা সংখ্যালঘু ছিল, তাদের পক্ষে সমাজের ওপর আধিপত্য কায়েম করতে হলে একটি ক্ষমতাশালী সংগঠন আবশ্যক ছিল। এই ক্ষমতাশালী সংগঠনই রাষ্ট্র। দাস সমাজেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রব্যবস্থা দেখা দেয়। এঙ্গেলস বলেন,

> প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি ক্রীতদাসদের দমনের জন্য দাসমালিকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্তবাদী রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার জন্য অভিজাততন্ত্রের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজি কর্তৃক মজুরি শ্রম শোষণের হাতিয়ার। ...ইতিহাসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে, নাগরিকদের অধিকার স্থির হয় ধন-সম্পত্তির অনুপাতে এবং এইভাবে প্রত্যক্ষভাবে এই তথ্য প্রকাশ পায় যে, রাষ্ট্র হচ্ছে বিত্তহীন শ্রেণিদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিত্তশালী শ্রেণির একটি সংগঠন। ...এবং সর্বশেষে বিত্তশালী শ্রেণি শাসন করে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে। যতদিন পর্যন্ত শোষিত শ্রেণি অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত নিজের মুক্তির জন্য পরিণত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এ শ্রেণির বৃহৎ সংখ্যাধিকেরা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকেই একমাত্র সম্ভবপর ব্যবস্থা বলে মেনে নেবে।[৪৪]

---

[৪২] কার্ল মার্কস, *ইহুদি প্রশ্নে*, (অনু.) জাভেদ হুসেন, ঢাকা: সংহতি, ২০০৯, পৃ. ৭৫-৭৬।

[৪৩] সমীরণ মজুমদার, *মার্ক্সবাদ বাস্তবে ও মননে*, কলকাতা: স্বপ্রকাশ, ১ বৈশাখ, ১৪০২, পৃ. ৫৫।

[৪৪] ফ্রিডরিক এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকান ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', *মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন*, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ৩১৯-৩২০।

মার্কস বলেন, শ্রমিক শ্রেণির ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যই হচ্ছে শ্রেণিভেদের অবসান করা অর্থাৎ এমন একটি নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে কোনো পরশ্রমভোগী শ্রেণির অস্তিত্ব থাকবে না। এককথায় শ্রমিক শ্রেণির উদ্দেশ্য শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে প্রত্যেক মানুষ সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করবে। তখন রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থাকে একটি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনে লাগবে না। ক্রমে ক্রমে সমাজ থেকে এ ধরনের সংগঠনের বিলোপ ঘটবে। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে শ্রেণি শোষণ না থাকায় তখন রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল না। দাস সমাজে শ্রেণি শোষণের উদ্ভব এবং তখন থেকেই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। যখন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন সমাজে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণি থাকবে না, তখন শোষণের যন্ত্র এসব সামাজিক সংগঠন অপ্রয়োজনীয় হয়ে অবলুপ্ত হবে।

৯. পুঁজিবাদী পণ্য বিনিময় নিয়ম

পুঁজিবাদী বিনিময় ব্যবস্থার বিশ্লেষণ থেকে শ্রম ও পুঁজির অসম বিনিময় এবং উৎপাদনের পর্যায়ে শোষণের রূপকে বোঝা যায়। মার্কস পুঁজিবাদে শ্রমশক্তি নামক পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়কে পণ্য বিনিময়ের নিয়ম দিয়ে যে ব্যাখ্যা দেন তার মধ্যে শোষণের কোনো ধারণা নেই।[৪৫] পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দুটি পণ্যের মধ্যকার বিনিময়কে মার্কস সমানুপাতিক বলে বর্ণনা করেন। মার্কস বলেন, "...কোনো পণ্যের সঠিক বিনিময় মূল্য দ্বারা সমান সমান কোনো কিছু প্রকাশিত হয়...।"[৪৬] পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বিনিময়ের ক্ষেত্রে পণ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। পণ্য আকারে বিনিময় রূপ গ্রহণের জন্য পণ্যের গুণগত বা প্রাকৃতিক দিকটিকে বাদ দিয়ে পণ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় শ্রম সময়ের পরিমাণগত দিকটিকেই বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ বিনিময়ের ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর একটা পণ্য রূপ দরকার হয়। এই বিমূর্তকরণের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদী বিনিময় সম্ভব হয় এবং পণ্য তার বিনিময় মূল্যরূপ পায়।[৪৭] মার্কস মনে করেন, একটি পণ্য উৎপাদনে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম সময় দিয়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়।[৪৮] সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম সময় বলতে মার্কস বুঝিয়েছেন উৎপাদনের স্বাভাবিক অবস্থা এবং সেই সময়ের গড় দক্ষতা ও শ্রমের গড় তীব্রতাকে। মার্কসের মতে সমাজে শ্রম বিভাজনের কারণেই গুণগতভাবে ভিন্ন গুণাবলিসম্পন্ন শ্রম উপযোগী হয়ে ওঠে এবং

---

[৪৫] আখতার সোবহান খান, *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ১১৬।

[৪৬] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ -১, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৫৯।

[৪৭] Marx, *Grundrisse*, (Trans.) Martin Nicolaus, London: Penguin books Ltd., 1993, p. 142.

[৪৮] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-১, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৬২।

তাদের বিনিময় সম্ভব হয়।[৪৯] যে কোনো পণ্যের বিনিময়ের মতো তার ব্যবহারিক মূল্যের ক্ষেত্রে শ্রমের গুণগত দিককে বাদ দিয়ে কেবল তার পরিমাণগত দিককেই বিবেচনা করা হয়। শ্রমের গুণাবলিকে বাদ দিয়ে কেবল পরিমাণগত দিককে বিমূর্তকরণের মধ্য দিয়েই শ্রমের বিনিময়টা সম্ভব হয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার এই পণ্য বিনিময়কে মার্কস কেবল কোনো তুচ্ছ বস্তুর বিনিময় হিসেবে দেখেননি। তিনি পণ্যের আধিবিদ্যক নিগূঢ়তা বিশ্লেষণ করে পণ্য বা বস্তু সম্পর্কের আড়ালে মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে উন্মোচন করেন। মার্কস পণ্য সম্পর্কের আড়ালে শ্রমের সামাজিক রূপ এবং উৎপাদক যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে তা আবিষ্কার করেন। পণ্যকে তিনি রহস্যময় বস্তু বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, তার আড়ালে মানুষের শ্রমের সামাজিক চরিত্রটি একটি বিষয়গত বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়। এ ক্ষেত্রে শ্রমের সাথে উৎপাদকের সম্পর্কটা সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে হাজির না হয়ে বরং শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক হিসেবে হাজির হয়।[৫০] মার্কস বলেন, "ওখানে যে সম্পর্কটা স্পষ্টতই মানুষে মানুষে সুনির্দিষ্ট একটা সামাজিক সম্পর্ক, সেটা তাদের চোখে বস্তুতে বস্তুতে সম্পর্কের এক উদ্ভট রূপ পরিগ্রহ করে। আমি একেই বলি পণ্য পূজা...।"[৫১] পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পণ্যোৎপাদক শ্রমের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে সম্পর্ককে বিবেচনা না করে তাকে বস্তুতে বস্তুতে, পণ্যতে পণ্যতে সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয়। পণ্য উৎপাদনের আড়ালে থাকা মানবিক সম্পর্ক এখানে কোনো গুরুত্ব পায় না। এদিক থেকে বলা যায়, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমশক্তি নামক পণ্য বিনিময়ের আড়ালে, মজুরি শ্রমের অন্তরালে যে সামাজিক সম্পর্ক থাকে তার বিমানবিকীকরণ ঘটে। মার্কস মনে করেন পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতুল্যের মধ্যে কোনো বিনিময় ঘটলে সেখানে কোনো উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় না। কিন্তু পুঁজিবাদী পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমাজের পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি শ্রেণির মধ্যে শ্রমশক্তি নামক পণ্যের বিনিময় ঘটে।

১০. শ্রম, মূল্য ও পুঁজি

মানবসমাজের ভিত্তি হলো শ্রম প্রক্রিয়া যা দিয়ে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে মানুষ নিজ চাহিদা মেটায়। শ্রমজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার মানুষের প্রয়োজন মেটায়। অর্থাৎ শ্রমজাত দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য আছে।

[৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬।
[৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১-১০৩।
[৫১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২।

মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়াতেই এর মূল্য। শুধুমাত্র জৈবিক প্রয়োজন নয়, তা মানসিক প্রয়োজনও মেটাতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ঘৃণ্য উদ্দেশ্যও সফল করে। মানুষের কাছে কোনো দ্রব্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তার উপযোগিতার ওপর। এই উপযোগিতাই হলো কোনো একটি দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য। দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য যখন মানুষের শ্রম দিয়ে সৃষ্টি হয় তখন দ্রব্যাদি একটি বিশেষ রূপ পায়, তার মূল্য সৃষ্টি হয়। এই রূপটি হলো দ্রব্যের পণ্যরূপ। কাজেই পণ্য হলো একটি দ্রব্য যার একটি ব্যবহারিক মূল্য এবং একটি আর্থিক বা বিনিময় মূল্য থাকে।[৫২] কোনো একটি দ্রব্যের উপযোগিতা বা ব্যবহারিক মূল্য থাকলেও তার আর্থিক মূল্য নাও থাকতে পারে। যেমন সূর্যের আলো। মানুষ সূর্যের আলো থেকে সৌরশক্তি তৈরি করলেই কেবল তার মূল্য সৃষ্টি হয় এবং তা পণ্য হয়ে ওঠে। অতএব মূল্য সৃষ্টি করে মানুষের শ্রম। প্রতিটি পণ্যের উপযোগিতা বা ব্যবহারিক মূল্য পৃথক হলেও এদের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে, একটি মিলের জায়গা আছে। আর তা হলো এগুলো সবই মানুষের শ্রম দ্বারা সৃষ্ট।

অভাব মেটানোর জন্য মানুষকে পণ্য বিনিময় করতে হয়। বিনিময়ের সময় উভয়পক্ষই চায় তার নিজ পণ্যটির পরিবর্তে যেটা সে অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করছে তার থেকে সমান পরিতৃপ্তি পেতে। যখন দুটি পণ্যের মধ্যে বিনিময়ের সম্পর্ক হয় তখন তাদের বিনিময় মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন আসে। কোনো একটি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় সেই পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমসময়ের পরিমাণ দিয়ে। অতীতে একটা সময় মানুষ সরাসরি পণ্য বিনিময় করে অভাব মেটালেও উৎপাদনের একটা পর্যায়ে এসে মুদ্রার প্রচলন হয়। মুদ্রা প্রচলনের পর উৎপাদনকারী তৈরিকৃত পণ্য বিক্রি করে টাকা পেত এবং সেই টাকা দিয়ে তার নিজের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে প্রয়োজন মেটাতো। এই উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো ভোগ। এই ভোগের জন্য উৎপাদন সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে চলতে চলতে একটা পর্যায়ে এসে মুনাফার জন্য উৎপাদন শুরু হয়। উৎপাদনকারী বা পুঁজিপতি টাকা দিয়ে বাজার থেকে শ্রমশক্তি ও উৎপাদনের উপকরণ কিনে পণ্য উৎপাদন করে বাজারে নিয়ে আসে এবং বিক্রি করে আবার টাকা পায়। এইভাবে সৃষ্টি হয় পুঁজি, উদ্বৃত্ত মূল্য এবং তা থেকে মুনাফা। মুনাফার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থাটিকেই বলা হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা।

[৫২] দেখুন, আখতার সোবহান খান, *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ১১৬।

পণ্য উৎপাদন ও এর ব্যবহারিক মূল্য তৈরি হয় যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে বলে শ্রমপ্রক্রিয়া। কার্ল মার্কস শ্রমপ্রক্রিয়ার প্রাথমিক তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন।[৫৩] সেগুলো হলো: কাজ, কাজের বিষয় বা বস্তু এবং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। শ্রম প্রক্রিয়ার প্রথম উপাদান কাজ বা শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা শ্রমশক্তির ওপর নির্ভর করে। শ্রমিক হলো শ্রমশক্তির মালিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপাদান দুটির, অর্থাৎ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির মালিক হলো পুঁজিপতি। পুঁজিপতি উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য বাজার থেকে যেমন কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কেনে, তেমনি শ্রমের বাজার থেকে শ্রমিকের শ্রমশক্তিও কেনে। শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে। শ্রমিক পণ্য উৎপাদন করলেও উৎপাদিত পণ্যের মালিক হয় পুঁজিপতি, শ্রমিক নয় এবং শ্রমিককে পুঁজিপতির অধীনে কাজ করতে হয়। পুঁজিবাদে শ্রমিকের শ্রমশক্তিও একটি পণ্য। শ্রমশক্তি নামক পণ্যটির ক্ষেত্রে ব্যবহার মূল্য এবং বিনিময় মূল্য সমান থাকে না। অন্য যেকোনো পণ্যের সঙ্গে শ্রমশক্তি নামক পণ্যটির পার্থক্য এখানেই। আর এ পার্থক্যটির মধ্যেই উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্বের রহস্য নিহিত রয়েছে।

পুঁজিবাদ বিকাশের পূর্বে দাস ও সামন্ত সমাজেও দাস মালিক ও সামন্ত প্রভূরা ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের উদ্বৃত্ত শ্রম নিজেরা ভোগ করত। এই উদ্বৃত্ত শ্রম কার্যত ব্যবহৃত হতো ক্রেতার বা মালিকের ভোগার্থে, পুঁজিবৃদ্ধির প্রয়োজনে নয়। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: শ্রমিক কর্তৃক সৃষ্ট উদ্বৃত্তমূল্যের পুঞ্জীভূবন এবং এই পুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রসারণ। এই প্রক্রিয়াটিই হলো পুঁজির সঞ্চয়। পুঁজিপতি শ্রেণির পুঁজিসঞ্চয় ঘটে শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করে। আপেক্ষিক উদ্বৃত্তমূল্য বাড়িয়ে পুঁজিসঞ্চয় ঘটানোর জন্য শিল্পের আধুনিকায়ন বা যন্ত্রীকরণের প্রয়োজন হয়। ফলে শ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়। শিল্পে শ্রমিকের যোগান বেশি হওয়ায় পুঁজিপতি শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়ার সুযোগ পায়। ফলে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরিও কমে। সমাজে একদিকে যখন মুষ্টিমেয় মানুষের পুঁজিসঞ্চয় বাড়তে থাকে বা সম্পদ বাড়তে থাকে তখন অন্যদিকে বাড়তে থাকে জনগণের দারিদ্র্য।

১১. শ্রমশক্তির নৈতিক বিবেচনা

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি আবির্ভুত হয় একটি পণ্য হিসেবে। শ্রমশক্তিকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমত, শ্রমশক্তি নামক পণ্যের মালিক তথা

[৫৩] শোভনলাল দত্তগুপ্ত ও উৎপল ঘোষ, *মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০, পৃ. ৯৪।

শ্রমিক একজন বিশেষ ব্যক্তি অর্থাৎ সে তার "...নিজের দেহের অবিসংবাদিত মালিক..."[৫৪] কাজেই কোনো অর্থেই শ্রমিক দাস নয়। সে শ্রমশক্তি নামক পণ্যের মালিক আর তার এ মালিকানা অন্যান্য পণ্যের মালিকানার মতো স্বাধীন। তবে শ্রমিক নিজে কোনো পণ্য নয়, সে পণ্যের মালিক। শ্রমবাজারে পুঁজিপতি ক্রেতা ও শ্রমিক বিক্রেতা হিসেবে আবির্ভুত হয়। দ্বিতীয়ত, বাজারে শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ব্যতীত শ্রমিকের অন্য কোনো পণ্য থাকে না, অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য সে শ্রমশক্তিকেই বিক্রি করতে বাধ্য হয়।[৫৫] শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনে এবং পুনরুৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম সময় দিয়ে। শ্রমশক্তির মূল্য হচ্ছে শ্রমিকের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপায়াদির মূল্য। পুঁজিপতি মুনাফার স্বার্থে সবসময়ই চেষ্টা করে দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিককে ন্যুনতম পরিমাণে মজুরি বা শ্রমমূল্য দিতে। শ্রমের বাজার উন্মুক্ত হওয়ায় সে এই সুবিধা ভোগ করে। অন্যদিকে শ্রমিক তার দৈনন্দিন ভরণপোষণের যোগান উপযোগী মূল্য পেলেই অনেকটা বাধ্য হয়ে শ্রমশক্তি বিক্রি করে।

অন্যান্য সব পণ্য থেকে শ্রমশক্তি নামক পণ্যটি ভিন্ন প্রকৃতির বলে মার্কস মন্তব্য করেন। শ্রমশক্তি নামক পণ্যটির প্রকৃতিকে তিনি অদ্ভুত বলে মনে করেন। কেননা, শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও নৈতিক বিষয় রয়েছে। এ থেকে বলা যায় মার্কস শ্রমশক্তিকে অন্যান্য পণ্যের মতো কেবল একটা পণ্য হিসেবে বিবেচনা করেন নি। শ্রমশক্তি নামক পণ্যের বিনিময় ও মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানবিক স্বাধীনতার নৈতিক দিকটিকেও তিনি বিবেচনা করেন। কিন্তু পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তি নামক ব্যতিক্রমী পণ্যটির ক্ষেত্রে মার্কসের ন্যায় কোনোপ্রকার নৈতিক বিবেচনা না করে বরং পুঁজির স্বার্থে ইচ্ছাকৃতভাবেই কৌশলে তা উপেক্ষা করে কেবল তার বিষয়গত দিকটিকেই দেখেন। অর্থাৎ তারা শ্রমশক্তি নামক পণ্যটিকে অন্যসব পণ্যের মতো করেই বিবেচনা করেন। মার্কস কর্তৃক শ্রমশক্তিকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা অন্যান্য পণ্য থেকে শ্রমশক্তিকে পৃথক করেছে, তাকে অনন্যতা দান করেছে। মার্কস মনে করেন শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারণের সময় অবশ্যই নৈতিক বিষয়াবলিকে মাথায় রাখা উচিত। কেননা, কেবলমাত্র উৎপাদন পদ্ধতি দিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে উৎপাদন সম্পর্ক বা শ্রমশক্তি নামক পণ্যের বিনিময় নিয়মকে বিবেচনা করা যায় না। করলেও তা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। এজন্য মার্কস শ্রমশক্তিকে বিষয়গত, ঐতিহাসিক ও নৈতিকতার যুগপৎ একত্বের মধ্যে দেখেন।

---

[৫৪] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-১, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ২১৫।
[৫৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬।

১২. উদ্বৃত্ত মূল্য, শোষণ ও মুনাফা

'অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হলো ভিত্তি বা কাঠামো এবং তার ওপরেই রাজনৈতিক উপরিকাঠামো দন্ডায়মান'–এই উপলব্ধি থেকেই মার্কস অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেন।[৫৬] মার্কসীয় অর্থনৈতিক মতবাদের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব। *Capital* গ্রন্থে তিনি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব। তিনি পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ শুরু করেন পণ্য থেকে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব আবিষ্কার করেন পণ্য বিনিময়ের ধারণা থেকে।[৫৭] পুঁজিপতি যখন শ্রমশক্তি ক্রয় করে তখন তার ব্যবহারিক মূল্যটা চলে যায় পুঁজিপতির হাতে। ক্রয়কৃত শ্রমশক্তি ব্যবহার করে বা শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে সে উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন করিয়ে নেয়। শ্রমশক্তির একটা বিশেষ দিক হলো শ্রমশক্তি ব্যতীত অন্য কোনো পণ্য উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করে না। শ্রমশক্তির ব্যবহার সংঘটিত হয় বাজারের সীমানার বাইরে উৎপাদনের পর্যায়ে। তাই উদ্বৃত্ত মূল্যটা সৃষ্টি হয় বাজারের বাইরে উৎপাদনের স্তরেই। মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় শ্রমশক্তি ব্যবহারের দুটি বৈশিষ্ট্যসূচক পরিণতি দেখা যায়।[৫৮] প্রথমত, পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে শ্রমিক কাজ করে এবং শ্রম হয় পুঁজিপতির সম্পত্তি, দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত দ্রব্য প্রত্যক্ষ উৎপাদকের না হয়ে তা হয় পুঁজিপতির সম্পত্তি। এভাবে শ্রম ও তার ফসল চলে যায় পুঁজিপতির অধিকারে। এ কারণে মার্কস মনে করেন, শ্রমশক্তি কেবল ব্যবহার মূল্য নয়, বরং নিজের মূল্যের চেয়েও বেশি মূল্যের উৎস। এ থেকে বলা যায় মার্কস শ্রমশক্তিকেই উদ্বৃত্ত মূল্য বা বাড়তি মূল্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন।

মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস অনুসন্ধান করেন পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে দুটি পক্ষ থাকে, একপক্ষে থাকে উৎপাদনের উপায়ের মালিক তথা পুঁজিপতি এবং অন্যপক্ষে থাকে উৎপন্নের মালিকানা থেকে বঞ্চিত প্রত্যক্ষ উৎপাদক তথা শ্রমিক শ্রেণি। অর্থাৎ একদিকে পুঁজি অন্যদিকে শ্রম। মার্কসের মতে, শ্রমশক্তির মূল্য এবং উৎপাদনের মাধ্যমে শ্রমশক্তি কর্তৃক তৈরি মূল্য ভিন্ন পরিমাণের। পুঁজিপতি শ্রমশক্তির যে পরিমাণ মূল্য শোধ করে তার চেয়ে উৎপাদন করিয়ে নেয় বেশি পরিমাণ মূল্যের। মার্কস শ্রম সময়কে আবশ্যিক শ্রম সময় এবং অতিরিক্ত শ্রম সময় এ দুই ভাগে ভাগ করেছেন। পুঁজিপতি শ্রমিককে মূল্য দেয় কেবল আবশ্যিক শ্রম সময়ের।

---

[৫৬] হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ২৮।

[৫৭] *প্রাগুক্ত* পৃ. ২৯।

[৫৮] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-১, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ২৩৫।

আবশ্যিক শ্রম সময়ে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির সমপরিমাণ মূল্য উৎপাদন করে। শ্রম সময়ের এ সময়টা শ্রমিকের নিজের ও তার পরিবারের ভরণপোষণের মতো সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়।[৫৯] শ্রম সময়ের অন্য অংশে শ্রমিক বাড়তি মূল্য উৎপাদন করে। এ বাড়তি শ্রম সময়ে শ্রমিক যে বাড়তি পরিশ্রম করে তাই উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস।

শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয় এবং উৎপাদন সম্পর্কের সাথে শোষণের ধারণাটি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। মার্কসীয় শোষণের ধারণার বাখ্যায় দেখা যায়, তা উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদী শোষণের মূলে রয়েছে উদ্বৃত্ত মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস হলো শ্রমশক্তি। উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের জন্য পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তি ক্রয় করে। শ্রমশক্তির ক্রেতা হিসেবে পুঁজিপতি এ মূল্য আত্মসাৎ করে বিনামূল্যে। শ্রমশক্তির যা মূল্য তার চেয়ে বাড়তি যে মূল্যটা উৎপন্ন হয় শ্রমিকের শ্রমে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্যের পুরোটাই গ্রহণ করে পুঁজিপতি। উদ্বৃত্ত মূল্যের এই নিয়ম অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন ও শ্রমিককে শোষণের মাধ্যমে পুঁজিপতি কর্তৃক সে মূল্যের আত্মসাৎ হলো পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক নিয়ম।[৬০] অর্থাৎ মার্কসের মতানুসারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষণ দেখা দেয় অর্থনৈতিক আবশ্যিকতা হিসেবে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক হলো শ্রম শক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেখানে আবশ্যিকভাবেই উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয়। পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রম সময়ের একটা অংশ কিনে নেয়। আর শ্রমিক তা বেঁচে দেয় মজুরির বিনিময়ে। শ্রমিক তার শ্রমের এ অংশের জন্য মূল্য পায়। কিন্তু শ্রম সময়ের অন্য অংশ অর্থাৎ বাড়তি শ্রমের জন্য শ্রমিককে কোনো মূল্য দেয়া হয় না। এ বাড়তি শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট বাড়তি মূল্য বা উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে এবং তার মাধ্যমে শ্রমিককে শোষণ করে। মার্কস মনে করেন, উদ্বৃত্ত মূল্য উদ্বৃত্ত শ্রম সময় থেকেই আসে এবং উদ্বৃত্ত মূল্যটা হলো দাম না দেয়া শ্রম।[৬১] উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য শ্রমিককে বাড়তি শ্রম সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এই বাড়তি শ্রম বা বাড়তি শ্রম সময়ের জন্য শ্রমিককে কোনো বাড়তি মজুরি দেয়া হয় না, তাকে শোষণ করা হয়। পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ এবং শ্রমিককে শোষণ পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির অনিবার্য পরিণতি। পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক নিয়মানুসারেই এটা হয়ে থাকে। এ নিয়ম অনুযায়ী শ্রমশক্তির দ্বারা সৃষ্ট মোট মূল্য এবং শ্রমশক্তির আবশ্যিক মূল্য যা শ্রমিককে প্রদান করা হয়, তার মধ্যে ব্যবধান তৈরি হয়। এ ব্যবধান থেকেই শোষণের উদ্ভব।

---

[৫৯] হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ২৮।

[৬০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

[৬১] Marx, *Theories of Surplus-Value*, vol. 3, Moscow: Progress Publishers, 1971, p. 481.

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষণকে মার্কস বাজার বা সঞ্চলনের পর্যায়ের বাহ্যরূপের মধ্যে দেখেননি, শোষণকে তিনি দেখতে পান উৎপাদনের পর্যায়ে। মার্কসীয় মতানুসারে শ্রমিকের প্রতি শোষণ সম্পন্ন হয় উৎপাদনের পর্যায়ে, বাজারে নয়। মার্কসের ভাষ্য অনুসারে, পুঁজিবাদে উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্য শ্রমিককে তার শ্রমশক্তির পূর্ণমূল্য বা কোনো তুল্যমূল্য প্রদান করা হয় না। এই অর্থেই উদ্বৃত্ত শ্রমকে দাম না দেয়া শ্রম বলা যায়।[৬২] এঙ্গেলস মনে করেন, "...উদ্বৃত্ত মূল্য হলো সেই মূল্য সমষ্টির সাধারণ রূপের পরিচায়ক, উৎপাদনের উপায়ের মালিকেরা কোনো তুল্যমূল্য না দিয়েই যে মূল্যগুলো উপযোজন করে...।"[৬৩] মার্কসের মতে, শ্রমশক্তি নামক পণ্যটি বিনিময়ের ক্ষেত্রে শ্রমিককে যে মজুরি দেয়া হয় তা কেবল প্রয়োজনীয় শ্রম সময়ের তুল্যমূল্য। উদ্বৃত্ত শ্রম সময়ের জন্য কোনো তুল্যমূল্য তাকে দেয়া হয় না। শ্রমিককে তার শ্রমশক্তির পূর্ণমূল্য বা তুল্যমূল্য প্রদান করা হলে কোনো উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে পুঁজিবাদে তা করা হয় না। এ কারণে উদ্বৃত্ত মূল্য হলো মজুরি বঞ্চিত শ্রম ও শ্রমিককে শোষণের ফল।

মার্কস মনে করেন, ফিজিওক্রাটসদের[৬৪] পূর্বের অর্থনীতিবিদরা উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফাকে বিনিময় দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। তারা কৃষি উৎপাদনের পর্যায়ে শ্রমের ভেতর উদ্বৃত্ত মূল্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।[৬৫] মার্কসের মতে, এ্যাডাম স্মিথ এর উদ্বৃত্ত মূল্যের ব্যাখ্যা চক্রক দোষে দুষ্ট। মূল্যকে তিনি মূল্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। শ্রমের মূল্যকে তিনি উৎপন্নের মূল্যের সমান বলে মনে করেন। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য শ্রমিকের থাকে না। স্মিথ মনে করেন, মজুরির মাধ্যমে শ্রমিককে তার শ্রম সময়ের একটা অংশের মূল্য দেয়া হয় এবং একটা অংশের মূল্য দেয়া হয় না।[৬৬] ডেভিড রিকার্ডো সামগ্রিকভাবে শিল্প বুর্জোয়ার পক্ষে চিন্তা করেন। তার যুক্তি ছিল উৎপাদনের জন্য উৎপাদন। তিনি মানুষের শ্রমের উৎপাদনশীলতার কথা বলেন। মার্কস রিকার্ডোর সমালোচনায় বলেন, প্রলেতারিয়েতকে তিনি যন্ত্র, পশু ও পণ্যের পর্যায়ে দেখেন।[৬৭] রিকার্ডো উদ্বৃত্ত মূল্যকে মুনাফা ও খাজনা থেকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে দেখেন।[৬৮] ম্যালথাস মজুরি কমিয়ে মুনাফা বৃদ্ধির কথা বলেন।

---

[৬২] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ -২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ.৪২।

[৬৩] এঙ্গেলস, 'পূর্বাভাস', ১৮৫৫, *পুঁজি*, খন্ড-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৯ পৃ.২৪।

[৬৪] ফিজিওক্রাটস অর্থ হলো প্রকৃতির ক্ষমতা। এটি আঠারো শতকের ফরাসী অর্থনৈতিক চিন্তার একটি ধারা। Francois Quesnay এই ধারার পুরোধা। ফিজিওক্রাটসরা মনে করতেন বিনিময় বা বাণিজ্য থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় না। তারা বিশেষভাবে কৃষি উৎপাদন থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎসকে ব্যাখ্যা করেন।

[৬৫] দেখুন, Marx, *Theories of Surplus-Value*, vol. 1, Moscow: Progress Publishers, 1971, pp. 41-49.

[৬৬] দেখুন, *Ibid*, pp. 71-80.

[৬৭] Marx, *Theories of Surplus-Value*, vol. 2, Moscow: Progress Publishers, 1971, pp. 117-120.

[৬৮] *Ibid*, p. 373.

তার সমালোচনায় মার্কস বলেন, ম্যালথাস প্রত্যক্ষ ও নির্মমভাবে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের বিরুদ্ধে ছিলেন। এমনকি তিনি এক্ষেত্রে তার অবস্থানকে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক বলে প্রমাণ পর্যন্ত করতে চেয়েছেন।[৬৯] সার্বিকভাবে এসব অর্থনীতিবিদদের সমালোচনায় মার্কস বলেন, তারা মূল্যের উৎসকে স্বাধীন বলে ব্যাখ্যা করেন, যাতে করে মনে হয় মূল্যটা ঈশ্বর প্রেরিত কিছু একটা। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে মুনাফাকে ব্যাখ্যা করা হয় না এবং মুনাফাকে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার একটা স্বাধীন অস্তিত্ব দাঁড় করানো হয়।

মার্কসের মতে, পুঁজির উপাদান হলো শ্রমের দুটি অংশ-মজুরি ও মুনাফা। অর্থাৎ একটি অংশ হলো প্রয়োজনীয় শ্রম সময়, অন্যটি হলো উদ্বৃত্ত শ্রম।[৭০] শ্রমিক মজুরি হিসেবে যা পায় তার চেয়ে বেশি মূল্য তৈরি করে। মজুরি কেবল শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য শ্রম সময়ের মূল্য। এজন্য মার্কস বলেন, শ্রমিককে যে মজুরি প্রদান করা হয় তা কেবল প্রয়োজনীয় শ্রম সময়ের সাথেই তুল্য, উদ্বৃত্ত সময়ের সাথে নয়। পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত শ্রম সময়ের জন্য কোনো সমতুল্য প্রদান করে না।[৭১] একইভাবে মার্কস *পুঁজি* গ্রন্থে উদ্বৃত্ত মূল্য ও মুনাফাকে দাম না দেয়া অসম বিনিময় বলেন।[৭২] উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফাকে তিনি এই পারিশ্রমিকবিহীন শ্রম দিয়েই ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন,

> পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার ভিতরে যে শ্রম বিধৃত থাকে তার সমগ্র পরিমাণের দ্বারাই। কিন্তু শ্রমের ঐ পরিমাণের এক অংশ রূপায়িত হচ্ছে একটি মূল্যের ভিতরে যার তুল্যমূল্য মজুরি রূপে দেওয়া হয়েছে, আর একটি অংশ উশুল হচ্ছে এক মূল্যের ভিতরে যার জন্য কোনো তুল্যমূল্য দেওয়া হয়নি। পণ্যের ভিতরে যে শ্রম রয়েছে তার এক অংশ হচ্ছে পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত শ্রম, আরেক অংশ হচ্ছে পারিশ্রমিকহীন শ্রম।[৭৩]

মার্কস মনে করেন, পণ্যকে তার চাইতে অধিক মূল্যে বিক্রি করার মধ্য দিয়ে মুনাফা আসে না।[৭৪] পণ্যকে তার যথার্থ মূল্যে বিক্রি করার মধ্য দিয়েই মুনাফাটা আসে। তিনি বলেন,"উদ্বৃত্ত মূল্য অর্থাৎ সমগ্র পণ্য-মূল্যের সেই অংশ যার ভিতরে মজুরের উদ্বৃত্ত বা পারিশ্রমিকহীন শ্রম রূপ পেয়েছে,

---

[৬৯] *Ibid,* p. 120.
[৭০] Marx, *Grundrisse,* (Trans.) Martin Nicolaus, London: Penguin books Ltd., 1993, p. 324.
[৭১] *Ibid,* p. 458.
[৭২] দেখুন, মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ১৩, ৪২, ৮৬, ১০১, ১০৬, ১২১, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৬, এবং মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৫৫, ৪৫৫।
[৭৩] মার্কস, 'মজুরি,দাম, মুনাফা', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ৯৫।
[৭৪] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ, ৫৫।

তাকেই আমি বলি মুনাফা।"[৭৫] মার্কস এই দাম না দেয়া পারিশ্রমিকহীন শ্রমকেই মুনাফা বলে মনে করেন। পূর্বোক্ত অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে উৎপাদিত পণ্যকে তার মূল্যের চাইতে বেশি মূল্যে বিক্রি করা থেকে। মার্কস ও এঙ্গেলস এ ধারণার তীব্র বিরোধিতা করেন।[৭৬] মার্কস মনে করেন, মুনাফা আসে উদ্বৃত্ত শ্রম থেকে, যা হলো মজুরি বঞ্চিত শ্রম। তিনি বলেন,

> পণ্যের মধ্যে বিধৃত মূল্য তার উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম-সময়ের সমান এবং এই শ্রমের পরিমাণ ধারন করে মজুরি প্রদত্ত ও মজুরি বঞ্চিত দুটি অংশকেই। কিন্তু ধনিকের কাছে পণ্যের ব্যয় ধারণ করে তার মধ্যে বস্তু রূপায়িত শ্রমের কেবল সেই অংশটি, যার জন্য সে মজুরি দিয়েছে। পণ্যের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত শ্রমের জন্য ধনিককে কিছু ব্যয় করতে হয় না, যদিও মজুরি প্রদত্ত অংশটির মতোই শ্রমিককে তার জন্য ব্যয় করতে হয় তার শ্রম এবং যদিও তা সৃষ্টি করে মূল্য এবং পণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে ঠিক মজুরি প্রদত্ত শ্রমের মতোই একটি মূল্য সৃজনী উপাদান হিসেবে। ধনিকের মুনাফা আসে এই ঘটনাটি থেকে যে বিক্রি করার জন্য তার এমন কিছু আছে যার জন্য সে কোনো ব্যয় করে নি।[৭৭]

শ্রমশক্তি ব্যবহারের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পুঁজিপতি মজুরি হিসেবে যে দাম দেয়, সে শ্রমিকের কাছ থেকে তার চেয়ে অধিক গ্রহণ করে। মার্কস মনে করেন, মুনাফার উৎস উদ্বৃত্ত শ্রমের শোষণ বিচলন পর্যায়ে বা বাজারে ঘটে না, শোষণ সম্পন্ন হয় উৎপাদনের পরিসরে, যার জন্য পুঁজিপতিকে কোনো বিনিময় মূল্য দিতে হয় না। এই নতুন সৃষ্ট মূল্যে পুঁজিপতির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের নিজস্ব উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুযায়ী। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের জন্য কোনো তুল্যমূল্য না দিয়েই শ্রমিককে উৎপাদনে বাধ্য করা হয়। মার্কসের মতে, পুঁজিপতির মুনাফা আসে উদ্বৃত্ত মূল্যকে শোষণ করার মধ্য দিয়ে। তিনি মনে করেন, স্বয়ং পুঁজি থেকে কোনো উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় না। মুনাফার রহস্য হলো উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ করা। মার্কস বলেন, "...মুনাফা হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি পরিবর্তিত রূপ–এমন একটি রূপ, যে রূপটিতে তার উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের রহস্যটি থাকে প্রচ্ছন্ন এবং নির্বাপিত।"[৭৮] এ থেকে বলা যায় যে, পুঁজিপতি যে মুনাফা অর্জন করে তা আসলে মজুরি বঞ্চিত দাম না দেয়া উদ্বৃত্ত শ্রমের মুনাফা আকারে পরিবর্তিত রূপ।

---

[৭৫] মার্কস, 'মজুরি দাম মুনাফা', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ৯৬।

[৭৬] দেখুন, মার্কস, *পুঁজি*, পঞ্চম খন্ড, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ১০-১৮।

[৭৭] মার্কস, *পুঁজি*, পঞ্চম খন্ড, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৪০।

[৭৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬।

১৩. পুঁজিপতি ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক ও পুঁজিপতির স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। কারণ পুঁজিপতি সবসময় চায় কী করে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বাড়ানো যায়, অন্যদিকে শ্রমিক চায় তার মজুরির পরিমাণ বাড়াতে। পুঁজিবাদের সূচনার যুগে বলপ্রয়োগ, লুণ্ঠন, হত্যা ও শোষণ-পীড়নের যে ধারা অনুসরণ করে পুঁজির আদি সঞ্চয় শুরু হয়েছিল, সেই ধারা এখনও অব্যাহত আছে। তবে এখন তা হচ্ছে খুব সূক্ষ্মভাবে, মার্জিতভাবে, স্বাধীন চুক্তির মুখোশের আড়ালে। এখন পুঁজিবাদের অন্যতম শর্ত হলো স্বাধীন শ্রমিক শ্রেণি। এর অর্থ হলো, এমন একটি শ্রমিক শ্রেণি থাকবে যা দুটি অর্থে স্বাধীন। প্রথমত, শ্রমিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকতে হবে, অর্থাৎ সে তার ব্যক্তিগত শ্রমশক্তি নামক সম্পত্তি অন্য কোনো লোকের মতামত ছাড়াই বিক্রি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, সে হবে সমস্ত সম্পদের মালিকানা থেকে মুক্ত, সে হবে সর্বহারা, নিজের শ্রমশক্তি ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ তার অবশিষ্ট থাকবে না। উৎপাদনের উপাদান বলতে কোনোকিছু তার থাকবে না। এমনকি তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের কোনো উপায়ও তার অধিকারে থাকবে না। এ অবস্থায় নিজের শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে কেবল নিজের জন্য কোনো প্রকার উৎপাদন করার মতো পরিস্থিতি তার সামনে খোলা থাকবে না। অর্থাৎ নিজেদের শ্রমশক্তি বজায় রাখতে এবং নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতে যা প্রয়োজন তা সে স্বাধীনভাবে উৎপাদন করতে পারবে না। তাকে যা করতে হবে তা হলো পুঁজিপতির নিকট নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।

আইনের চোখে পুঁজিপতি ও শ্রমিক উভয়ই সমান স্বাধীনতা ভোগ করে। সুতরাং এই ব্যবস্থায় জোর করে শ্রমিককে শোষণ করা হয় না। স্বাধীন শ্রমিক স্বাধীন চুক্তিমতো পুঁজিপতির নিকট থেকে মজুরি নিয়ে শ্রম বিনিয়োগ করে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটে তা হলো স্বাধীনতার নামে শ্রমিক সর্বহারায় পরিণত হয়। স্বাধীন চুক্তির নামে শ্রমিক যা করতে বাধ্য হয় তা হলো নিজেকে শোষণ করার অধিকার পুঁজিপতির হাতে তুলে দেয়, তা দেয় কেবল বেঁচে থাকার মতো সামান্যতম মজুরির বিনিময়ে। কারণ, পুঁজিপতি শ্রেণির নিকট বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ছাড়া তার আর কোনো পথ খোলা থাকে না। পুঁজিপতি নিজের প্রয়োজনে শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে, তাকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করে, এতে সে খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে। আবার পুঁজিপতি যখন নিজের খুশিমতো তাকে কাজ থেকে বিদায় দেয়, তখন তার সামনে দেখা দেয় অনাহারে মৃত্যুর বিপদ। তার বেঁচে থাকার একমাত্র শর্ত হলো নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে পারা। তাই তাকে বারবারই পুঁজিপতিদের

দ্বারস্থ হতে হয়। তার দাসত্ব অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি বিস্তৃত। বেঁচে থাকতে হলে তাকে একজন পুঁজিপতি খুঁজে পেতে হবে যে তাকে নিয়োগ করবে। সে স্বাধীন, তাই সে কোনো বিশেষ পুঁজিপতির দাস নয়, কিন্তু কার্যত সে গোটা পুঁজিপতি শ্রেণিরই দাস। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস বলেন,

> পুঁজিবাদী উৎপাদন আপনা থেকেই শ্রমশক্তি ও শ্রমের উপকরণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে পুনরুৎপাদন করে। এই প্রথা তাই শ্রমিককে শোষণ করার শর্ত পুনরুৎপাদন ও স্থায়ী করে। এই প্রথা অবিরত তাকে বাঁচার জন্য নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য করে এবং পুঁজিপতিকে সমর্থ করে নিজেকে আরো ধনী করার জন্য শ্রমশক্তি কিনতে। এটা আর কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে, পুঁজিপতি ও শ্রমিক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা রূপে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এই প্রক্রিয়াই অবিরাম শ্রমিককে তার নিজের শ্রমশক্তির বিক্রেতা রূপে বাজারে ঠেলে ফেরত পাঠাচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়াই তার নিজের উৎপাদনকে এমন এক উপায়ে পরিণত করছে যার সাহায্যে অন্য একজন লোক তাকে কিনে নিতে পারে। বাস্তবে, শ্রমিক নিজেকে পুঁজির কাছে বিক্রি করে দেবার আগেই পুঁজির অধিকারভুক্ত। কিছুদিন পরে পরে নিজেকে বিক্রি করা, তার প্রভূ বদল এবং শ্রমশক্তির বাজার দাম ওঠানামার দ্বারা তার এই দাসত্ববন্ধন সৃষ্টি হয়, আবার ঢাকাও থাকে।[৭৯]

পুঁজিবাদী উদ্যোগে শ্রমপ্রক্রিয়ার দুটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রথমত, পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকেরা কাজ করে এবং দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পণ্যে পুঁজিপতির মালিকানা বর্তায়। সে কোন পণ্য উৎপাদন করবে, কতটা করবে এবং কীভাবে উৎপন্ন হবে তাও নির্ধারণ করে। পুঁজিবাদের আওতায় শ্রমপ্রক্রিয়ার এই সুনির্দিষ্ট দিকগুলো মজুরি শ্রমিকের শ্রমকে একজন ক্রীতদাসের নির্যাতনমূলক শ্রমে রূপান্তরিত করে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকের স্থায়ী শোষণের পরিবেশটি গড়ে উঠেছে। শ্রমিক সেখানে হয়ে পড়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বন্দি। পুঁজিবাদী সমাজের এক মেরুতে সম্পদ, বিলাস ও অবসর বৃদ্ধি অনিবার্যভাবে শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা ও বেকারত্ব বাড়ায় এবং মেহনতিদের অবস্থার অবনতি ঘটায়। পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের এই সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে কার্ল মার্কস বলেন,

---

[৭৯] কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৯৪-৯৫।

> যত বৃদ্ধি পায় সামাজিক সম্পদ, চলমান পুঁজি, তার বৃদ্ধির পরিসর ও কর্মশক্তি এবং ফলত প্রলেতারিয়েতের চূড়ান্ত সংখ্যা ও তার শ্রমের উৎপাদনশীলতা, ততই বৃদ্ধি পায় শিল্পের সংরক্ষিত বাহিনী। ...কিন্তু সক্রিয় শ্রমিক বাহিনীর অনুপাতে এই সংরক্ষিত বাহিনীর আয়তন যতই বেশি হয়, ততই বেশি হয় সংহত উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পরিমাণ, এই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার দুর্দশা তার শ্রম-যন্ত্রণার বিপরীত অনুপাতে হয়। শেষে শ্রমিক শ্রেণির ও শিল্পসংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত বাহিনীর ভিক্ষুক স্তরগুলো যত বিস্তৃত হয়, সরকারিভাবে স্বীকৃত নিঃস্বতা তত বাড়ে। এই হলো পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের অনাপেক্ষিক সাধারণ নিয়ম।[৮০]

পুঁজিবাদের সমর্থকেরা মনে করেন, পুঁজিপতি নিজের পুঁজি খরচ করে কারখানা স্থাপন করে, যন্ত্র বসায়, কাঁচামাল ক্রয় করে, মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিযুক্ত করে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার ঝুঁকি পুঁজিপতিই গ্রহণ করে। শ্রমিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে শ্রম দেয়, পূর্বনির্ধারিত মজুরি হিসেবে তার সবটাই পুঁজিপতি তাকে দিয়ে দেয়। সুতরাং শ্রমিকের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তারা আরো মনে করেন, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। কারণ পুঁজিবাদীদের পুঁজি যত বাড়বে, তাদের ব্যবসা যত ভাল হবে, উৎপাদনের ক্ষেত্র তথা শ্রমবাজার ততই বিস্তৃত হবে। সেই সঙ্গে শ্রমিকের চাহিদাও বাড়বে এবং ফলস্বরূপ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পাবে। পুঁজিপতি যদি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রমিক নিয়োগ না করে তাহলে শ্রমিকের ধ্বংস অনিবার্য। আবার উৎপন্নের উদ্বৃত্ত অংশ সঞ্চয় করতে না পারলে পুঁজিও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মার্কসবাদী দর্শনে মনে করা হয়, পুঁজিপতির এ ধরনের কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রমিককে শোষণের মাধ্যমে নিজেদের সম্পদ ও আধিপত্য বৃদ্ধি করা। বর্ধিত সম্পদ পরবর্তীকালে পুঁজি হয়ে বর্ধিত হারে শ্রমিককে শোষণ করে। আসলে শ্রম শোষণের ওপরই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। তাই এ ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের বৈরি সামাজিক সম্পর্কের অবসান সম্ভব নয়।

১৪. পুঁজিবাদে শ্রমিকের বিনাশ

মার্কস মনে করেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির দুটি ধরন রয়েছে।[৮১] একটি হলো উৎপাদকের নিজস্ব শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যটি হলো অপরের শ্রম নিয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পুঁজিবাদ নিজস্ব শ্রমের ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনাশ করে অপরের শ্রমের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে স্বোপার্জিত

[৮০] কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ১৭৫।
[৮১] আখতার সোবহান খান, *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ১৩২।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনাশ সাধন করে।[৮২] মার্কসের মতে, পুঁজিপতি অন্যের সম্পত্তির ওপর দখলদার শ্রেণি, আর দখলচ্যুত হয়ে যাওয়া শ্রেণি হলো শ্রমিক শ্রেণি। পুঁজিবাদে অপরের শ্রম নিয়োগের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তৈরি হয়। উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ প্রক্রিয়ার ফলে শ্রমিকের স্বোপার্জিত সম্পদের ওপর পুঁজিপতির দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে মার্কস বলেন, "...পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল শর্ত হলো স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনাশ; ভাষান্তরে শ্রমিকের দখলচ্যুতি।"[৮৩] মার্কস মনে করেন যে, এর মধ্য দিয়ে শ্রমিক তার উৎপন্ন উপযোজন করতে পারে না এবং এর ফলে শ্রম থেকে সম্পত্তির বিচ্ছেদ ঘটে।

পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় শ্রমিক তার নিজের উৎপন্নকে আত্মীকরণ বা ভোগ করতে পারে না। ফলে সেটা শ্রমিকের কাছে একটা বিচ্ছিন্ন সম্পত্তি হিসেবে আবির্ভুত হয়। বিপরীতক্রমে বলা যায়, বিচ্ছিন্ন শ্রম পুঁজি ও সম্পত্তি হিসেবে আবির্ভুত হয়। মার্কস বলেন, ইতিহাসে প্রথম পর্যায়ে শ্রম ও সম্পদের সহযাত্রা দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তা দেখা দেয় শ্রম থেকে সম্পত্তির নেতিকরণ হিসেবে।[৮৪] তিনি মনে করেন যে, পুঁজিবাদে এক অদ্ভুত যুক্তিতে সম্পত্তির অধিকারের ধারণা উল্টে যায়। পুঁজি বিচ্ছিন্ন শ্রমের ওপর পুঁজিপতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে শ্রমিককে তার শ্রমের জন্য কোনো তুল্যমূল্য না দিয়েই। এতে করে সম্পত্তি অধিকারের ধারণা উল্টে যায়। শ্রমিকের সৃষ্ট মূল্য অন্য কারো মালিকানায় যায়। প্রথম বিনিময়ের মধ্যে যে আইনগত সমতা দেখা যায়, এ পর্যায়ে তা কেবল বিভ্রম হিসেবে হাজির হয়। কেননা, এক্ষেত্রে কোনো তুল্যমূল্য না দিয়েই পুঁজিপতি বিচ্ছিন্ন শ্রমকে আহরণ করে। এ ক্ষেত্রে বিনিময়ের পর্যায় থেকে একটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে যাওয়া হয় এবং বিনিময়ের নিয়মকে ত্যাগ করা হয়। মার্কস উৎপাদকের নিজস্ব শ্রমের ভিত্তিতে সম্পত্তির মালিকানা ও অধিকার প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করেন। তিনি পুঁজিবাদে অন্যের শ্রমের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন এবং অন্যের শ্রমের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ধারণাকে অগ্রহণযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেন।

মার্কস শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে শ্রম ও পুঁজির বিরোধ নিরসনের কথা বলেন। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে কোনো ভারসাম্যমূলক অবস্থা বা বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে শ্রম ও পুঁজির বিরোধের অবসান সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। তাই তিনি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। পুঁজিবাদের মধ্যেই শ্রম ও পুঁজির বিরোধ নিরসনের ধারণাকে

---

[৮২] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৩২৭।

[৮৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩৯।

[৮৪] Marx, *Grundrisse*, (Trans.) Martin Nicolaus, London: Penguin books Ltd., 1993, p. 470.

এঙ্গেলস ইউটোপীয় বলে প্রত্যাখ্যান করেন। এঙ্গেলস বলেন, "...ইউটোপিয়া তখনই শুরু হয় যখন কেউ বর্তমান সমাজের কোনো একটা বৈপরীত্য নিরসনের রূপ নির্দেশ করতে এগোন প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই।"[৮৫] মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায্য শ্রমমূল্যের ধারণার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, "দিনের ন্যায্য খাটুনির জন্য ন্যায্য দিন মজুরি!–এই রক্ষণশীল নীতির বদলে তাদের (শ্রমিকদের) উচিত পতাকায় এই বিপ্লবী মন্ত্র মুদ্রিত করা–'মজুরি প্রথার অবসান চাই'।"[৮৬] বিপ্লবের এই মন্ত্রে উজ্জীবিত না হয়ে যদি পুঁজিবাদের অবসান না ঘটানো যায়, তাহলে বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমজীবী শ্রেণির আত্মিক ও মানবিক স্বাধীনতার বিনাশ কেউ আটকাতে পারবে না।

১৫. উদ্বৃত্ত মূল্য ও শ্রম শোষণ

মার্কসীয় তত্ত্বানুযায়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা আবশ্যকীয় পর্যায় হলো শ্রম শোষণ। শ্রম শোষণের এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। আসলে পুঁজিবাদী নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে অসমতার ওপর ভিত্তি করে। এখানে একটি ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী ধনীক শ্রেণি নিরন্তর বিলাসী জীবনে ডুবে আছে। অন্যদিকে সমাজের ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষ সীমাহীন দারিদ্র্য, অসাম্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন যাপন করছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল ভিত্তি উৎপাদন উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার কারণেই এমন হয়। তাছাড়া সমাজে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগেরও তারতম্য ঘটে। তাত্ত্বিকভাবে, একজন শ্রমিক মুক্ত মানুষ হিসেবে নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তার স্বাধীনতা দারুণভাবে সীমিত। একদিকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, অন্যদিকে মালিকের শোষণমূলক শর্ত-এ দুটোর যে কোনো একটা বেছে নেয়ার স্বাধীনতাই মূলত তার রয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষই হলো অভাবী। তাই তারা স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে না। অভাবের কারণে সে বাধ্য হয় নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে। সে শ্রমের নামমাত্র মূল্য পায় বটে, তার পূর্ণ শ্রমশক্তি যে পরিমাণ উৎপাদন করে, সে তুলনায় তা কিছুই নয়। পারিশ্রমিক হিসেবে শ্রমিককে দেওয়া অংশের উদ্বৃত্ত পুরো অংশই চলে যায় পুঁজিপতির পকেটে।

পুঁজিবাদী শোষণের বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস পুঁজি গ্রন্থের অনেক জায়গায়ই বলেন, মুনাফা বা উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ হলো শ্রমিককে তার উদ্বৃত্ত শ্রম সময়ের জন্য কোনো মূল্য প্রদান না করে তা আত্মসাৎ করা। যেমন তিনি বলেন, পুঁজি "...ধনিককে সক্ষম করে শ্রমিকদের কাছ থেকে কিছু পরিমাণ মজুরি বঞ্চিত শ্রম, উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন এবং উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে নিতে এবং তা আত্মসাৎ

[৮৫] এঙ্গেলস, 'বাস-সংস্থান সমস্যা', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ, ৩০০।
[৮৬] মার্কস, 'মজুরি দাম মুনাফা', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ, ১১১।

করতে।"[৮৭] মার্কস পুঁজিপতি শ্রেণিকে এ কারণে আত্মসাৎকারী শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৮৮] এখানে আত্মসাৎ বলতে তিনি অন্যের কোনোকিছু অন্যায়ভাবে নিয়ে নেওয়াকে বুঝিয়েছেন। এঙ্গেলস বলেন, "শ্রমিক ন্যায্যভাবেই অনুভব করে যে মজুরি ফিরিয়ে দেওয়ার সময়ের ওপর অতিরিক্ত যত ঘন্টা কাজ তাকে করতে হচ্ছে, তার সবটুকুই তার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে অন্যায় করে...।"[৮৯] এঙ্গেলসের এ বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় ও উদ্বৃত্ত-মূল্য আহরণ বা উদ্বৃত্ত-মূল্য শোষণকে তিনি অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা হিসেবে দেখেন। এটা অন্যায় ও নিষ্ঠুর এ কারণে যে শ্রমিককে উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্য কোনো প্রাপ্য না দিয়েই সেটি পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে। উদ্বৃত্ত মূল্য হলো মজুরি বঞ্চিত শ্রম। এই মজুরি বঞ্চিত কথাটি থেকেই এটা বেরিয়ে আসে যে, শ্রমিককে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়, তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। এ ধরনের বঞ্চনা অবদান অনুযায়ী প্রাপ্তির ধারণাকে লঙ্ঘন করে বিধায় তা অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা।

মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণকে চৌর্যবৃত্তি গণ্য করে এর নিন্দা করেন। তিনি বলেন, "মানুষের শরীরের বৃদ্ধি, উন্নতি ও সুস্থ অবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও সে (পুঁজিপতি) আত্মসাৎ করে। টাটকা হাওয়া ও সূর্যের আলো পাবার জন্য যেটুকু সময় দরকার সেটুকুও সে (পুঁজিপতি) চুরি করে।"[৯০] অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণকে মার্কস কেবলমাত্র শ্রমশক্তির শোষণই মনে করেননি। এই শোষণকে একই সাথে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সময়কে, যেন জীবনের একটা অংশকে কৌশলে ছিনিয়ে নেয়া হিসেবে দেখেন। তিনি মনে করেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি শোষণ তীব্রতর করার মাধ্যমে শুধু যে মানুষের স্বাভাবিক, নীতিগত ও শারীরিক উন্নতি ও প্রক্রিয়ার সুযোগ-সুবিধা হরণ করে মানুষের শ্রমশক্তির অবনতি ঘটায় তাই নয়, এর দ্বারা এই শ্রমশক্তিকেই অকালে নিঃশেষ করে তার মৃত্যু ঘটায়।[৯১] মার্কস বলেন,

> এটার (আদি পুঁজির) উদ্ভব কীভাবে হলো তা আমরা ভাল করেই জানি। এর মূল্যের মধ্যে এমন একটি কথাও নেই যার অস্তিত্ব দাম-না-দেওয়া শ্রম থেকে উদ্ভূত নয়। যে উৎপাদনের উপায়ের সাহায্যে অতিরিক্ত শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো হয় এবং শ্রমিকের জীবন ধারণের প্রয়োজনে যেসব জিনিস লাগে সেগুলি উদ্বৃত্ত উৎপাদনের,

[৮৭] মার্কস, *পুঁজি*, পঞ্চম খন্ড, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪১।
[৮৮] দেখুন, মার্কস, 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ১৮৯।
[৮৯] এঙ্গেলস, 'মার্কসের পুঁজি', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ১৩০।
[৯০] মার্কস, পুঁজি, খন্ড-১, অংশ-১, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৩২৯।
[৯১] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩০।

> অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির কাছ থেকে পুঁজিপতি শ্রেণি প্রতি বছর যে সেলামী আদায় করে–তারই অংশভুক্ত উৎপাদন ছাড়া কিছু নয়...বিজিতদের কাছ থেকে লুট করা অর্থ দিয়ে তাদের (শ্রমিকদের) কাছ থেকে পণ্য কিনে প্রত্যেক বিজয়ী (পুঁজিপতি) যে ধোঁকা দেয়, উপরোক্ত (পুঁজিবাদী) লেনদেনও সেই পুরোনো ধোঁকাই।[৯২]

এক্ষেত্রে মার্কস কেবলমাত্র পুঁজির আদিম সঞ্চয়কেই শোষণ বলে মনে করেন নি, মার্কস পদ্ধতিগত পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি আত্মসাৎ করাকেও শোষণ ও নিষ্ঠুরতা হিসেবে দেখেন। অনেকটা বিজিতরা যেভাবে বিজয়ীদের সেলামি বা কর প্রদান করে থাকে, শ্রমিক শ্রেণিও সেভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য লুণ্ঠনের প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতি শ্রেণিকে সেলামি বা কর প্রদান করে থাকে। পুঁজিপতি জোরপূর্বক শ্রমিকের প্রাপ্য নিজের দখলে নেয়। পুঁজিবাদী-শোষণ শব্দটি এমন একটি নেতিবাচক নৈতিক ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে যাতে ব্যক্ত হয় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতি জোরপূর্বক শ্রমিককে তার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে তা দখল করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে শ্রমিকের তৈরি উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতি কর্তৃক আত্মসাৎ করাকে মার্কস চরম নিষ্ঠুরতা বলে মনে করেন। মার্কস পুঁজিবাদকে স্বার্থতাড়িত পশুরাজ্যের সাথে তুলনা করে বলেন, "সমাজের মধ্যে শ্রম বিভাজনের ফলে স্বতন্ত্র পণ্য উৎপাদকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়, যারা প্রতিযোগিতা ছাড়া, তাদের পারস্পরিক স্বার্থের চাপজনিত বাধ্যবাধকতা ছাড়া অন্য কোনো কিছুরই কর্তৃত্ব স্বীকার করে না।"[৯৩] মার্কস পুঁজিবাদী সভ্যতাকে শ্রমের দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত...জঘন্য সভ্যতা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন।[৯৪]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষক শ্রেণি কাজ না করে খাওয়ার জন্য লজ্জিত না হয়ে বরং গর্ববোধ করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থকেরা বলেন, পুঁজিপতি শ্রেণি কাজ না করলেও তাদের টাকা অলস বসে থাকে না। তাছাড়া টাকা বিনিয়োগ করে তারা যে ঝুঁকি নেয় তার পরিবর্তে তারা মুনাফা ভোগ করে। কিন্তু পুঁজিপতিরা যখন বিনিয়োগের ঝুঁকি নেয়, শ্রমিকেরা তখন জীবনের ঝুঁকি নেয়। ছোটখাট যুদ্ধে যে পরিমাণ মানুষ আহত ও নিহত হয় তার তুলনায় কলকারখানাগুলোতে অনেক বেশি মানুষ আহত ও নিহত হয়। আবার বয়োঃবৃদ্ধির সাথে সাথে বৃহদায়তন শিল্পগুলোতে শ্রমিকেরা চাকরির অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া সব সময় শ্রমিকদেরকে চাকরি হারাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। অর্থাৎ

---

[৯২] মার্কস, পুঁজি, খন্ড-১, অংশ-২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ১০০।
[৯৩] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-১, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৪৩৮।
[৯৪] দেখুন, মার্কস, 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ২০৪।

উৎপাদনের পর্যায়ে শ্রমিকেরা সর্বোচ্চ পরিমাণে ঝুঁকির মধ্যে থাকে। কিন্তু এ ঝুঁকির বিনিময়ে তারা কিছুই পায় না।

পুঁজিবাদী সমাজে উত্তরাধিকারের গুরুত্বের দিক বিবেচনা করলেও উপলব্ধি করা যায় শ্রমিকেরা কেমন নিষ্ঠুরতার শিকার। পুঁজিবাদী উত্তরাধিকারের সূত্রেই পুঁজিপতিদের সন্তানেরা বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদের মালিক হয়। পূর্বসূরীদের ন্যায় তাদেরকেও কোনো কাজে হাত লাগাতে হয় না। উৎপাদনের উপকরণের ওপর তাদের মালিকানার বদৌলতে তারা অন্যের শ্রম শোষণ করে খেতে সমর্থ হয়। অথচ শ্রমিকের সন্তানেরা বাধ্য হয়েই শ্রমিকের খাতায় নাম লেখায়। কাজেই এ নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় সুযোগেরও অসাম্য তৈরি হয়। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোকে এখন সুযোগের দেশ বলে বিবেচনা করা হলেও শ্রেণি হিসেবে শ্রমিকদের উপরে ওঠার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ এবং তা দিন দিন অসম্ভব হয়ে উঠছে। কারণ সামাজিক অবস্থান ও সম্পদের বিষয়টা আরো বড়। যোগ্যতা নেই বলেই যে সুযোগের অভাব হয়, আসলে তা নয়। দরিদ্রদের জন্য কোনো সুযোগই নেই।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনাকাল থেকে একদল পুঁজিপতি শ্রমের সময় বৃদ্ধি করানোর মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত শ্রম সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট ছিল। অপরদিকে একদল শ্রমিক তার বাঁচার তাগিদে শ্রমের সময় কমানোর জন্য লড়াই করেছে। এক্ষেত্রে পুঁজিপতির সাথে শ্রমিকের দ্বন্দ্ব বাঁধে। পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রমসময় বৃদ্ধির মাধ্যমে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এছাড়া কল-কারখানায় উন্নত যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল সংযোজনের মাধ্যমেও শ্রমিককে শোষণ করে। প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও নতুন কারিগরি উদ্ভাবন শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে দেয় এবং দৈনন্দিন উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। শ্রমের সময় ঠিক রেখেও যদি উৎপাদন বাড়ানো যায়, তবে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণও বেড়ে যায়। সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যতই অগ্রগতি ঘটে সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ওপর শোষণের মাত্রা ততই বৃদ্ধি ঘটে এবং এর সব সুফল পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়। এভাবে দেখা যায় শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের উৎপন্ন আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি মুনাফার আকারে যে বাড়তি মূল্য পায়, তা হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল প্রেরণা। এই প্রেরণার বলি হতে হয় শ্রমিকদের। দাস যুগে দাস মালিকেরা দাসদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখত, ভূমিদাসরা ছিল ভূমির সাথে বাঁধা। আর পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণি শ্রমিক শ্রেণিকে মজুরির বিনিময়ে বেঁধে রাখে মজুরি দাসত্বে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য

থেকে নিজেকে ও পরিবারবর্গকে বাঁচাতে মজুরি দাসত্বের আশ্রয় নেয়া ছাড়া তথা শোষিত হওয়া ছাড়া শ্রমিকের সামনে আর কোনো পথ খোলা থাকে না।

১৬. পরিবেশের ওপর পুঁজিবাদের প্রভাব

সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের এক পর্যায়ে মানুষ শিল্প বিপ্লব ঘটায়। এটা এমন এক প্রক্রিয়া যার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। কোনো ব্যক্তির তো নয়ই, এমনকি কোনো সমাজেরও হাত নেই। নব নব আবিষ্কার এবং তার ব্যবহারই রচনা করেছে মানব সভ্যতার ভিত্তি এবং মানব প্রগতিও এর ওপর নির্ভরশীল। শিল্প বিপ্লব ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার মানুষকে এক অনন্য স্তরে উন্নীত করেছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে উচ্চতর মর্যাদায়। প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে এর মাধ্যমেই মানুষ অন্য যে কোনো প্রাণী থেকে নিজের অস্তিত্ব ও জীবিকার নিরাপত্তা অতুলনীয়ভাবে নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এর অপর একটি দিক হলো মানুষের চিন্তার, চাওয়া-পাওয়ার স্বাতন্ত্র্য। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের এই ক্ষমতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার পরিবেশ বিপর্যয়ের মাধ্যমে মানুষের জীবনে এখন এমন এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, যা তার অস্তিত্বের পক্ষেই হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার তুলনায় পুঁজিবাদ নিঃসন্দেহে অনেক বেশি অগ্রসর ও গতিশীল। উৎপাদিকা শক্তির বিপুল বিকাশ পুঁজিবাদের অধীনেই সম্ভব হয়েছে। কার্ল মার্কস নিজেও পুঁজিবাদের সাফল্যে চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং *কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে* এ সাফল্যের উচ্ছ্বসিত বিবরণও দিয়েছেন। পুঁজিবাদের এই গতিশীলতা এখনও অব্যাহত রয়েছে।[৯৫] পুঁজিবাদের সাফল্যের আরেক পিঠ হলো বিশ্ব পরিবেশ সংকট। অভাবনীয় প্রযুক্তিগত বিকাশ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পুঁজিবাদ বিশ্ব পরিবেশের সংকট ডেকে এনেছে।[৯৬] জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে সংকট আজ বিশ্ববাসী মোকাবিলা করছে তা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক চিন্তাধারারই ফসল। বিপুল পরিমাণে উৎপাদনমুখী পুঁজিবাদী চিন্তাধারা নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ ধ্বংস করেছে, বিশ্ব পরিবেশকে সংকটাপন্ন করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনশীলতা ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়ার অপর পিঠ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষিত হচ্ছে। অবশ্য প্রযুক্তির বিকাশের ফলে সম্পদের আরও উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রযুক্তি বিকাশের

---

[৯৫] নজরুল ইসলাম, 'পুঁজিবাদের পর কী' *সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ গবেষণা কেন্দ্র, সংখ্যা-৮, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৯৫।

[৯৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮।

ফলে নতুন সম্পদ আবিষ্কার ও আহরণের এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও সাধারণভাবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পুনরুৎপাদনের সুযোগ না দিয়ে, বিপুল হারে আহরণের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্পদ নিঃশেষিত হচ্ছে। বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ছাড়াও পুঁজিবাদী নিঃশেষণের শিকার হচ্ছে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বনভূমি, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বায়ুমন্ডল ও সুপেয় পানির উৎস। শক্তি ও সামর্থ্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক পরীক্ষা ছাড়াও ভূগর্ভে যে সব পারমাণবিক পরীক্ষা চলছে তার পরিণামও খুব ভয়াবহ। প্রাকৃতিক পরিবেশের ধ্বংস পুঁজিবাদের একটা অবিচ্ছেদ্য নীতিতে পরিণত হয়েছে।[৯৭] পরিবেশ ধ্বংস করে পুঁজিবাদীরা তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর অনেক স্থানে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সংকট দেখা দিয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষণই এক্ষেত্রে একমাত্র সমস্যা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে বর্জের সমস্যা।[৯৮] উৎপাদন ও ভোগ উভয়ই বর্জ্যের সৃষ্টি করে। ধরিত্রীকে একদিকে যেমন মানব প্রজাতিকে সম্পদ সরবরাহ করতে হয়, তেমনি মানব প্রজাতির উৎপাদন এবং ভোগের কারণে যে বর্জ্যের সৃষ্টি হয়, তা গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে হয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উৎপাদনশীলতা এই বর্জ্যের পরিমাণ ধরিত্রীর গ্রহণ ও সহন ক্ষমতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর বড় উদাহরণ হলো বায়ুতে উদগীরিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাস। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে কাজে লাগিয়ে পুঁজিপতিরা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে ঠিকই, কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিন্দুমাত্র খরচ করতে তারা নারাজ। তাতে প্রকৃতির যত ক্ষতি হয় হোক, সে নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ তাদের চাই শুধু সর্বোচ্চ পরিমাণে মুনাফা বা পুঁজি বৃদ্ধি। এজন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পিছে কোনো খরচ না করে তারা তা প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বিশ্ব পরিবেশকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। আসলে মুনাফার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের বাধাবন্ধনহীন ব্যবহার হলো পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া জীবনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক। ঠিক এ কারণেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে কোনো প্রকৃত পদক্ষেপে নেওয়া সম্ভব নয়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনশীলতার ক্রমাগত বৃদ্ধি। মুনাফা বৃদ্ধির তাড়না থেকেই এটা ঘটে। মুনাফা বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো শ্রম শোষণের মতো নানাবিধ উপায়ে সাশ্রয় এবং সাশ্রয়ী প্রযুক্তির উদ্ভাবন। মোট উৎপাদন বৃদ্ধি তথা সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন ছাড়া মুনাফা বৃদ্ধির বিদ্যমান ধারা বজায় রাখা সম্ভব নয়। বস্তুত মুনাফার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতায়

[৯৭] বদরুদ্দীন উমর, *সাম্রাজ্যবাদের নোতুন বিশ্ব ব্যবস্থা*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫, পৃ. ১১।

[৯৮] নজরুল ইসলাম, 'পুঁজিবাদের পর কী' *সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ গবেষণা কেন্দ্র, সংখ্যা-৮, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৭৯।

সফল হওয়ার জন্য পুঁজিপতিদের নিরন্তর উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকতে হয়, পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করার সময় তারা পায় না। সমাজের ওপর অর্থনীতির এই প্রভুত্বের কারণেই বিশ্ব পরিবেশ সংকট মোকাবিলা কঠিন হচ্ছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহ মুনাফার তাড়নায় পরিবেশের ওপর তাদের তৎপরতার নেতিবাচক অভিঘাতকে আমলে নিতে আগ্রহী নয়। যেহেতু এসব কোম্পানির মালিকেরা, তথা পুঁজিপতি শ্রেণি, নিজ নিজ দেশের রাজনীতিও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে, সেহেতু তারা এসব দেশের জাতীয় পরিবেশ নীতিমালাকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করে। এ কারণে দেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংকটের অন্যান্য বিভিন্ন দিক মোকাবিলার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে কোনো সফলতা দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে গোটা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে মানব সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনবে সে দিন আর বেশি দূরে নয়।

১৭. পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হলো একচেটিয়া ব্যবস্থা, অর্থাৎ পুঁজিবাদী একচেটিয়া ব্যবস্থা। এটি এমন এক একচেটিয়া ব্যবস্থা যার বিকাশ এবং অস্তিত্ব পুঁজিবাদ, পণ্য-উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার সাধারণ পরিবেশের মধ্যে। পুঁজিবাদের যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো যখন প্রত্যক্ষভাবে সমাজে ক্রিয়াশীল হয় আর তা পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া করতে থাকে তখনই সাম্রাজ্যবাদী চেতনার জন্ম হয়। পুঁজিবাদের বিকাশের ধারার একটি নির্দিষ্ট স্তরে যখন তার মূল বিষয়াবলির অবস্থান পাকাপোক্ত হয়, তখন উন্নততর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে উত্তরণের ও আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে পুঁজিবাদ রূপ পরিগ্রহ করে সাম্রাজ্যবাদের। অর্থাৎ পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তরই হলো সাম্রাজ্যবাদ।[৯৯] অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রতিক্রিয়ার প্রধান ঘটনাটি হলো পুঁজিবাদী অবাধ প্রতিযোগিতার বদলে পুঁজিবাদী একচেটিয়াবাদের প্রতিষ্ঠা। সাধারণভাবে পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদনের মূলগত বৈশিষ্ট্য হলো অবাধ প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতার এক পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পের জায়গায় বৃহদাকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা, শিল্পসমূহের সিন্ডিকেট গড়ে ওঠা এবং উৎপাদন ও মূলধনের কেন্দ্রীভবন পুঁজিবাদী অবাধ প্রতিযোগিতার স্তরকে অতিক্রম করে রূপান্তরিত হয়েছে একচেটিয়া ব্যবস্থায়। অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে উৎপন্ন এই একচেটিয়া কারবার অবাধ প্রতিযোগিতাকে উৎখাত করে না দিয়ে তার ওপরেই এবং তার পাশাপাশিই অবস্থান করে। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াতন্ত্র হলো পুঁজিতন্ত্র থেকে উন্নততর এক তন্ত্রে উৎক্রান্তি।[১০০]

---

[৯৯] ভি. আই. লেনিন, *সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়*, (অনু.) প্রভাত পট্টনায়ক, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২, পৃ. ৮২।

[১০০] *প্রাগুক্ত*।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দুর্বল ও দরিদ্র দেশগুলোকে ধনী ও শক্তিশালী দেশগুলো কীভাবে শাসন ও শোষণ করেছে সেই সম্পর্ক বোঝাতে সাম্রাজ্যবাদ ধারণাটি দানা বেঁধে ওঠে। উভয়ের মধ্যে শোষণ ও পরাধীনতার রাজনৈতিক বা ক্ষমতার সম্পর্ক বিচারই সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত ধারণার সমার্থক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ দুর্বল ও দরিদ্র দেশগুলো ধনী ও শক্তিশালী দেশগুলোর নীতির কারণে কীভাবে শোষিত হয়, পরাধীন হয়ে থাকে সেটাই হলো সাম্রাজ্যবাদ। বামপন্থীদের মধ্যে যারা এইভাবে সাম্রাজ্যবাদকে বোঝেন তারা তাদের যুক্তিকে গ্রহণীয় করার জন্য প্রায়ই মার্কস ও লেলিনের বরাত দিয়ে থাকেন। অতি প্রচলিত এ ধারণার সমর্থকদের মধ্যে কাউৎস্কির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। কাউৎস্কির মতো যারা এই ধারণার সমর্থক ছিলেন তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যই লেনিন *সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়* গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ লেনিন সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত প্রচলিত সেই ধারণা এবং সেই ধারণা থেকে জাত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। লেনিন বলেন, কাউৎস্কি সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতিকে তার অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছিলেন বলেই এমন মনে করতেন।[১০১]

মার্কস 'পুঁজি'র ধারণার বাইরে আলাদা করে সাম্রাজ্যবাদ নামক ধারণা বা পরিভাষা ব্যবহার করেননি। তিনি সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে পুঁজির আলাদা কোনো পর্যায় সম্পর্কে আমাদের বলেন নি। তিনি যে কথাটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তা হলো-পুঁজি মাত্রই বিশ্ব ঐতিহাসিক। সারা দুনিয়া, সব কিছুই, মানুষ ও প্রকৃতির সকল সম্পর্কই পুঁজি ও পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের অধীন।[১০২] পুঁজির ধারণার মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের ধারণা, অর্থাৎ আত্মস্ফীতি ও পুঞ্জিভবনের ধারণা নিহিত। পুঁজির অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির ধারা লক্ষ্য করলেই তার সাম্রাজ্যবাদী ধারণা উপলব্ধি করা যায়। প্রাক পুঁজিতান্ত্রিক দেশে পুঁজির বিস্তার মানে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের বিস্তার এবং প্রাচীন উৎপাদন সম্পর্কের তুলনায় সেটা নিশ্চয়ই ইতিবাচক। এ বিষয়ে লেনিন বলেছেন, "যেসব দেশে পুঁজি রপ্তানি করা হয় সেই সব দেশে পুঁজির বিকাশ দারুন বেগবান হয়ে ওঠে। পুঁজি রপ্তানির ফলে পুঁজি রপ্তানিকারক দেশগুলোর বিকাশ যদি বা কিছুটা স্তিমিত হয়, তবে সেটা ঘটে সারা দুনিয়ার পুঁজির বিকাশ আরো বিস্তার ও গভীর করবার দরকারে।"[১০৩]

---

[১০১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬।

[১০২] ফরহাদ মজহার, *সাম্রাজ্যবাদ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, মার্চ ২০১০, পৃ. ৩৩।

[১০৩] V. I. Lenin, *Imperialism the Highest Stage of Capitalism,* Peking: Foreign Language Press, 1975, p. 76.

পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উপলব্ধি করতে হলে পুঁজির স্বরূপ বোঝা খুবই জরুরী। এক্ষত্রে পুঁজির স্বরূপের তিনটা দিক আমাদের বিশেষভাবে বোঝা দরকার–পুঞ্জিভবন, আত্মস্ফীতি এবং বিস্তার। কিন্তু শুধু পুঁজির স্বভাব বিচার করে সাম্রাজ্যবাদ বুঝতে গেলে তার বাস্তবতা বোঝা যায় না। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় বলেছেন। কাজেই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ বোঝার জন্য পুঁজির ইতিহাসকে পর্যায় হিসেবে অনুধাবন করা জরুরী। মার্কসীয় পুঁজির ব্যাখ্যায় আমরা দেখেছি পুঁজির একটা প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর্যায় আছে। একটা পর্যায়ে পুঁজির মধ্যে মনোপলি বা একচেটিয়া হয়ে ওঠার প্রবণতা অনিবার্যভাবেই দেখা যায়। একচেটিয়া পুঁজিবাদ পুঁজির স্বভাবের একটি অন্তর্নিহিত প্রবণতা। লেনিন পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় বলতে পুঁজির এই একচেটিয়া স্বভাবের দিকটিকেই নির্দেশ করেছেন। তিনি পুঁজি সম্পর্কে নিছক কোনো তত্ত্বকথা না বলে তাঁর আমলে পুঁজির মূর্ত রূপটা কেমন ছিল, সে বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি পুঁজির বিভিন্ন পর্যায় নির্ধারণ করে কোন পর্বে পুঁজি কী রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে পুঁজির চরিত্র সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করার চেষ্টা করেন। একচেটিয়া পুঁজিবাদ যে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় তা পুঁজির চরিত্রের বিশ্লেষণ থেকেই যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। একচেটিয়া পুঁজিবাদ মানে পুঁজিতে পুঁজিতে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও প্রতিযোগিতার বিলোপ নয়, বরং প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা। সুতরাং পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ যে দিকটি নির্দেশ করে তা হলো পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশ।

১৮. পুঁজিবাদী শোষণ

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একদিকে দরিদ্র শ্রেণির জনগণকে ক্রমেই নিঃস্বতর করা হয়, অন্যদিকে শোষকদের ক্ষুদ্র একটা শক্তিধর বা একচেটিয়া গোষ্ঠী স্বগোত্রের অন্যদের প্রতিযোগিতা থেকে হটিয়ে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে চলে। এই শোষকদের রক্ষার জন্য আছে শাসকগোষ্ঠী যারা ছলে-বলে-কৌশলে দেশ শাসন করে। এই শাসকেরা সবসময় দেখাতে চায় ধনী-দরিদ্র তাদের কাছে সমান, তারা নিরপেক্ষ। শ্রমিক শ্রেণির জন্য তাদের মুখ থেকে সবসময় আশ্বাসবাণী নিঃসৃত হয়। কিন্তু বাস্তবত গোটা শাসনক্ষমতা ও রাষ্ট্রযন্ত্র কাজে লাগিয়ে পুঁজিপতিদের সাহায্য করে। অতীতে ধনিক-বণিকরা আবিষ্কার ও ব্যবসার নামে দেশে দেশে অর্থনৈতিক লুটতরাজ চালিয়েছে। তাতে ছিল শাসকগোষ্ঠীর আশীর্বাদ ও সহায়তা। পরবর্তীকালে তারা কয়েক শতক ধরে পরদেশ শাসন-শোষণ করেছে। উনিশ শতকের শেষে পুঁজিবাদের যখন রমরমা বিকাশ ঘটেছে, সেই চূড়ান্ত স্তরে ক্ষুদ্র কর্তৃত্বকারী গোষ্ঠী বা একচেটিয়া

পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলোই বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলোর পরিচালকমন্ডলী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজিপতিরা গোষ্ঠী গড়ে তোলে। এই শাষক-শোষক গোষ্ঠীগুলো অন্য দুর্বল দেশগুলোর ওপর লুঠপাট, আগ্রাসন নতুন নতুন মাত্রায় বাড়িয়ে তোলে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চলে নিজস্ব অর্থনৈতিক সূত্রের গতিধারায়। পুঁজিবাদ এর বাইরে টিকতে পারে না। পুঁজিবাদের উদ্ভবের সময় থেকেই পুঁজিপতিদের মধ্যে তাদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে একটা স্বাধীন প্রতিযোগিতা ছিল। এই প্রতিযোগিতার কারণে তারা যথেচ্ছভাবে কোনো সামগ্রীর দাম বাড়াতে পারে না, অন্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপও করতে পারে না। কিন্তু একেকটা শিল্পে কয়েকজন পুঁজিপতি মিলে গোষ্ঠী তৈরি করে উনিশ শতকের শেষদিকে। শিল্পোৎপাদনের একটা বড় অংশ গুটিকতক বৃহৎ কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যায়। ছোটো ও মাঝারি শিল্প-কারখানা ও সংস্থাগুলো এই বৃহৎ কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের সামনে টিকে থাকতে পারে না। এই বৃহৎ কারখানায় উৎপাদনের উপায় ও পুঁজি পুঞ্জীভূত করা হয়। এই পুঞ্জীভূতকরণ উচ্চ মাত্রায় পৌঁছালে একচেটিয়াত্বের উদ্ভব ও প্রসার ঘটে। অর্থাৎ বাজারের ওপর যৌথ শোষণের জন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা জোট বাঁধে, প্রতিষ্ঠা করে একচেটিয়ার আধিপত্য। অনেক ধরনের একচেটিয়া সংগঠন, প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, তাদের মধ্যে চুক্তির মেয়াদও কমবেশি হতে পারে। কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে একই। আর তা হলো উৎপাদন, ব্যবসা ও বাজার দখল এবং সেই দখলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মুনাফা লুটে নেওয়া।

পুঁজিবাদের চরিত্র একচেটিয়া রূপ ধারন করলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো গোটা পৃথিবীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থনীতিকেন্দ্রিক এই ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়েই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে, বিশ্বকর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ বাধে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে, যার পরিণতিতে সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইতালিতে পুঁজিবাদের ভিতের ওপর মাথা তোলে বর্বরতম ফ্যাসিবাদ। এছাড়া গত একশ বছর ধরে পুঁজিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ তাদের বিরোধ, সংকট এবং প্রতিযোগিতার মীমাংসা করতে গিয়ে পৃথিবীজুড়ে আগ্রাসন, যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, এক দেশের সাথে অন্য দেশের বিরোধ জিইয়ে রেখেছে, একই দেশের অভ্যন্তরে নানা ঐক্যভঙ্গকারী শক্তিকে মদদ জুগিয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আগের মতো আর পরাধীন দেশ নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সারা পৃথিবীজুড়েই চলছে। সাম্রাজ্যবাদীরা নানা চাপ ও নানা কায়দায় দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোকে নির্ভরশীল করে তুলেছে। এসব দেশগুলো এখন হাড়েহাড়েই টের পাচ্ছে পুঁজিবাদী শোষণের এবং সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের আসল চেহারা। সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর এসব দেশের শাসকগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা এবং সাম্রাজ্যবাদী চাপের কাছে নতিস্বীকারের বিষয়টি এখন আর গোপন নেই। তার পরিণামে সব রকমের শোষণে পিষ্ট হচ্ছে সাধারণ মানুষ। কেবল একটানা শোষণ-নিপীড়ন নয়, পুঁজিবাদ পৃথিবীকে দিয়েছে ধ্বংস, যুদ্ধ, মহামন্দা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ফ্যাসিবাদ, নৃশংস হত্যাকান্ড ও বর্বরতা। পুঁজিবাদী আদর্শ বিশ্বমানবতার আদর্শের বিরোধী হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা আজ সহজেই প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ পরিষ্কার বুঝতে পারি। কিন্তু হালের শোষণ সহজে বুঝে উঠতে পারি না। এর কারণ হলো ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও কৃষকদের উপরে শোষণটা ছিল খোলাখুলি। দাস সমাজে দাসরাই প্রত্যক্ষ উৎপাদক হলেও তারা ছিল দাস মালিকদের সম্পত্তি, যেমন উৎপাদনের উপকরণগুলো ছিল এসব দাসমালিকদের বা শোষকদের সম্পত্তি। কিন্তু পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশের ফলে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির ওপর শোষণের মাত্রা ধীরে ধীরে অন্য রূপ পরিগ্রহ করে। পুঁজিপতিরা অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে শ্রমিকের শ্রম শোষণ করে, অথচ আপাতদৃষ্টিতে তা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।

পুঁজিবাদে আনুষ্ঠানিক বা কেতাবি অর্থে শ্রমিকেরা স্বাধীন। কোন মালিকের কাছে সে শোষিত হবে, কেবল সেটা ঠিক করার স্বাধীনতাটুকুই তার আছে। শ্রমিকদের হাতে উৎপাদনের উপকরণও নেই, জীবনধারণের কোনো উপায়ও নেই। এগুলোতে একচেটিয়া মালিকানা ও অধিকার পুঁজিপতিদের। শ্রমিকেরা শরীর নিংড়ে শ্রম দিয়ে পণ্য উৎপাদন করে মালিকদের মুনাফার জন্য। পুঁজিপতিরা সেসব জিনিসের ওপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সব শ্রেণির জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যারা সরাসরি শ্রমিক নয় অথচ জীবন-জীবিকার জন্য নানা পেশায় শ্রমসাধ্য কাজ করে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তারাও ভুক্তভোগী। কারণ গোটা সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিপতি শ্রেণিই। শ্রমজীবীদের পুরো শ্রেণিটাই পুঁজিপতি শ্রেণির কাছে শোষিত ও নির্যাতিত হয়। মজুরদের ওপর সামগ্রিক পুঁজিবাদের শোষণ অতীতের মতো অতটা খোলাখুলি নয়। আসলে তা আরও নৃশংস, কিন্তু ছদ্মবেশী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, একজন লোক নিজের খুশিমতো স্বাধীনভাবে এক কারখানা ছেড়ে অন্য কারখানায় বা এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজে স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারে। বিশেষ কোনো পুঁজিপতির

কাছে সে বাঁধা না থাকলেও গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পুঁজিপতি শ্রেণির কাছে সে যে বাঁধা, তা শেকলহীন হলেও শেকলের চেয়ে শক্ত বাঁধনের অর্থাৎ তারা মজুরি দাসত্বের শক্ত বাঁধনে অবরুদ্ধ।

পুঁজিপতির সম্পত্তি ও মুনাফা বাড়ে মূলত শ্রমিকদের শোষণ করে। দেশের যাবতীয় সম্পদ এবং সমাজের সব শ্রমজীবীদেরও তারা শোষণ করে। সমাজের কোনো অংশের মানুষই তাদের শোষণ থেকে নিষ্কৃতি পায় না। শ্রমজীবীরা বংশপরম্পরায় কষ্টকর কাজ করেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পায় না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যাঁতাকলেই তাদের চিরন্তন দীন অবস্থা। নানা পেশা ও জীবিকার মানুষ পুঁজিবাদের সুউচ্চ ঐশ্বর্য দেখে, তার সরাসরি শোষণ প্রত্যক্ষ করে, শোষণের শিকার হয়, কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণ পায় না। তারা যেমন পুঁজিবাদী শোষণে শোষিত, তেমনি সামাজিক শোষণেও শোষিত। পুঁজিপতি শ্রেণি ব্যতীত গোটা সমাজের মানুষ কোনো না কোনোভাবে পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ ব্যবস্থায় শোষিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। দেশে দেশে সরকার বদল হয়, রাষ্ট্রের শাসক বদল হয়, শাসনকর্তা বদল হয় কিন্তু পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জনগণের ঘাড়ের ওপর চেপেই রয়েছে।

১৯. মানবিক স্বাধীনতা ও পুঁজিবাদ

প্রাকৃতিক জগতের বিষয়াবলি যে আবশ্যিক নিয়মসমূহের দ্বারা পরিচালিত হয় সেগুলো আয়ত্ব করতে না পারলে মানুষ সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না বা মানবিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। এঙ্গেলস মনে করেন, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের মাধ্যমে এই নিয়মানুবর্তিতাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করার যে ক্ষমতা মানুষের আছে তার মধ্যেই মানুষের স্বাধীনতা নিহিত।[১০৪] তাঁর মতে, যে সমাজে কোনো শ্রেণি বৈষম্য থাকবে না, ব্যক্তির ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না, কেবলমাত্র সেই সমাজেই যথার্থ অর্থে মানবিক স্বাধীনতার চিন্তা করা সম্ভব।[১০৫] এমন সমাজে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার সাথে সঙ্গতি বিধান করেই মানুষের পক্ষে জীবন যাপন করা সম্ভব। মার্কস কেবল প্রকৃতির অমোঘ নিয়মাবলি ও প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জনকেই স্বাধীনতা হিসেবে দেখেননি। সামাজিক বিষয়াবলির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথাও তিনি ভাবেন। তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে মানবিক স্বাধীনতা অর্জনের কথাও বলেন।[১০৬]

---

[১০৪] Engles F. *Anti Duhring*, Peking: Foreign Language Press, 1976, p. 142.
[১০৫] *Ibid*, p. 143.
[১০৬] আখতার সোবহান খান, *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ১৫৭।

মানুষ যখন তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে পারে এবং কোনো রকমের বাধার সম্মুখীন না হয়েই তা অর্জন করতে পারে সেই অবস্থাটাই হলো স্বাধীনতা। মার্কস স্বাধীনতাকে একটা নৈতিক বিষয় হিসেবে দেখেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনা করার ক্ষেত্রে মার্কসের মধ্যে স্বাধীনতার নৈতিক বোধ ক্রিয়াশীল ছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজের ওপর পুঁজির সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ, মানুষের ওপর পুঁজিপতির কর্তৃত্ব, শ্রমবিভাজন, ব্যক্তির আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, জবরদস্তিমূলক শ্রম ইত্যাদি কারণে মার্কস স্বাধীনতার নৈতিক মূল্যবোধ থেকে পুঁজিবাদের সমালোচনা করেন। জর্জ ব্রেনকার্ট মনে করেন, মার্কসবাদের মধ্যে একটা মানবিক স্বাধীনতার মূল্যবোধ রয়েছে এবং মার্কস ও এঙ্গেলস স্বাধীনতার ধারণা থেকে পুঁজিবাদকে নৈতিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ক মার্কসের সমালোচনা স্বাধীনতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১০৭] পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের স্বাধীনতা খর্ব হয় বিধায় মার্কস ও এঙ্গেলস মানবিক স্বাধীনতার নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে পুঁজিবাদের সমালোচনা করে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষ পুঁজির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে। পুঁজি সংগ্রহ ও পুঁজি বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মধ্যে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। শ্রমিক শ্রেণি পরিণত হয় পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা বৃদ্ধির হাতিয়ারে। ফলে শ্রমিকের স্বাধীনতা বিসর্জিত হয়। মার্কস পুঁজিবাদের বিপরীতে কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন। তিনি মনে করেন, এর আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভব কেবলমাত্র শ্রেণি-বিভাজনের ধারণার বিলোপ এবং সম্প্রদায়গত সম্মিলনের মাধ্যমে। ব্যক্তি মানুষ থেকে স্বাধীন কোনোকিছুর অস্তিত্ব যদি না থাকে তবেই মানুষ সকল বিষয়গত শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হয়ে উঠবে এবং এগুলোর ওপর প্রভূত্ব করার ক্ষমতা অর্জন করবে।[১০৮] মার্কস মনে করেন, প্রযুক্তি হলো প্রকৃতির ওপর মানুষের বিজয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষ প্রযুক্তির দাসে পরিণত হয়। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ওপর মানুষের জয়ের হাতিয়ার হিসেবে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা না গেলে এবং প্রযুক্তি তথা যন্ত্রকে মানব অঙ্গের ন্যায় ব্যবহার করতে পারলে মানুষ তার স্বাধীনতা হারাবে না, বরং মুক্ত হবে যন্ত্রের দাসত্ব থেকে।[১০৯]

---

[১০৭] Brenkert, George G. 'Freedom and Private Property in Marx', *Marx, Justice and History*, Princeton: Princeton University Presss, 1980, p. 81.

[১০৮] Karl Marx & Frederick Engels, *The German Ideology*, Part-1, Moscow: Progress Publishers, 1976, P. 82.

[১০৯] Karl Marx, *Capital*, (ed.) F. Engels, (tr.) Samuel Moore & Edward Aveling, Vol.-6, Moscow: Progress Publishers, 1984, P. 538.

মার্কস মনে করেন, প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ অপার সম্ভাবনাময় জীব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শ্রমবিভাজন নীতি মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে এবং তার সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে। শ্রম বিভাজনের ফলে একজন শ্রমিক এক একটি আংশিক ক্রিয়ায় সারা জীবনব্যাপী কাজ করে। ফলে মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া তার স্বকীয়তা হারায়। মার্কসের মতে, সমাজে ব্যক্তির কাজ কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ থাকবে না, তার মেধা ও মননশীলতা কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকবে না। ব্যক্তি তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো শাখায় কুশলী হয়ে উঠবে। মার্কস অপার সম্ভাবনাময়, সামগ্রিক কর্মক্ষমতাসম্পন্ন, বহুমুখী বিকাশসমৃদ্ধ ও স্বাধীন মানুষের কথা ভাবেন। শ্রম বিভাজনের ফলে সৃষ্ট আংশিক দক্ষতাসম্পন্ন, যন্ত্রের দাস, একপেশে ও স্বাধীনতাহীন মানুষের ধারণাকে তিনি মানবিক স্বাধীনতার নৈতিক মূল্যবোধ থেকে প্রত্যাখ্যান করেন। এ কারণেই তিনি মনে করেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্বাধীন ও পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন মানুষের উত্থান শ্রম-বিভাজনের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয়। জীবনব্যাপী একই ধরনের ক্রিয়া সম্পাদনের ফলে মানুষের সামগ্রিক বিকাশের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়।[১১০]

মার্কস ও এঙ্গেলস মনে করেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মজুরি-শ্রম প্রথাটি অপ্রত্যক্ষ জবরদস্তিমূলক শ্রম। এক্ষেত্রে শ্রমিক বাধ্য হয় তার শ্রমশক্তি বিক্রি করতে। জবরদস্তিমূলক শ্রমের ব্যাখ্যায় মার্কস বলেন, ব্যক্তির উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ওপর যদি তার অধিকার না থাকে বা সে যদি উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে সেটা হয় জবরদস্তিমূলক ক্রিয়া। শ্রমিক তার শ্রমের ফসল থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে সে নিজেকে ও নিজের ক্রিয়াকে স্বাধীনতাহীন অবস্থার মধ্যে দেখে। মার্কস মজুরি-শ্রমকে ক্রীতদাস ব্যবস্থা থেকে পৃথক বলেন এই অর্থে যে মজুরি শ্রমে শ্রমিক শ্রম শক্তির বিক্রেতা ও পুঁজিপতি ক্রেতা হিসেবে আইনের চোখে দুজনই সমান। সমান অধিকারের ভিত্তিতে তারা শ্রমশক্তি কেনাবেচা করে। শ্রমিক তার শ্রমশক্তি চিরস্থায়ীভাবে বিক্রি করে না, বিক্রি করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু ক্রীতদাস বিক্রি হয় চিরকালের জন্য। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মজুরি শ্রমিক স্বাধীন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি না করে পারে না। মার্কস মনে করেন, এক্ষেত্রে শ্রমিক স্বাধীন এই অর্থে যে, শ্রমিক স্বাধীন মানুষ রূপে স্বকীয় পণ্য হিসেবে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে পারে। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের স্বাধীনতা হলো কেবল বাজারে শ্রমশক্তির ক্রেতা বদলের স্বাধীনতা, যা স্বাধীনতার একটি বাহ্য রূপ। প্রকৃত অর্থে তারা স্বাধীন নয়। স্বাধীনতার

[১১০] *Ibid,* P. 435.

বাহ্যরূপটা বজায় রাখা হয় ক্রমাগত মালিক পরিবর্তনের সাহায্যে। এক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে শ্রম এবং অর্থের বিনিময় হয় কল্পিত একটি চুক্তির মাধ্যমে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিরাজমান স্বাধীনতাহীনতার বিপরীতে মার্কস মনে করেন, সমাজীকৃত মানুষের মধ্যেই স্বাধীনতা বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে।

মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা হলো অপরাপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা যা মানবিক ঐক্যের ধারণার বিরোধী। পুঁজিবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যবহারিক প্রয়োগ হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির স্বাধীনতা। মার্কসের মতে, এটা হলো স্বার্থপরতার স্বাধীনতা। পুঁজিবাদে মানুষ অন্য মানুষকে তার স্বার্থপর স্বাধীনতা চরিতার্থ করার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। কাজেই মার্কস স্বাধীনতা বলতে প্রধানত অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত বাস্তব ও ব্যবহারিক স্বাধীনতার কথা বলেন। তাঁর মতে, স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব একটা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান বাস্তব অর্থনৈতিক সম্পর্ককে উচ্ছেদ করে। এভাবেই শ্রেণি সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী বিদ্যমান শোষণমূলক উৎপাদন সম্পর্কের অবসানের সংগ্রামই হলো মানবিক স্বাধীনতার সংগ্রাম।

পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের ফলে উদ্ভূত সব ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্তিকেই মার্কস মানবিক স্বাধীনতা হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানের মধ্য দিয়ে মানবীয় অনুভূতি ও গুণের পরিপূর্ণ মানবিক মুক্তি ঘটবে। তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে শ্রমের মানবিক মুক্তির বিষয়টি ভাবেন। ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজে একদিকে যেখানে অধিকাংশই সম্পত্তিহীন মানুষে পরিণত হয়, অপরদিকে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষ গোটা সম্পত্তির মালিক হয়। মানুষের শ্রম পরিণত হয় পুঁজি, মুদ্রা ও খাজনায়। তিনি এ থেকে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজের অবসানের মধ্য দিয়ে মানবিক শ্রমের স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলেন। পুঁজির শোষণ ও শৃঙ্খল থেকে শ্রমের মুক্তিকে তিনি মানবিক স্বাধীনতার প্রধান দিক হিসেবে বিবেচনা করেন। মার্কস মনে করেন, পুঁজির বিনিময়ে অপরের শ্রম ক্রয় করার যে ক্ষমতা পুঁজিপতিরা অর্জন করেছে, কমিউনিজমের পর্যায়ে তার অবসান ঘটবে এবং এতে করে মানবিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে।[১১১]

[১১১] কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইসতেহার', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ৪১।

মার্কস মজুরি প্রথার চূড়ান্ত অবসানের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণির স্বাধীনতার কথা ভাবেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আনুসঙ্গিক ফলাফলের চেয়ে মূল বিষয় হিসেবে মজুরি প্রথা বা দাসত্বের মূল কারণ যেসব বিষয়াবলি সেগুলোর অবসানের মধ্যেই তিনি স্বাধীনতার বিষয়টি দেখেন।[১১২] এঙ্গেলস মনে করেন, প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি মালিকানা ও শ্রেণি পার্থক্যের অবসানের মধ্য দিয়েই প্রলেতারিয়েতরা স্বাধীন হয়। তিনি পুঁজিবাদে মানুষকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করার সমালোচনা করেন। পুঁজিবাদের বিলোপ হলে মানুষ তার চাহিদা পূরণের জন্য অন্য মানুষকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করবে না। ফলে পুঁজিবাদী সমাজের প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপায় এই ধারণার অবসান হবে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনভাবে অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ ও সক্ষমতার প্রয়োগ সম্ভব হবে। এ থেকে বলা যায় যে, ব্যক্তির স্বাধীন ও অন্তর্গত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ এবং ব্যক্তির সমস্ত ক্ষমতা ও সামর্থ্য প্রয়োগের সামাজিক পরিবেশই হলো মার্কস ও এঙ্গেলসের কাছে মানবিক স্বাধীনতা।

লেনিন স্পষ্টভাবেই মানবিক স্বাধীনতার নৈতিক দিকের কথা ঘোষণা করেন। এক্ষেত্রে তিনি মানব সমাজ বহির্ভূত ঐশ্বরিক নৈতিকতা ও শ্রেণি সমাজে শ্রেণি বহির্ভূত শাশ্বত নৈতিকতার ধারণাকে পুঁজিপতি ও সামন্ত শ্রেণি কর্তৃক শ্রমিকদের মন আচ্ছন্ন করার কূটকৌশল হিসেবে দেখেন। লেনিন মনে করেন, আমাদের সার্বজনীন স্বাধীনতা পুরোপুরিভাবে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণি সংগ্রামের স্বার্থাধীন। আমাদের স্বাধীনতা আসে প্রলেতারীয় শ্রেণি সংগ্রামের স্বার্থ থেকে। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণি স্বার্থ হলো পুঁজির শোষণ ও শাসন থেকে মুক্তি। এদিক থেকে প্রলেতারীয় স্বাধীনতা হলো পুঁজির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত মানবিক স্বাধীনতা। লেনিন বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিদ্যমান স্বাধীনতার ধারণায় আমাদের বিশ্বাস নেই কেননা, এক্ষেত্রে বিদ্যমান ধারণা আষাঢ়ে গল্পের বুজরুকি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি মনে করেন, মানব সমাজকে উচ্চতর স্তরে উন্নয়ন ও শ্রম-শোষণ থেকে অব্যাহতির ফলস্বরূপ অর্জিত হয় স্বাধীনতা।[১১৩]

সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তিজনিত শ্রম সম্পর্ক থেকে সমাজের মুক্তি অর্জন করতে হলে তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্ক থেকে মুক্ত হতে হবে। এ মুক্তি বা স্বাধীনতা কেবল শ্রমিক শ্রেণির স্বাধীনতা নয়, এ স্বাধীনতাকে একটা সার্বজনীনতার মধ্যে দেখা যায়। এটা হলো শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির সাথে সাথে সার্বিক মানবিক মুক্তি। পুঁজিবাদের অবসান হলে মানবিক স্বাধীনতার এমন এক ঐতিহাসিক অগ্রগতি সাধিত হবে যেখানে মানুষ তার নিজের মধ্যে নিজকে পুনর্স্থাপিত করতে পারবে।

---

[১১২] কার্ল মার্কস, 'মজুরি দাম মুনাফা', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ১১।

[১১৩] ভ. ই. লেনিন, 'যুব লীগের কর্তব্য' *ভ. ই. লেনিন রচনা সংকলন*, চতুর্থ ভাগ, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৪, পৃ. ১৮১।

২০. পুঁজিবাদী অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতা

একটি বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যেসব বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তা হলো: পুঁজি এবং উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা, করারোপ ও কর বিধির নিম্নমান, ভর্তুকি গ্রহণের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা, বেলআউট এবং সংরক্ষণবাদ। এর সাথে সাথে সেবা ও পণ্যের অবাধ প্রবাহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে পুঁজির অবাধ প্রবাহ। সবশেষে, এক্ষেত্রে সরকারেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্য একটি স্বাধীন এবং ফলপ্রদ বিচারমূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে যা জনজীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পদের সুরক্ষা দেবে। সাথে সাথে চৌর্যবৃত্তি এবং প্রতারণার জন্য শাস্তির বিধান থাকবে।

এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর কোথাও কখনও পরিপূর্ণ স্বাধীন অর্থনীতি ছিল না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ উভয়ক্ষেত্রেই যেসব আদর্শের কথা বলা হয়, সেগুলো বাস্তবে কখনো অস্তিত্বশীল ছিল না। অর্থাৎ কেউ সেগুলো মেনে চলে নি। প্রতিটি সরকারকেই কিছু না কিছু অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কতগুলো আপেক্ষিক স্তর নিরূপণ করা সম্ভব। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে একটি দেশ আরেকটি দেশের পিছনে কীভাবে লেগে আছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিশ্বসূচকে প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বিবেচনা করা হয় যেসব জিনিসের ভিত্তিতে সেগুলো হলো-সরকারের আকার, সরকার কীভাবে কর আদায় করে এবং তা ব্যয় করে, আইনগত প্রক্রিয়া কেমন শক্তিশালী এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্য করার স্বাধীনতা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শ্রমিক শ্রেণির ওপর সরকারি বিধিবিধানের বোঝা ইত্যাদি।

বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো কেমন মাত্রায় পুঁজিবাদী তা বোঝার জন্য দরকার সে দেশের অর্থনৈতিক বিষয়াবলিকে বিবেচনা করা। সে বিবেচনায় খুব কম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানই সরকারি এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়। ফলে এসব দেশের প্রায় সব সম্পদই বা জিডিপির অধিকাংশই ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদন করে। এটাই পুঁজিবাদী অর্থনীতি। প্রতি বছর এসব দেশের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সম্পদ উৎপাদন করে, তারা তা ব্যয় করে না। কর ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলোর মধ্যে থেকে কিছু সরকারও ব্যয় করে থাকে। সরকারি এসব ব্যয়ের মধ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি যেগুলো রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং বিচার ব্যবস্থাকে সমুন্নত

রাখার কাজে ব্যবহৃত হয় সেগুলো ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। কিন্তু কিছু বিতর্কিত বিষয় যেমন, ব্যাংকসমূহের দেউলিয়াপনায় সহায়তা প্রদান এবং সরকারি ও সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তুকি প্রদানের মতো বিষয়গুলোতে জনগণের কোনো সমর্থন থাকে না। এভাবে গণতান্ত্রিক দেশসমূহের উৎপাদন ব্যবস্থা যখন ব্যক্তিগত খাত দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় আর ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রিত হয় সরকার কর্তৃক, তখন এক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। যতদূর দেখা যায়, সরকারই হয় একমাত্র খরচকারী, অর্থাৎ একমাত্র অর্থনৈতিক কর্তা। এসব দেশের জনগণের সাধারণ জীবনযাত্রা যেমন, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে সরকারি প্রভাবাধীনে থাকে।

যেসব দেশের জিডিপি সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য অপ্রতুল, সেসব দেশের জনগণকে নানা ধরনের করের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। যেমন, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক আয়কর, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা কর, বিক্রয় ও আবগারি শুল্ক, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির কর ইত্যাদি। এসব দেশে সরকারের আদায়কৃত অর্থের পুনর্বন্টনের বিষয়টি সবসময়ই প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়। সুইজারল্যান্ড এবং ডেনমার্কের মতো যেসব দেশে জিডিপি থেকেই জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয়, সেসব দেশ বসবাসের জন্য খুব উপযোগী হয়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বিবেচনা করলে, গণতান্ত্রিক দেশসমূহে বিশেষভাবে করারোপের বিষয়টি সহজ নয় এবং জনগণের পরিশোধিত করের পরিমাণ কমও নয়। বিশ্বব্যাংকের মতানুসারে, গণতান্ত্রিক দেশসমূহে করের বোঝা অন্য অনেক দেশের চেয়েই কষ্টদায়ক এবং দুর্বহ। অর্থনৈতিক দিক থেকে আপাত স্বাধীন হংকং এবং সামাজিক গণতান্ত্রিক দেশ ডেনমার্কের বিবেচনায় তা রীতিমতো বোঝা। আবার, ব্যক্তিগত খাতসমূহের ওপর সরকারি নিয়মকানুনের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। পুঁজিবাদ সম্পর্কে বলা হয়, এটার বৈশিষ্ট্য এমন যে, এখানে নিয়মকানুনের বেড়াজাল খুব কম। গণতান্ত্রিক দেশসমূহে এসব চরম অর্থনৈতিক নিয়মকানুনের ফলে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অবশ্য অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ এগুলোর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে চলার কথা বলেন।

এভাবে পুঁজিবাদকে যদি এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেখানে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণে ব্যক্তিগত ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃথকীকরণের কথা বলা হয়, কর বিধির সহজীকরণের কথা বলা হয়, তাহলে দেখা যায় অনেক বড় বড় গণতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতিকেই পুঁজিবাদী বলা যায় না। বস্তুতপক্ষে, গণতান্ত্রিক এসব দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

যেভাবে দিন দিন কমে আসছে, তাতে বলা যায় পুঁজিবাদের দূর্গ বলে পরিচিত দেশসমূহও আস্তে আস্তে মিশ্র অর্থনীতির দেশে পরিণত হচ্ছে, যেখানে সরকার কিছুটা অনুদান দিলেও কোনো ধারাবাহিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য না রেখে ব্যাপক পরিমাণে বিধিনিষেধ আরোপ করে।

অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেন যে অবাধ বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক। বস্তুতপক্ষে, অর্থনীতিনির্ভরতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো দেশই কখনও উন্নতি করতে পারেনি। আরও দেখা যায়, পণ্য, সেবা এবং পুঁজির বিশ্বব্যাপী অবাধ প্রবাহ পুঁজিবাদের আবশ্যকীয় শর্ত। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরু থেকে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ওপর গুরুত্ব প্রদানের পুরনো ধারণাটি বিশ্বরাজনীতিতে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর মূলকথা হলো যে, আধুনিক বাজার অর্থনীতির ধারণাটি ব্যর্থ হয়েছে। এখন বিশ্বের দেশগুলোতে দেখা যায়, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সংখ্যা খুব কম এবং সেগুলোর সবই খুব বড় ধরনের। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক কণ্ঠরোধী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এর অনুসারীরা মনে করেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিরাজমান বিশ্বাসবিরোধী নীতি এবং প্রতিযোগিতামূলক নীতির বিষয়ে সরকারের কিছু করা উচিত।

পুঁজিবাদের চলমান সংকটের পিছনে মূল কারণ যে সম্পদের অসমান বন্টন, সে কথা পুঁজিবাদী বিশ্বের বামপন্থীরা অন্য সবার আগে সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু কীভাবে এর সমাধান হবে, রাজনৈতিকভাবে সে কথা নির্দেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্পের বিজয় এক নতুন ধরনের শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদের বিজয়। এর উত্থানের পেছনে ছিল একদিকে বিশ্বায়ন, অন্যদিকে অভিবাসন। এই দুই পরস্পরসম্পৃক্ত শক্তি, যার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত ও কর্মজীবী শ্বেতাঙ্গরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই মনোভাব অবশ্য কিছুটা বাস্তব, কিছুটা কল্পনা। ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই বিশ্বায়নকে গালি দিয়ে শ্বেতাঙ্গ শ্রেণির চ্যাম্পিয়ন বনে গেলেন। মজার কথা হলো, বিশ্বায়নের ফলে যুক্তরাষ্ট্রসহ সব পুঁজিবাদী দেশই ফুলেফেঁপে উঠেছে, কিন্তু লাভের অংশটা গেছে হাতে গোনা কিছু লোকের হাতে।

বামপন্থীরা স্থিতাবস্থা মেনে নিলেও ডান মহলে তত দিনে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন আন্দোলন গড়ে উঠেছে। 'আগে নিজের ঘর সামলাতে হবে' এই যুক্তি দেখিয়ে তারা নতুন এক পপুলিস্ট রাজনীতি খাড়া করে ফেলেছে। এই পপুলিজমের মোদ্দা কথা হলো, নিজের ঘরের দরজা আগে ভালো করে সাঁটো, অন্য কারও আসা আগে ঠেকাও। সস্তা শ্রমিক বা সস্তা পণ্য–কোনোটারই দরকার নেই।

নিজেরা যা পারি, উৎপাদন করব, তাতে বেকার শ্রমিকদের চাকরীর ব্যবস্থা হবে। সব বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি ঝেঁটিয়ে বিদায় করব, বিদেশি পণ্য ঠেকাতে উচ্চ হারে শুল্ক বসাব। এতদিন পুঁজিবাদের গায়ে চর্বি লেগেছে পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে। কিন্তু এই নতুন ডানপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদকে একেবারে তার মাথার ওপর ঠায় বসিয়ে দিলেন। পরিহাসের বিষয় হলো, যারা এ কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা এই ব্যবস্থাকে নিজেদের প্রয়োজনে যথেচ্ছ ব্যবহার করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন।

ডানমুখী এই পপুলিজম শুধু আমেরিকায় নয়, পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশেই এখন ঝড় তুলেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের প্রস্থান–তথাকথিত ব্রেক্সিট–এই পপুলিজমের প্রকাশ। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ও পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই সে ঝড়ের আভাস মিলেছে। শোনা গেছে, ফ্রান্সে অতি উগ্রবাদী ফ্রন্টের জয়ের সম্ভাবনার কথা। এমনকি কানাডার কনজারভেটিভ পার্টিতেও উগ্রবাদীদের গলা উঁচু করার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় বাম তাত্ত্বিকেরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু করেছেন। তাদের কেউ কেউ মনে করেন, ইউরোপীয় ডানপন্থী পপুলিস্টরা এখন যেসব শ্লোগান ব্যবহার করছেন বা যে নীতি অনুসরণ করছেন তার অধিকাংশই বামপন্থীদের আবিষ্কার। তারা ওয়াল স্ট্রিটের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন, অসমান বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন, শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় নিজের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, একসময় এসবই ছিল বামদের নিজস্ব এজেন্ডা। তাহলে তারাই বা কেন সেই একই এজেন্ডা একটি যথার্থ বামপন্থী প্লাটফর্ম থেকে সব কর্মজীবি মানুষের সামনে তুলে ধরবেন না?

জার্মান দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ ইয়ুরগেন হাবেরমাস ডিজিটাল পত্রিকা *সোশ্যাল ইউরোপ* এর একটি সাক্ষাৎকারে প্রস্তাব করেছিলেন, বাম শক্তিগুলোর উচিত হবে সামাজিক-অর্থনৈতিক অসাম্যের প্রশ্নে একটি পাল্টা আন্তর্জাতিক বিকল্প আন্দোলন গড়ে তোলা। এই আন্দোলন অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের বিরুদ্ধ পক্ষ হবে না, তাদের লক্ষ্য হবে বিশ্বায়ন যাতে শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষের কল্যাণে আসে, তার জন্য লড়াই করা। এই বিকল্প আন্দোলনের একটি যুক্তিপূর্ণ ভিত্তিভূমি আছে। শ্রমিক ও কর্মজীবীদের অধিকাংশই মনে করেন, চলমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শুধু রাঘববোয়ালদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত। প্রতিটি দেশের প্রতিটি দলের নেতারাই সেই রাঘববোয়ালদের পকেটে। তাদের স্বার্থ রক্ষাই এখন এইসব দলের প্রধান এজেন্ডা।

চতুর্থ অধ্যায়
সমাজতন্ত্রের উদ্ভব, স্বরূপ ও বিকাশ

১. সমাজতন্ত্রের উদ্ভব

ফরাসি বিপ্লবের বহু পূর্ব থেকেই তথা মানবেতিহাসে শ্রেণি ও শোষণের ধারণার উদ্ভবের কাল থেকেই সমাজকে কেন্দ্র করে মানুষ সাম্য বিষয়ক চিন্তা করে এসেছে। আধুনিক যুগের মানুষ প্রগতিশীল বিকাশে মানবজাতির ঐতিহাসিক স্থান ব্যখ্যার আগ্রহে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজকে মানবজাতির ক্রমবিকাশে এক অনিবার্য সূচনাগ্রন্থি হিসেবে উল্লেখ করেছে। আদিম ভিত্তিতে হলেও সেই সমাজ দেখিয়েছে যে ব্যক্তিগত মালিকানা, শোষণ, শ্রেণি, শ্রেণিসংগ্রাম ও রাষ্ট্র ছাড়াও মানুষের জীবন গড়ে উঠতে পারে। এখান থেকেই সূচনা ঘটেছে সামাজিক মালিকানা, যৌথ প্রথা, স্বাধীনতা, সমতা, গণতান্ত্রিকতা ইত্যাদির মতো বহু কমিউনিস্ট ঐতিহ্যের। ইতিহাসের গতিপথে সেগুলো হারিয়ে যায়নি, বরং যথার্থ সমাজতন্ত্রে গুণের বিচারে নবরূপে বাস্তবায়িত হবার ভিত্তি তৈরি করেছে।[১]

সমাজতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, এ মতাদর্শটির দুটি পৃথক অবয়ব লক্ষ্য করা যায়, একটি হলো কার্ল মার্কস পূর্ববর্তী সময়কালের, অপরটি হলো মার্কসের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে বিকাশপ্রাপ্ত।[২] সমাজতন্ত্র শব্দটির উদ্ভাবন আমরা লক্ষ্য করি ওয়েলসের সংস্কারবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত রবার্ট ওয়েনের মাধ্যমে। ১৮২৭ সালে *কোঅপারেটিভ* ম্যাগাজিনে তিনি প্রথম শব্দটি ব্যবহার করেন।[৩] পরবর্তীকালে তার অনুসারীরা শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার করেন। ফরাসি চিন্তাবিদ হেনরি সেন্ট সায়মন ১৮৩২ সালে *গ্লোব* নামক প্রকাশনায় শব্দটির ব্যবহার করেন।[৪] ১৮৪০ সালের মধ্যেই কমবেশি পুরো ইউরোপজুড়েই এটি একটি মতবাদ হিসেবে গণ্য হতে শুরু করে, যে মতবাদে মনে করা হয় যে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ সামগ্রিকভাবে সম্পদায়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত এবং গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত হওয়া উচিত। অবশ্য এ সময়কালে সমাজতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার আবশ্যিকভাবে এটা নির্দেশ করে না যে এর পূর্বে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা বিদ্যমান ছিল না। কিছু সমাজতত্ত্ববিদ দাবি করেন খ্রিস্টপূর্ব ৭৩ অব্দে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে রোমান সাম্রাজ্যে

[১] খারিস সাবিরভ, *কমিউনিজম কী*, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৩৫-৩৮।
[২] David Walker and Daniel Gray, *Historical Dictionary of Marxism*, Lanham, Maryland, UK: Scarecrow Press, 2007, p-286.
[৩] *Ibid.*
[৪] *Ibid.*

যে দাস বিদ্রোহ হয়েছিল, তার মূলে নিহিত ছিল মৌলিক সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা।[৫] কারণ তারা দাসদের স্বাধীনতা ও সমতার জন্যই সংগ্রাম করেছিল। ইংল্যান্ডে সমাজতন্ত্রের অগ্রদূত হিসেবে ধরা হয়ে থাকে ১৪ শতকের কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদানকারীদের। এই কৃষকেরা চেয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক কঠোরতার পরিসমাপ্তি এবং বৃহত্তর পরিসরে স্বাধীনতা। তাদের মনে যে সুপ্ত বাসনা ছিল তা সমাজতান্ত্রিক সহানুভূতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৫১৬ সালে স্যার টমাস ম্যুর *ইউটোপিয়া* নামক যে গ্রন্থটি লেখেন সেখানে তিনি এমন একটি সমাজের কল্পনা করেন যেখানে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না এবং ধনীদের দ্বারা গরিবেরা শোষিত হবে না। সতের শতকের খনি-শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বীজ নিহিত ছিল বলে ধারণা করা হয়[৬] কেননা, তারা বিত্তশালীদের চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং গরীবদের ভূমির অধিকারের কথা ঘোষণা করেছিল। আঠার শতকের ফরাসি বিপ্লবকে[৭] সমাজতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। উনিশ শতকের শুরুর দিকে রবার্ট ওয়েন, চার্লস ফুয়েরার, হেনরি সেইন্ট সায়মন এবং ইংল্যান্ডের সংস্কারবাদী আন্দোলনের[৮] সমর্থকগণকে কার্ল মার্কসের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার অগ্রপথিক হিসেবে গণ্য করা হয়। কার্ল মার্কস পূর্ববর্তী এসব চিন্তাবিদের অধিকাংশই সমাজব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি ও লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কল্পলোকের আশ্রয় নেন এবং তারা সমাজের অতিপ্রকট বাধাগুলো থেকে মুক্ত এক সমাজের কাল্পনিক

---

[৫] *Ibid.*

[৬] *Ibid.*

[৭] ফরাসি, ইউরোপ এবং পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ফরাসি বিপ্লব। এই বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং একই সাথে দেশের রোমান ক্যাথলিক চার্চ সকল গোঁড়ামী ত্যাগ করে নিজেকে পুনর্গঠন করতে বাধ্য হয়। ফরাসি বিপ্লবকে পশ্চিমা গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক জটিল সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যার মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা নিরঙ্কুশ রাজনীতি ও অভিজাততন্ত্র থেকে নাগরিকত্বের যুগে পদার্পণ করে। ফরাসি বিপ্লবের মূলনীতি ছিল স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব, নতুবা মৃত্যু। এই শ্লোগানটিই বিপ্লবের চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছিল যার মাধ্যমে সামরিক এবং অহিংস উভয়বিধ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্লোগানটি তখন সকল কর্মীর প্রাণের কথায় পরিণত হয়। নিম্নমানের অর্থনৈতিক অবস্থা, বল্গাহীন জাতীয় ঋণ, অসম করারোপ, বেকারত্বের উচ্চহার, খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য, বিপ্লবের ঠিক আগের মাসগুলোতে বিরাজমান খাদ্য সংকট, বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারীদের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য, যাজকশ্রেণির চরম ভোগবিলাস, সমাজের একটি বিশেষ পেশাদার শ্রেণি ও উঁচু শ্রেণির লোকদের ব্যাপক সুবিধা প্রদান, সাধারণ জনগণের জীবনব্যবস্থাকে নিজেদের প্রভাবাধীনে রাখার মানসিকতা ও প্রচেষ্টা প্রভৃতি কারণে কৃষক, চাকুরিজীবী শ্রেণি ও কিছু পরিমাণ বুর্জোয়া কর্তৃক অভিজাততন্ত্রের উচ্ছেদের পক্ষে আন্দোলন শুরু হয় এবং স্বাধীনতার পক্ষে একটি জোয়ার সৃষ্টি হয়। দীর্ঘস্থায়ী এসব সমস্যাসমূহের যেকোনোটির সমাধানে সম্রাট লুই ১৬ এর ব্যর্থতায় পতন হয় স্বৈরাচারী শাসকের, ইতিহাসের পাতায় লিখিত হয় শোষিত, নির্যাতিত মানুষের জয়ের এক উপাখ্যান যার নাম ফরাসি বিপ্লব।

[৮] সংস্কারবাদী আন্দোলন হলো এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন যার লক্ষ্য সমাজের ত্বরিত বা মৌলিক কোনো পরিবর্তনের বদলে ক্রমিক পরিবর্তন অথবা সমাজের বিশেষ কোনো একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা মৌলিক ও ভিত্তিগত পরিবর্তন থেকে এটি ভিন্ন প্রকৃতির। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কারবাদী আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় উদারতাবাদী চিন্তাধারা থেকে। অবশ্য এদের গভীরে নিহিত থাকতে পারে সামাজিক বা ধর্মীয় চেতনা। এগুলোর কিছু কিছু মানুষের ব্যক্তিগত পরিবর্তন নির্ভরতার লক্ষ্যে পরিচালিত, আবার কিছু সমাজের ছোট ছোট সংগঠনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। কিছু কিছু সংস্কারবাদী আন্দোলনে সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধসমূহের পরিবর্তনের বদলে সেগুলোর কার্যকরী প্রয়োগের কথা বলা হয়। এককথায় বলা যায়, সংস্কারবাদী আন্দোলন বলতে সেইসব সামাজিক আন্দেলনকে বোঝায় যার লক্ষ্য হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতিসমূহকে কোনো সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

দিকনির্দেশ করেন। তবে সাধারণভাবে, এসব চিন্তাবিদের সমাজতান্ত্রিক ধারণার মূলে নিহিত ছিল সমতা, স্বাধীনতা, সম্প্রদায় এবং পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনাধর্মী অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, সাথে সাথে তারা বিকল্প হিসেবে সামাজিক মালিকানা ও যৌথ পরিকল্পনার ওপর জোর দেন। এই ধারণার ভিত্তিতে মার্কসবাদকে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

আধুনিককালে সমাজতন্ত্র শব্দটির সংজ্ঞা ও ব্যবহার পাকাপোক্ত হয় ১৮৬০ এর দশকে। সে সময়ের আগে ব্যবহৃত সমবায়ী, পারস্পরিকপন্থী এবং সংঘপন্থী শব্দগুলোর পরিবর্তে সমাজতন্ত্র শব্দটিকে নানা লেখক ব্যবহার করেছেন।[৯] ১৮৪০ এর দশকে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ শব্দ দুটির পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যের জন্য সাম্যবাদ শব্দটির ব্যবহার কমে যায়। আগে বোঝানো হতো যে সমাজতন্ত্র শব্দটি যেখানে শুধু উৎপাদনের সামাজিকীকরণ করতে চায়, যেখানে সাম্যবাদ উৎপাদন ও ভোগ উভয়ের সামাজিকীকরণ করতে চায়। ১৮৮৮ সালের আগে মার্কসবাদীরা সাম্যবাদের পরিবর্তে সমাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করত। সাম্যবাদ এখন আর সমাজতন্ত্রের সমার্থক নয়। ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর লেনিন সমাজতন্ত্রকে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে উপস্থাপন করলে শব্দটি আবার সামনে আসে যদিও সে সময় পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী মার্কসবাদীরা সমালোচনা করত যে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য যথার্থ উন্নত নয়। আধুনিককালের সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী চিন্তা আবির্ভাবের হাজার বছর পূর্বে দেখা দিয়েছিল মানবজাতির সুখ ও ন্যায়পরায়ণ সমাজের অনুসন্ধানের এক দীর্ঘ চিন্তাভাবনা। মানবজাতির চিন্তায় এসেছিল কমিউনিস্ট কল্পলোকের নানা উৎস ও পর্ব। এসব পর্বের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কমিউনিস্ট কল্পলোকের প্রাথমিক পর্ব, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের কমিউনিস্ট কল্পলোক এবং অষ্টাদশ শতকের ফরাসি কল্পলৌকিক সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রের একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও অবস্থান রয়েছে এ দাবির প্রেক্ষিতে মার্কস স্বীয় সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের এবং তাঁর মতবাদের বিরোধীতাকারীদের মত থেকে পৃথক করেন। সমাজতন্ত্র যে শুধু একটি বিপ্লবের আদর্শ সে ধারণাকে মার্কস প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে সমাজতন্ত্র হলো একটি ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফল, বিশেষ করে পুঁজিবাদী প্রবণতা এবং পুঁজিবাদী ধারণার নেতিকরণের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব। সমাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস কখনও সমাজতন্ত্রকে মার্কসবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলেননি এবং সাম্যবাদের পরিবর্তে তারা বিভিন্ন সময় 'বিচারমূলক বস্তুবাদী সমাজতন্ত্র', 'বিচারমূলক ও বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র' এবং 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন।

[৯] David Walker and Daniel Gray, *Ibid.*

কার্ল মার্কস *The Critique of the Gotha Programme* (1875) এ সাম্যবাদের দুটি পর্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। প্রথম পর্বের সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণির ধারণা বিদ্যমান, একটি রাষ্ট্রে শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতেই বন্টনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো এবং প্রাক্তন পুঁজিবাদী সমাজের অনেক বিষয়ই অস্তিত্বশীল ছিল। অন্যদিকে সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায়ে যাকে কিনা যথার্থ সাম্যবাদ বলা চলে সেখানে কোনো শ্রেণির ধারণা থাকবে না, থাকবে না কোনো রাষ্ট্রের ধারণা, যেখানে সম্পদের বন্টন হবে প্রয়োজনানুসারে। লেনিন তার *The State and Revolution* (1971) গ্রন্থে মার্কস বর্ণিত সাম্যবাদের প্রথম পর্বকে সমাজতন্ত্র হিসেবে নির্দেশ করেছেন।[১০] পরবর্তীকালের মার্কসবাদীরা ব্যাপকভাবে এই অর্থটি গ্রহণ করেন। সেই থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মতো সাম্যবাদী দলসমূহ দেশ শাসন করেছে সেইভাবেই যে অর্থে তারা নিজেরা সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। এসব দেশের শাসকবর্গ সবসময়ই দাবি করে এসেছেন যে তারা সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্বে রয়েছেন এবং ক্রমেই তারা এর চূড়ান্ত পরিণতির দিকে বা যথার্থ সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ লিওনিড ব্রেজনেভের কথা বলা যেতে পারে, যিনি কিনা তার নেতৃত্বাধীন সময়কালের সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিকাশপ্রাপ্ত সমাজতন্ত্রের আকার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মার্কসবাদীরা বহু বছর ধরেই এসব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অবস্থান নিয়ে বিতর্ক করেছেন। তাদের বিতর্কের মূল কারণ ছিল সাম্যবাদের পথে এসব দেশগুলো পুঁজিবাদ পরিবর্তনকালীন সময়ে সমাজতন্ত্রকে লেনিনীয় অর্থে সংবিধিবদ্ধ করেছিলেন কি-না তা নিয়ে।

নিজ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে একটি নতুন সমাজ গঠনে নিবেদিত এক সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে সমাজতন্ত্রের উত্থান। সমাজতন্ত্রের এই উত্থান ঘটেছে পুঁজিবাদের বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে এবং পুঁজিবাদের বিরোধিতা করেই সমাজতন্ত্র এগিয়ে গেছে।[১১] অর্থাৎ পুঁজিবাদের বাস্তব বিকল্প হচ্ছে সমাজতন্ত্র। যে ধারাবাহিকতায় সমাজতন্ত্র এসেছে, তা থেকেই এ সত্য বেরিয়ে আসে। বিশ্ব ইতিহাসের মঞ্চে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের এ বিকল্প ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

---

[১০] *Ibid.*

[১১] পল এম সুইজি, 'সমাজতন্ত্র', (সম্পা.) শরীফ শমশির, *সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে*, ঢাকা: গণপ্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ৮০।

২. সমাজতন্ত্রের স্বরূপ

সমাজ সংগঠনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে আবশ্যিকভাবে যেসব প্রত্যয় আমদের সামনে উপস্থিত হয় তার মধ্যে সমাজতন্ত্র অন্যতম। মানব সমাজের বৈষয়িক স্বার্থের বিষয়টিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে তাত্ত্বিক চিন্তার জগতে এ মতবাদ বেশ অর্থবহ। সামাজিক উৎপাদন, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদনের এই সম্পর্কগুলোর সামগ্রিকতায় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো (প্রকৃত বুনিয়াদ) ও উপরিকাঠামোই (আইনগত ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সুনির্দিষ্ট রূপের সামাজিক চৈতন্যই) সমাজতন্ত্রের অনুষঙ্গী। এ মতবাদ সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারিত করে। মানুষের চৈতন্য যে তাদের অস্তিত্বকে নির্ধারিত করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চৈতন্যকে নির্ধারিত করে[১২] সে কথা সমাজতন্ত্রই আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব প্রায়ই মানুষকে একটি সত্যের সামনে দাঁড় করায়। সেটি হলো: ঘটনার গতিসূত্র কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দল বা একটিমাত্র শ্রেণির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে না। একাধিক শ্রেণির স্বার্থ সেখানে সর্বদাই কাজ করে চলেছে। এর ফলে কখনও একশ্রেণির লক্ষ্য পূরণ হয়, কখনও বা হয় না। কাজেই সব রকমের বিরোধ ও সংঘাত দেখা দেয় শ্রেণি, দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির বিরোধ হিসেবে। উৎপাদন সম্পর্কের কোনো নির্দিষ্ট স্তরে এসব বিরোধ ও সংঘাতের নিরসন সম্ভব নয় বলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাই সমাজতন্ত্র।

মার্কস ও এঙ্গেলসের পূর্ববর্তী লেখকেরা সমাজব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি এবং লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কল্পলোকের আশ্রয় নেন এবং তারা সমাজের সমস্যাগুলো থেকে মুক্ত এক কাল্পনিক সমাজের দিকনির্দেশনা দেন। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের রচনাবলীর মাধ্যমে নতুন সমাজের মূল বিশেষত্বগুলোকে তার বিকাশের ধারার ভিত্তিতে ফুটিয়ে তোলেন সমাজবিকাশের সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে। ফরাসি বিপ্লোবোত্তরকালে ব্যক্তিবাদের উদার তত্ত্বের বৈসাদৃশ্য বোঝাতে সমাজতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার করা হয়।[১৩] ব্যক্তিবাদ মূলত জোর দেয় ব্যক্তিসমূহের বিচ্ছিন্ন কর্মের ওপর এবং মনে করে মানুষের এভাবেই ক্রিয়া করা উচিত। সমাজতন্ত্রীরা উদার ব্যক্তিবাদীদের এই বলে অভিযুক্ত করেন যে তারা দারিদ্র্যের সামাজিক উদ্বেগ, সামাজিক নির্যাতন এবং মোট সম্পদের অসাম্যকে লোপ করতে

[১২] দেখুন, Andrew Vincent, *Modern Political Ideologies*, USA: Wiley-Blackwell publishing, 2010, pp. 80-83.

[১৩] অনুপ সাদি, *সমাজতন্ত্র*, ঢাকা: ভাষাপ্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১৮।

ব্যর্থ। সমাজতন্ত্রে মনে করা হয় যে, প্রতিযোগিতানির্ভর সমাজ, সংঘ জীবনের ঐকতানের ক্ষতি করেছে। সমাজতন্ত্রকে সহযোগিতার ভিত্তিতে চালিত উদার ব্যক্তিবাদের বিকল্প এক সমাজ হিসেবে সমর্থন করা হয়।[১৪]

সমাজতন্ত্র এমন একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা এবং অর্থনীতির একটি সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। একই সাথে এটি একটি রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলন যার লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যেখানে সম্পদ ও অর্থের মালিকানা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ এখানে কোনো ব্যক্তিমালিকানা থাকে না। ব্যক্তিমালিকানার অবসানের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র মানুষে মানুষে শোষণের অবসান ঘটায়। সমাজতন্ত্রের সামাজিক উৎপাদনের লক্ষ্য হলো জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও সমাজের প্রতিটি মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। সমাজতন্ত্রের মূলনীতি হলো প্রত্যেকে কাজ করবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রত্যেকে গ্রহণ করবে তার শ্রম অনুযায়ী।[১৫] সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম হচ্ছে সামাজিক উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সমাজের সকল সদস্যের পূর্ণ সচ্ছলতা ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীন বিকাশ নিশ্চিতকরণ। এ নিয়মটি সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও তা অর্জনের উপায়গুলো প্রকাশ করে।[১৬]

সমাজতন্ত্র হচ্ছে মানব আত্ম-বিচ্ছিন্নতার[১৭] উচ্ছেদ, সত্যিকারের মানবসত্ত্বা হিসেবে মানুষের প্রত্যাবর্তন। মানুষ ও প্রকৃতির এবং মানুষের সাথে মানুষের বৈরিতার চূড়ান্ত অবসান। এটি হলো অস্তিত্ব ও সারমর্ম, উদ্দেশ্যকরণ ও স্বঘোষণা, স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয়তা, ব্যক্তি ও প্রজাতির মধ্যেকার

---

[১৪] Marvin Perry, Myrna Chase, Margaret Jacob, James R. Jacob, *Western Civilization: Ideas, Politics and Society From 1600*, vol. 2, Ninth Edition, Boston, Massachusetts, USA: Houghton Harcourt Publishing Company, 2009, p. 540.

[১৫] খারিস সাবিরভ, *কমিউনিজম কী*, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৩৩৮।

[১৬] সোফিয়া খোলদ, *সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ*, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৯০, পৃ. ১৭২।

[১৭] ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তায় বিচ্ছিন্নতা প্রত্যয়টি বেশ পুরোনো। জার্মান দার্শনিক হেগেলের ভাবনায় বিচ্ছিন্নতা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। হেগেল ও বাম হেগেলীয় চিন্তা থেকে তুলে এনে মার্কস প্রত্যয়টিকে ভিন্ন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেন। এটি মার্কস এর প্রথম জীবনের কেন্দ্রীয় ভাবনা যা তিনি বিধৃত করেন *Economic and Philosophic Manuscripts* (1844) এ। হেগেলের মত মার্কসও মানব ইতিহাসকে দেখেছেন বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করার ইতিহাস হিসেবে। তবে মার্কস এর কাছে বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর ফলজাত একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়। তিনি বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে বিশেষভাবে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রূপান্তরিত করেন। মার্কসীয় ব্যাখ্যায় দেখা যায়, বিচ্ছিন্নতাবোধ এমন একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যেখানে মানুষ সমষ্টিগত সংগঠন গড়ে তোলে এবং এর মধ্যেই তারা তাদের আত্মসত্তাকে হারিয়ে ফেলে। সরল অর্থে বিচ্ছিন্নতা বলতে বোঝায় মানুষের তার কাজ এবং অন্য মানুষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। বিচ্ছিন্নতার উৎস দুটি। প্রথমত: শ্রমবিভাজন, বাজার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দ্বিতীয়ত: সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ। মার্কস মনে করেন, এই বিচ্ছিন্নতা সবচেয়ে প্রবল ধনতান্ত্রিক সমাজে। এই সমাজে ক্ষুদ্র একটি বুর্জোয়া শ্রেণি বিশাল শ্রমিক শ্রেণিকে করে সর্বহারা, শ্রমজাত দ্রব্যের মালিকানাহীন এবং সর্বোপরি আত্মবিচ্ছিন্ন। মানুষ হিসেবে চিহ্নিত না হয়ে শ্রমিক রূপান্তরিত হয় তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায় পণ্য হিসেবে।

সংঘাতের সত্যিকারের সমাধান।[১৮] ব্যক্তিগত মালিকানায় যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম হয় তার বিপরীতে সামাজিক মালিকানার ফলে দেখা দেয় শোষণমুক্ত কর্মীদের শ্রমজনিত সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা। এটি হলো মানবজাতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন,

> সমাজতন্ত্র প্রতিযোগিতাকে শুধু যে নির্বাপিত করে না, তাই নয়, বরং উল্টো, এই প্রথম তাকে যথার্থই ব্যাপকভাবে, যথার্থই গণ পরিসরে প্রয়োগের, যথার্থই অধিকাংশ মেহনতিকে এমন কাজের ক্ষেত্রে টেনে আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, যেখানে তারা নিজেকে প্রকাশ করতে, নিজেদের নানা দক্ষতা উন্মুক্ত করতে, প্রতিভার স্ফূরণ ঘটাতে পারে, যেগুলো জনগণের মধ্যে অজস্র ঝর্ণাধারার মতো আর যেগুলোকে পুঁজিবাদ হাজারে হাজারে ও লক্ষে লক্ষে বিধ্বংস, দমিত করেছিল, টুটি টিপে ধরেছিল।[১৯]

সমাজতন্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক জীবন এবং সামাজিক সম্পর্কের সংগঠন ও পরিচালনার বিভিন্ন রূপের মধ্যে পরিবর্তন ঘটানোর কথা বলে। সমাজতন্ত্র মূলত মানুষের সব ধরনের বিকাশের যথাসম্ভব চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এ মতবাদ বিপ্লবের কথা বলে শ্রেণির ধারণা ও শ্রেণি শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য। এ মতবাদে মনে করা হয় যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা কেবল তখনই ফুরিয়ে যাবে যখন দেশসমূহের মধ্যে অর্থনীতিকেন্দ্রিক যুদ্ধের আশংকা ও শ্রেণিতে শ্রেণিতে বৈরিতা পরিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে। সারা পৃথিবীতে এ পরিস্থিতি গড়ে উঠবে তখনই, যখন বেশিরভাগ দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

৩. সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ওপর নির্ভর করে মার্কস মানব ইতিহাসকে যেভাবে পর্যালোচনা করেছেন তাকে বলা হয় ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে মার্কস মানব সমাজের বিকাশের ধারা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণি সংগ্রামের যে রূপ পাওয়া যায় তাতে যেমন শ্রেণি সংগ্রামের দিকটি প্রকাশিত, তেমনি এই শ্রেণি সংগ্রামের চরিত্র

---

[১৮] এরিক ফ্রম, *মার্কসের মানুষ*, (অনু.) মনোজ দে ও জাভেদ হোসেন, ঢাকা: বাঙলায়ন, ফেব্রুয়ারি, ২০১০, পৃ. ৬৬-৬৭।

[১৯] V. I. Lenin, 'How to Organize Competition?', *Collected Works*, Vol. 26, Moscow: Progress Publishers, 1972, p. 404.

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পূর্বে অবস্থিত এবং সকল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতেই তা সুস্পষ্ট। তিনি মনে করেন, সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবসমাজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপ নিয়েছে। মানব ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই সমাজব্যবস্থায় মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন চালানোর প্রবণতা অবর্তমান ছিল, কারণ এই সমাজে পণ্য বলে যে বিষয়বস্তু শোষণ সম্পর্কিত সমগ্র উপলব্ধি সৃষ্টি করে তা অনুপস্থিত ছিল। মানুষে মানুষে আর্থ-সামাজিক ব্যবধান ছিল না এবং সেই কারণে সামজিক শ্রেণিও আত্মপ্রকাশ করেনি। সকলে মিলে যৌথভাবে জীবনযাপন করত এবং সামাজিক শ্রেণি অনুপস্থিত থাকায় কোনোরূপ শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিশোষণ গড়ে ওঠার অবকাশ ছিল না। কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের গতিপথ একটি পর্যায়ে উপনীত হবার পর, আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সমাজের অভ্যন্তরে এমন সব চাহিদার সৃষ্টি হয়, যাতে এই সমাজের স্থানে একটি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠা একান্তভাবে আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

মার্কসের মতে এই আবশ্যকতা সমাজ বিকাশের ধারার দ্বিতীয় স্তরে দাস সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় দাস এবং দাসপ্রভু বলে দুটি প্রধান সামাজিক শ্রেণি সৃষ্টি হয় এবং দাসপ্রভূরা ক্রীতদাসদের পণ্যসামগ্রী বলে বিবেচনা করতে থাকে। দাস সমাজব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচুর স্তর নির্ধারিত হতে শুরু করে এবং তার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয় সামাজিক শ্রেণি এবং তার ফলে শ্রেণিদ্বন্দ্ব। মার্কস আরও বলেছেন, উৎপাদন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়, তা কোন শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ করবে তা নিয়ে গড়ে ওঠা প্রাথমিক বিতর্কের মধ্য দিয়েই শ্রেণি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। দাস সমাজব্যবস্থায় যেহেতু দাসপ্রভূরা এই উদ্বৃত্ত মূল্যের অধিকারী ছিল তাই স্বভাবতই তারা ছিল ঐ সমাজের শোষক এবং ক্রীতদাসরা ছিল শোষিত। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এই সমাজও ক্রমান্বয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আত্মপ্রকাশ করে এবং তার স্থানে জন্ম নেয়া সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা একটি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত হয়ে স্থান করে নেয়।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামন্তপ্রভূ ও ভূমিদাস সমাজের মূল দুই শ্রেণি শোষক ও শোষিত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং শ্রেণিদ্বন্দ্ব দাস সমাজব্যবস্থা থেকে আরও তীব্র রূপ নেয়। ফলে একইভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাও এক সময় প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত হয়ে পরবর্তী আর্থ-সামাজিক বিন্যাস পুঁজিবাদে স্থান করে দেয়। এইভাবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পৃথিবীর

বুকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কায়েম হয় যা মার্কস পর্যবেক্ষণ করেন। মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ধারণার মধ্য দিয়ে মানবেতিহাসের যে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন তাতে ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করলেও, যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান তাই তাঁর সমগ্র লেখায় বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির কথা।

মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদী সমাজে শোষক ও শোষিত যথাক্রমে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং শোষণের রূপ সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই দুই শ্রেণির মধ্যে শ্রেণিদ্বন্দ্বের রূপও সবচেয়ে বেশি তীব্র হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে যেহেতু আপামর সমাজ শ্রমিকশ্রেণি নিয়ে গঠিত বলে দেখা যায়, তাই এই শ্রেণিদ্বন্দ্বে মালিকশ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। শ্রমিকশ্রেণি তাদের বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে সামাজিক বিপ্লবে অংশগ্রহণ করবে এবং এই বিপ্লবে বিজয়ের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উদ্বৃত্ত মূল্য গুটিকয়েক শোষকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার পরিবর্তে আপামর সমাজের কল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে নিষ্পেষণমূলক ও মানবতা বিরোধিতার রূপ থাকে তাও দূর হবে এবং শ্রমিকশ্রেণি তাদের স্বার্থরক্ষাকারী সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠন করতে সফল হবে।

মার্কসবাদীরা জনগণের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে প্রয়োজন দেশের পশ্চাৎপদ আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবসান ঘটানো এবং সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করা। কিন্তু কোনো দেশের চলমান ধনবাদী বিকাশের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থেকে এই লক্ষ্য পূরণ করা অসম্ভব। অপরদিকে এই মুহূর্তে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের পূর্বশর্তগুলোও সেখানে পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় সংকট মোকাবিলা করে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া এবং সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্তগুলো সৃষ্টি করার জন্য সে দেশের বর্তমান অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন তথা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা মার্কসবাদীদের লক্ষ্য। কিন্তু সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্তসমূহ সৃষ্টি করার জন্য তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বহু বিপ্লবী সংস্কার সাধন করতে হবে। এই পূর্বশর্তগুলো পূরণ করার অর্থই হলো জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা।

অনেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরের অঙ্গীকার বিগত কয়েক যুগের অভিজ্ঞতার ও সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বলা বাহুল্য, অনেক দেশেই মার্কসবাদীরা সাম্যবাদী আন্দোলন ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব সমাজতন্ত্রের প্রগতি বিঘ্ন হয়েছে, এই বাস্তবতা এড়িয়ে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন সফল হবে না। অন্যত্র বিফল হলেও সমাজতন্ত্র কেন দেশ, সমাজবিশেষে সফল হবে এবং যেসব কারণে বিফল হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি হবে না এই ধরনের প্রশ্ন উঠবে তা স্বাভাবিক। তদুপরি একুশ শতকের মার্কসবাদ উনিশ শতকের মার্কসবাদের সাথে যেমন সম্পর্কহীন হতে পারে না, তেমনি তা হুবহু অভিন্ন হতে পারে না। উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করে যেকোনো সামাজিক বিষয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণে এই ভিন্নতা পরিস্ফুট হবে। স্পষ্টত, উৎপাদন সম্পর্কের কোনো মৌলিক পরিবর্তন না হলেও উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি ও প্রসারে অচিন্তনীয় সাফল্য ধনতন্ত্রের আশু অবসানের নিয়মিত ভবিষ্যদ্বাণীর অবাস্তবতা প্রমাণ করে। বিশেষ করে গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লবের সার্থকতা ধনতন্ত্রের বিশ্বায়নকে সামর্থ্যবান করেছে, পুরোনো উৎপাদন পদ্ধতিতে যন্ত্রায়ন এনেছে, শ্রমিকের দক্ষতা ও শ্রমিক প্রতি উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়েছে। সঙ্গে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। নতুন পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে উচ্চশিক্ষিত শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রশমিত হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। সেবাক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা অনেক স্থানে উৎপাদনক্ষেত্রের শ্রমিক সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া বেড়েছে মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা। এই নতুন সংমিশ্রণের শ্রমিক সমাজে শিক্ষার মাত্রায় অনেক বিভিন্নতা আছে। শ্রমিকদের জন্য গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অত্যাবশ্যক। এসব পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী পরিণতি একুশ শতকের সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আন্দোলনের দিকদর্শন, রকম ও পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

ধনতন্ত্রের দীর্ঘায়ু, বিশ্বায়নে সার্থকতা ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে বিপরীত পরিণতি সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, ধনতন্ত্রের এই বিজয় হয়েছে শ্রমিক উৎপাদিত মালিকের দখলে হস্তান্তরিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়ার ফলে। অবশ্য একই সঙ্গে শ্রমিকের অকাট্য আয় কমেছে। ধনী-দরিদ্রের আয়ের তফাত বাড়ছে। তবে একুশ শতকের ধনতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা ধ্বংসাত্মক পরিণতি পরিবেশের ওপর এই উৎপাদনব্যবস্থার ক্ষতিকর প্রভাব। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য মুনাফা অর্জন এবং সেটা সম্ভব ক্রমাগত উৎপাদন বাড়ানো গেলে; তার জন্য প্রয়োজন ভোগবাদের প্রসার। পুঁজিপতি শ্রেণির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই বর্তমান ব্যবস্থায় অপরিমিত পণ্য উৎপাদনের নীতি অনুসরণের চেষ্টা করছে। তার

ফলে দ্রুতগতিতে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার হচ্ছে, দূষণ উৎপাদিত হচ্ছে অতিমাত্রায়; এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে এই গ্রহে মানবগোষ্ঠী তো দূরে থাকুক, জীবিত কিছুই থাকবে না।

সীমাহীন উৎপাদন সম্ভব নয়, এই বাস্তবতা সমাজতন্ত্রের কর্মীদের জন্য জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি ছিল শ্রেণিহীন সমাজে উৎপাদন শক্তির সাহায্যে সমাজের সবার অফুরন্ত প্রয়োজন মেটানো। এখন এই ধারণা বাস্তব মনে হয় না। প্রকৃতি ও পরিবেশের সীমাবদ্ধতার কারণে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উনিশ শতকের ধ্যানধারণার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যেসব মৌলিক ধ্যানধারণা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমের ভিত্তি, সেসব প্রত্যাখ্যান করার প্রশ্ন আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। কার্ল মার্কসের মতে, সমগ্র একটা সমাজ, একটা জাতি অথবা সম্মিলিতভাবে একই সময়ে অবস্থিত সমগ্র সমাজ গোষ্ঠী সমবেতভাবেও পৃথিবীর মালিক নয়। তারা শুধু দখলকারী, উপভোগকারী। আজকের প্রজন্মের কর্তব্য, বিজ্ঞ তত্ত্বাবধায়কের মতো উত্তরসূরিদের জন্য পৃথিবীকে উন্নততর অবস্থায় রেখে যাওয়া।[২০] ধনতন্ত্রের দীর্ঘকালব্যাপী মানুষ ও প্রকৃতির শোষণের অবসান ত্বরান্বিত না হলে মানব প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তবে যে সমাজে শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্র্য, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি প্রচলিত থাকে, সে সমাজে এসব থেকে মুক্তির আকাঙ্খাও থাকে।

৪. সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণি কাঠামো

সমাজ জীবন সম্পর্কিত মার্কসীয় চিন্তার কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে শ্রেণির ধারণা। কার্ল মার্কসই প্রথম সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে শ্রেণি ধারণাটিকে মানব চরিত্রের একটি মৌলিক ধারণা হিসেবে সূত্রবদ্ধ করেন।[২১] মূলত শ্রেণি সম্পর্কীয় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণি কাঠামো গড়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের দুই প্রধান শ্রেণি হলো শ্রমিক শ্রেণি ও সমবায়ী কৃষক। পুঁজিবাদী সমাজে যে প্রলেতারিয়েত উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত এবং পুঁজিবাদীদের নিকট নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য সেইরকম শ্রেণি সমাজতান্ত্রিক সমাজে নেই। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকেরা সমগ্র জনগণের সঙ্গে উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং শোষণ থেকে মুক্ত। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কায়েম এবং উত্তরণ পর্ব শুরু হবার পর থেকে শ্রমিকদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। বদলে যায় তার গুণগত গঠন, সংস্কৃতি ও শিক্ষার মান।

---

[২০] দেখুন, কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, তৃতীয় খন্ড, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ. ৭৮-১০২।

[২১] হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ১৯৮।

সমাজতন্ত্রে কোনো বৈরী শ্রেণি থাকে না, কেননা কলকারখানা, ভূমি সবই রাষ্ট্রের সম্পত্তি। সমাজতন্ত্রে শ্রেণিশোষণ বিলুপ্ত হয়, শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। সমাজতন্ত্র গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষি জোতের সমবায়ীকরণ ও যৌথায়ন করা হয়, অর্থাৎ এক একটা ব্যক্তিগত ছোট সম্পত্তিগুলোকে পরিণত করা হয় যৌথখামারের সমস্ত সভ্যের এজমালি মালিকানায়। যৌথখামারকে রাষ্ট্র জমি দেয় দীর্ঘকাল ব্যবহারের জন্য। এইভাবে গড়ে ওঠে বড় বড় কৃষি উদ্যোগ, কৃষিকাজে ও পশুপালনে সাম্প্রতিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের প্রয়োগ যেখানে সম্ভবপর। কৃষকদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, শ্রম জীবনযাত্রা ও সামাজিক প্রকৃতিতে সূচিত হয় আমূল পরিবর্তন। যৌথীকরণে গ্রাম মুক্ত হয় ধনী চাষির গোলামি ও শ্রেণিগত স্তরভেদ থেকে। উৎপাদনের উপকরণ ও উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে কৃষকেরা ক্রমশ পরিণত হচ্ছে এমন শ্রেণিতে যা সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক মালিকানার সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

সমাজতান্ত্রিক দলসমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও সেগুলো অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের কাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। সমাজতন্ত্রের বিকাশ ও বাস্তবায়নের গতিপথে সামাজিক শ্রেণিগত বিন্যাস যথেষ্ট বদলে যায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণি পরিবর্তনের শুরুটা পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্বের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমাজের শ্রেণি কাঠামোয় বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন হয় বেশ দীর্ঘকালীন একটি উত্তরণ পর্বের। কেননা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের জন্য সময় দরকার। বুর্জোয়া ও ক্ষুদে বুর্জোয়া ব্যবস্থাপনার অভ্যাস জয় করা যায় কেবল দীর্ঘ ও একরোখা সংগ্রামের মাধ্যমে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের আরো বিকাশের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ মুছে যাবে বলে মনে করা হয়। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের দৌলতে কৃষি উৎপাদন পরিণত হবে শিল্পোৎপাদনের ভিন্ন রকমে। জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির দিক থেকে গ্রাম শহরের দিকে একেবারে কাছাকাছি পর্যায়ে চলে আসবে। বর্তমানের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সামাজিক বিন্যাস পরিবর্তনের সহায়ক। যত উন্নত হবে প্রযুক্তি, যত প্রসারিত হবে স্বয়ংক্রিয়তা ও যৌগিক যন্ত্রায়ন, ততই প্রয়োজন হবে উচ্চ যোগ্যতার শ্রম, কায়িক ও মানসিক শ্রম আসবে ততই কাছাকাছি। জনগণের শিক্ষার মান যতই বাড়বে মেহনতিদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবি, মনীষী ও বাকি অংশের মধ্যে সীমারেখা মুছে যাবে।

শ্রেণিহীন সমাজ গঠনই হলো সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শেষ লক্ষ্য, কেননা এই সমাজেই দূরীভূত হবে অর্থনৈতিক অসাম্য, গড়ে উঠবে প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিস্থিতি। লোকেদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে শুধু গুণে, সামর্থ্যে, ব্যক্তিত্বে, জ্ঞানের মাত্রা ইত্যাদিতে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত শ্রেণির ধারণা থাকছে, ততদিন সমাজে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে ও নেবে শ্রমিক শ্রেণি, কেননা এ হলো সবচেয়ে ঘনবদ্ধ ও সংগঠিত শ্রেণি, আর তারাই হলো সর্বাগ্রে সাম্যবাদী আদর্শের বাহক।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও সামাজিক গ্রুপের মধ্যে সম্পর্ক হলো সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় ঐক্যের সম্পর্ক। এই ঐক্য সমাজতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাধান্য, কেননা সাম্যবাদ গঠনে সমস্ত জনগণের প্রয়াস ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয় তাতে। এই দিক থেকে বিকশিত সমাজতন্ত্রের একটা চালিকাশক্তি হলো সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য। তার মানে কিন্তু এই নয় যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিরোধ নেই। নতুনের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সর্বদাই দেখা দেয় কিছু বিষয় অভাবিত এবং কিছু বিষয় অচলীভূত। এক ধরনের বিরোধ লোপ পেলেও সমাজের বিকাশ থেকে নতুন বিরোধ জাগতে পারে। এ বিরোধের চরিত্র বৈরী নয়, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শ্রেণি সৃষ্টিকারী নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ ও সংহতি যত বাড়বে , যত বাড়বে সামাজিক সম্পদ, ততই গড়ে উঠবে বিরোধ নিরসনের অনুকূল পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতিতেই সমাজতন্ত্র আমাদেরকে উপহার দিতে পারে একটি শ্রেণিহীন সমাজ।

৫. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দর্শন

বিভিন্ন সময়ের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলো ছিল সভ্যতার ইতিহাসে এক অসামান্য ঘটনা। মার্কস-এঙ্গেলস বিপ্লবের যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দার্শনিকভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং প্রয়োগের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন, লেনিন তাকে শ্রমিক-কৃষকের ঐক্য এবং রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির বৈপ্লবিক কাজের মধ্যে দিয়ে সাফল্যের সাথে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনেকগুলো তাৎপর্যের মধ্যে রয়েছে এর আন্তর্জাতিকতা, সম্পদের পুঁজিবাদী মালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং মুনাফার লোলুপ পৃথিবীতে আত্মকেন্দ্রিকতাকে হটিয়ে মনুষ্যত্বের, সহমর্মিতার ও সহযোগিতার জগৎ প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিকতা এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের অপরিহার্য উচ্ছেদ।[২২]

[২২] মধুসূদন চক্রবর্তী, *মার্কসবাদ জানবো*, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪, পৃ. ৭৯।

বিপ্লব আরও ঘটেছে, কিন্তু সেসব বিপ্লব ছিল বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ দেশে। শিল্পবিপ্লব ছিল ইউরোপের ঘটনা। ফরাসি বিপ্লব ফরাসি দেশ ছাড়িয়ে ইউরোপে গেছে, কিন্তু শেষ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক আবিষ্কার ঘটেছে, অক্টোবর বিপ্লব মানুষকে সচেতন করেছে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে। এই বিপ্লব দেখিয়েছে যে মালিকানা যদি ব্যক্তিগত থাকে, তাহলে সব উদ্ভাবন ও উন্নয়ন চলে যায় কতিপয় ব্যক্তির হাতে, যারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে শোষণ ও লুণ্ঠনের কাজে, মুনাফার নির্লজ্জ স্বার্থে। পুঁজির মালিকেরা মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ের সঙ্গে শত্রুতা করে। তারা যুদ্ধ বাধায়, মারণাস্ত্রের উন্নয়নে বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ব্যবহার করে দাসানুদাস হিসেবে, তারা ব্যবসা করে অস্ত্র ও মাদকের।

পুঁজিবাদের কঠিন কুঠারাঘাতে প্রকৃতি আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে, ধরিত্রী উত্তপ্ত হচ্ছে। উত্যক্ত প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে। ভয়াবহ পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে জলবায়ুতে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সংখ্যা ও মাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে, এন্টার্কটিকার বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের পানির স্তর দিচ্ছে উঁচু করে, ফলে অনেক নিম্নাঞ্চল ঝুঁকিতে পড়েছে তলিয়ে যাওয়ার। প্রকৃতিকে বিরূপ করার জন্য দায়ী পুঁজিবাদী বিশ্বের বিলাস ও ভোগবাদিতা। এর ভুক্তভোগী বিশ্বের গরিব মানুষ। প্রাচুর্যের ভিতরে দারিদ্র্য পুঁজিবাদেরই অনিবার্য ফসল। পুঁজিবাদে মালিকানা থাকে সামান্য লোকের হাতে, অধিকাংশ থাকে বঞ্চিত। বঞ্চিতরা হয় দরিদ্র। পুঁজিবাদ সবকিছুকে বাজারে নিয়ে আসে। বাজারে প্রবেশাধিকার তাদেরই, হাতে যাদের টাকা আছে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে দারিদ্র্য বৈষম্য সৃষ্টি করেনি, বৈষম্যই দারিদ্র সৃষ্টি করেছে। পুঁজিবাদীরা মানুষকে ভূমি থেকে উৎপাটিত করেছে, উৎপাটিত মানুষ দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরে আশ্রয়হীন অবস্থায় ভেসে বেড়ায়।

পুঁজিবাদীরা শ্রম ব্যবহার করে, কিন্তু শ্রমিককে দাম দেয় না। শ্রমিককে তারা পছন্দ করে না, সেজন্য চেষ্টা করে শ্রমিককে কোণঠাসা করতে, পারলে অপ্রয়োজনীয় করে ফেলতে। তাই দেখা যায়, পুঁজিবাদীদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় যন্ত্রের ওপর। যন্ত্র দিয়ে তারা যুদ্ধ চালায়। যন্ত্র ব্যবহার করে মুনাফা বাড়ায়। মানুষের বুদ্ধিমত্তা যন্ত্রের কাছে স্থানান্তরিত করতে তারা ভীষণ উৎসাহী। তাদের তৎপরতা দেখে মনে হয়, আগামী বিশ্বে যন্ত্রই রাজত্ব করবে। ধরিত্রীতে একদা অতিকায় ডাইনোসররা বাস করত। পরিবর্তিত প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে অসম্ভব শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানুষ টিকে আছে তার বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার জোরে। মানুষের

সেই গুণগুলোকে পুঁজিবাদীরা চাইছে যন্ত্রের হাতে তুলে দিতে। শ্রমিককে তারা শত্রু মনে করে, যন্ত্রকে মনে করে মিত্র। পুঁজিবাদীরা তাই যন্ত্রমুখী। তাতে মানুষ নিজেই যন্ত্র হয়ে যাবে কি-না, মানুষকে সরিয়ে দিয়ে যন্ত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসবে কি-না, সে নিয়ে পুঁজিওয়ালাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। পুঁজিবাদীরা বর্তমানকেই সবকিছু মনে করে, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে মূল্য দেয় না। তারা ধারণা করে, ভবিষ্যৎ হবে তাদের বর্তমান আধিপত্যেরই রঙিন সম্প্রসারণ। পুঁজিবাদীদের হাতে পৃথিবী আজ আক্ষরিক অর্থেই বিপদগ্রস্ত।

বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চেয়েছিল পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান দুঃসহ দৌরাত্ম্যকে প্রতিহত করে একটি মানবিক বিশ্ব গড়ে তুলতে। মার্কসবাদের তত্ত্ব এবং কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর পথনির্দেশ হাতের কাছেই ছিল। সেই নির্দেশ প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে। প্যারি কমিউনে সাফল্য এসেছিল, কিন্তু স্থায়ী হয়নি। অক্টোবর বিপ্লব অনগ্রসর ও কৃষিনির্ভর একটি দেশে মার্কসবাদকে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রয়োগ করে, পুঁজিবাদকে পরাভূত করেছে। তা প্রমাণ করেছে যে বিপ্লব কেবল স্বপ্ন কল্পনার বিষয় নয়, বিপ্লব বাস্তবেও সম্ভব।[২৩] তার জন্য প্রয়োজন বাস্তব জ্ঞান, সাংগঠনিক শক্তি ও ধারাবাহিক আন্দোলন।

অক্টোবর বিপ্লব হিটলারের ফ্যাসিবাদী আক্রমণ থেকে বিশ্বসভ্যতাকে বাঁচিয়েছে। রুশরা নিজেদের দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ববাসীকে মুক্তির জন্য পথের সন্ধান দিয়েছে। একসময় পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল পেতে শুরু করেছিল, কিন্তু সত্তর বছর পর ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়ে। কারণ বাইরে থেকে পুঁজিবাদীদের উৎপাত, অবরোধ ও আক্রমণ এবং ভেতর থেকে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা। ওদিকে পুঁজিবাদীরাও মেহনতি মানুষদের ছাড় দিয়েছে, লুণ্ঠিত সম্পদের ছিটেফোঁটা ভাগ দিয়েছে, প্রলোভন দেখিয়েছে, আন্দোলনকারীদের ওপর অবিশ্বাস্য রকমের দমন-পীড়ন চালিয়েছে এবং মিডিয়াকে ব্যবহার করে সমাজতন্ত্রবিরোধী একচেটিয়া অপপ্রচার চালিয়েছে। এসবের ফলে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলো সমাজতন্ত্র থেকে দূরে সরে গেছে। আসলে সমাজতন্ত্রের পতন হয়নি, একদা সমাজতন্ত্রীরা সমাজতন্ত্র থেকে দূরে সরে গেছে মাত্র। এর ফলে পুঁজিবাদীরা উৎফুল্ল হয়ে তাদের অপকর্মের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা বলছে, মানবসভ্যতা তার চরম উৎকর্ষে পৌঁছে গেছে, মানুষের আর চাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু মানুষের ক্ষোভ ও দুর্দশা জানিয়ে

[২৩] দেখুন, হায়দার আকবর খান রনো, *অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১৭।

দিয়েছে সভ্যতা নতুন বর্বরতায় গিয়ে পৌঁছেছে। এই ব্যবস্থা চললে সভ্যতার তো অবশ্যই, পৃথিবীর ধ্বংসই ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে। অত্যাচার, নিপীড়ন, লুণ্ঠন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাচুর্যের পৃথিবী অভাব, বেকারত ও সংঘর্ষের পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে। বলা হচ্ছে নৈতিকতার অধঃপতন ঘটেছে। কিন্তু আসল সত্য হলো এই যে পুঁজিবাদ তার নিজস্ব নৈতিকতাই সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এই নৈতিকতা মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেয় না, চেনে শুধু মুনাফা, ভোগ-লালসায় অস্থির থাকে, মানবিক বিবেচনাগুলোকে পদদলিত করে।

সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্যুত হলে সমাজের কী দশা হয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে রাশিয়ায়। মেয়েরা সেখানে যে মাত্রায় মুক্তি পেয়েছিল, পুঁজিবাদী বিশ্বে তা ছিল অকল্পনীয়। বিচ্যুত রাশিয়াতে দেখা গেছে সেই মেয়েদের একাংশ আশ্রয়হীন হয়ে পণ্য হিসেবে নিজেদের দেহকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে ইউরোপ, আমেরিকায়। যে অধ্যাপক গবেষণা করতেন, দেখা গেছে, তিনি ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন। চীন যখন সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্যুত হলো, তখন টের পাওয়া গেল, তারা ভয়ংকর রকমের জাতীয়তাবাদী হয়ে পড়েছে। এই জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদী। তার দুর্বার প্ররোচনায় চীন এখন ফ্যাসিবাদী তৎপরতাকে সমর্থন দিচ্ছে। সেখানে পুঁজিবাদী স্বার্থ সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। বিশ্বের সর্বত্র সবাই এখন স্বার্থের একই আদর্শে দীক্ষিত। সেই আদর্শ পুঁজিবাদ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহ যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।

পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রীদের ঐক্যকে যতটা ভয় করে, তত ভয় অন্য কোনো কিছুকেই করে না। পুঁজিবাদের বড় একটা কাজ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা, মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করা, জীবনসংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত রাখা, ছোট ছোট সমস্যাগুলোকে বড় করে তোলা। এসব কাজে তার উৎসাহের কোনো কমতি নেই। এগুলো সে করেছে নিজস্ব শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে। পতন আসন্ন দেখে এখন সে বেপরোয়া। হাতে যত অস্ত্র আছে, হিংস্ররূপে তা প্রয়োগ করছে। ব্যবহার করছে মিডিয়াকে।

সভ্যতার বিবর্তনে ক্ষমতা এক শ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণির হাতে গেছে। দাসমালিকের কাছ থেকে ক্ষমতা চলে গেছে সামন্তপ্রভূদের হাতে, সামন্তবাদীদের হটিয়ে দিয়ে পুঁজিবাদীরা এসেছে। কিন্তু এই তিনটি ব্যবস্থার ভেতরে মিল আছে একটি জায়গায়, সেটি হলো সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা।

তিনটি ব্যবস্থার কোনোটিই ব্যক্তিমালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেনি। মনিবের দাসত্ব, ভূস্বামীর দাসত্ব, মজুরি দাসত্ব এগুলো নামের হেরফের মাত্র। দাসত্বের জোয়াল থেকে মেহনতিদের মুক্তিদানের কাজটি করেছিল বিভিন্ন সময়ের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আদিম সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, সেটি ছিল অত্যন্ত দরিদ্র একটি সমাজ, মানুষ নির্ভর করত ফলমূল আহরণ এবং মাছ ও পাখি শিকারের ওপর। উদ্বৃত্ত থাকত না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে দরিদ্র নয়, সর্বাধুনিক উন্নত পৃথিবীতে।

কাজেই সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন, সমাজতন্ত্র অনিবার্য। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পৃথিবীকে ধ্বংস হতে দেবে না। তারা নিজেদের এবং পৃথিবীকে রক্ষা করবে। বিপ্লব অনিবার্য বৈজ্ঞানিক কারণেও। সভ্যতা স্থির হয়ে বসে থাকে না, সে এগোয়। দাসব্যবস্থা ও সামন্তব্যবস্থা পার হয়ে পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এসেছে। আগের দুটির মতো এই ব্যবস্থাও বদলাবে, বদলাবে ভেতরের সংকটে, বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে তা বদলাবে। অরাজকতার ভিতর দিয়ে নাকি সুশৃঙ্খলভাবে। সেটা নির্ভর করছে আন্দোলন ও প্রতিরোধের চরিত্র ও শক্তির ওপর। বিবেকবান মানুষের কর্তব্য সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করা।

৬. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলাফল

বিশ্বমানবের মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। একটা সময় পর্যন্ত এসব বিপ্লবের প্রভাব ও শক্তি আরও সংহত হয়েছে, পূর্ব ইউরোপজুড়ে গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, চীনের বিপ্লব পৃথিবীর বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে সমাজতন্ত্রের আওতাভুক্ত করেছে। লাতিন আমেরিকায় ক্ষুদ্র দ্বীপ কিউবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কেবল জয়যুক্তই করেনি, লাতিন মহাদেশে সৃষ্টি করেছিল অভূতপূর্ব আলোড়ন। ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাবহর নামিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রসার ঠেকাতে চলেছে মরণপণ মার্কিন প্রয়াস। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জোরদার হয়েছে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম। ঔপনিবেশিক কাঠামো যেহেতু পুঁজিবাদী, তাই জাতীয় মুক্তির এই সংগ্রাম মিত্র হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই সম্পৃক্ত হচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাথে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এমনই অনুকূল আবহে এগিয়ে চলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহ।

কিন্তু সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও মানব সম্পর্ক যে বিপুল পরিবর্তন দ্বারা আলোড়িত হয়েছে, সমাজতন্ত্র যেভাবে মুছে গেছে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে, তেমন কিছু তখন কেউ ভাবতে পারেনি। তবে কোনো কোনো দার্শনিক, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকেরা[২৪] এ ক্ষেত্রে নানা ধরনের বার্তা দিয়ে গেছেন, রাষ্ট্র ও রাজনীতির বৃত্তে তা হয়তো উপেক্ষিত হয়েছে কিংবা বিবেচিত হয়েছে অপাঙ্‌ক্তেয় হিসেবে। জর্জ অরওয়েলের ভবিষ্যৎবাদী উপন্যাস *নাইনটিন এইটিফোর*[২৫] এমনই এক রচনা যা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর কঠোর সমালোচনামূলক। প্রকাশকালে এই উপন্যাস সমাজতন্ত্রবিরোধী সাহিত্য হিসেবে গণ্য হয়। সেই উপন্যাস এখনো গুরুত্ব হারায়নি। পুঁজিবাদী আধুনিক সমাজে ব্যক্তির ওপর সার্বিক নজরদারি এবং বাজার অনুগত ভোগবাদী সত্তায় তার রূপান্তরের যে মহাপ্রয়াস আজ চলছে, জর্জ অরওয়েল হালের সেই বাস্তবতাই তুলে ধরেছেন। সোভিয়েত বিপ্লবের অসাধারণ রূপকার হয়েছেন শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। শ্রমিক, কৃষক ও বঞ্চিত মানুষের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সভ্যতার বিকাশের নতুন পথ উন্মুক্ত করেছিল এবং সাবেকি ও পোষাকি সব আড়ম্বর ঘুচিয়ে নবযুগের উপযোগী শিল্পরূপ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তারা। কিন্তু সে সময় সমাজতন্ত্রীরা এসব বার্তা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেনি।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই সংকটের লক্ষণ নানাভাবে ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে জনপ্রতিক্রিয়া রুদ্ররূপ ধারণ করলে সমাজতন্ত্রী সরকারের পক্ষে রাস্তায় নামে সোভিয়েত ট্যাংক ও সৈনিক। এই বাস্তবতা পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিতে গভীর আত্মজিজ্ঞাসার জন্ম দেয়, পার্টি পরিত্যাগ করেন বিপুলসংখ্যক সদস্য। পরে সোভিয়েত-চীন বিরোধিতা বয়ে এনেছিল আরেক অভিঘাত। ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রের শক্ত শাসন শিথিল করার উদ্যোগ ক্ষণকালের জন্য নববসন্তের জন্ম দিয়েছিল, যা আবারও দমন করা হয় জবরদস্তির সঙ্গে। অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধি সমাজতন্ত্রকে বিশ্বরাজনীতিতে অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল। ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মোচন করে তৃতীয় বিশ্বের জাগরণে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থন বিশ্ব পটভূমিকায় ইতিবাচক প্রভাব

---

[২৪] ফরাসি বিপ্লবের স্বল্পকাল সময়ের মধ্যেই ফ্রাসোয়া-নোয়েল ব্যাবুফ, এটিনে-গ্যাব্রিয়েল মোরেল, ফিলিপ বোনার্তি এবং অগাস্ট ব্লাঙ্কিদের মতো কর্মী ও তাত্ত্বিকগণ ফরাসি শ্রম ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করলেও এর সফলতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ব্রিটেনে টমাস পেইন তাঁর *Agrarian Justice* নামক গ্রন্থে কর আদায়কারীদেরকে গরিবদের চাহিদা অনুসারে প্রদানের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন, সাথে সাথে এর বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয়ও প্রকাশ করেন। চার্লস হল *ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের জনগণের ওপর সভ্যতার প্রভাব* গ্রন্থে তাঁর সময়ের দরিদ্র শ্রেণির ওপর পুঁজিবাদের প্রভাবকে নিন্দামূলক হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এর অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার কথা বলেন। টমাস স্পেন্সের কল্পলৌকিক প্রণালীসমূহে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সফল অস্তিত্বের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

[২৫] দেখুন, George Orwell, *Nineteen Eighty-Four*, Secker & Warberg, UK, 1949.

সঞ্চার করেছিল। এই শক্তি বিন্যাসের সুফল অবশ্য অনেক দেশই ভোগ করেছিল, অনেক দেশই অনুপ্রাণিত হয়েছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে। দেশে দেশে অনেক মানুষই নিজেদের ভার অর্পন করেছিল সমাজতন্ত্রের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের ওপর। প্রায়শ তা রূপ নিয়েছিল প্রশ্নহীন আনুগত্যে, কেউ রুশ ধারায়, আবার কেউ কেউ চৈনিক অনুসারীরূপে।

বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল নিপীড়িত জনগণের ভালবাসা ও আস্থা নিয়ে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ প্রয়াসে চিন্তার বৈচিত্র্য, দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ক্রমেই চিহ্নিত হলো বিপ্লবের শক্তি হরণকারী হিসেবে।[২৬] পার্টি হয়ে উঠতে লাগল সর্বশক্তিমান ও একদেশদর্শী। সমাজের তথা মানুষের ওপর নির্ভরতার বদলে রাষ্ট্রযন্ত্র হয়ে উঠল নিয়ামক, রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব দ্বারা পার্টি হয়ে উঠতে চাইল শক্তিমান ও পীড়নমূলক। সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল মহৎ আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। রাষ্ট্রের এই দ্বৈত সত্তা, একদিকে মুক্তবাণী, অন্যদিকে অমানবিকতা, সম্যক অনুধাবন করা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারীদের পক্ষে হয়ে উঠেছিল কঠিন। ১৯৮৯ সালে বার্লিন দেয়াল ভেঙ্গে পড়ল, ১৯৯১ সালে ভেঙ্গে পড়ল সোভিয়েত সাম্রাজ্য, বিলুপ্ত হলো সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন, সাম্যের বিশ্বব্যবস্থা। এই পতন সমাজতন্ত্রের কিংবা সাম্যের মতাদর্শের নয়, সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিশাল কর্মযজ্ঞে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মত-পথের সমন্বয় করে চলার ব্যর্থতায় ইতিহাসের এক পর্যায়ে এমন পরিণতি লাভ করেছে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, সমাজের বিন্যাস ও রাষ্ট্রের রূপ নিয়ে কত সাধনাই না মানবসমাজ করে চলেছে, এর সরল একরৈখিক কোনো রূপ নেই।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহের সফলতা স্থায়ী রূপ পায়নি বটে, তবে মানুষের মুক্তিসাধনার পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সেই অভিজ্ঞতার বিশাল ভান্ডার মেলে ধরেছে বিপ্লবের অভিযাত্রা। মুক্তির যে স্বপ্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখিয়েছিল, যাত্রাপথেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবে সাম্য ও মুক্তির স্বপ্নের কোনো মৃত্যু নেই। সাম্যের চেতনায় মানবিক সমাজ নির্মাণের সাধনা অব্যাহত থাকবে নানাভাবে, নানা পথে। এই প্রেরণা মেলে বিভিন্ন সময়ের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলো হতে।

---

[২৬] দেখুন, মফিদুল হক, 'স্বপ্নের সমাজ ও উৎপীড়ক বাস্তব', *সমাজতন্ত্রের সংকট: নানা চোখে*, (সম্পা.) পারভেজ হোসেন, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২, পৃ. ১৩১-১৩৪।

৭. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মুক্তির ধারণা

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানুষকে অনেক বড় স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা ও সুযোগ করে দেয়। পৃথিবীর সব প্রান্তে সব রকম বৈষম্য ও নিপীড়নবিরোধী সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহ নতুন মানবিক সমাজের সন্ধান দেয়। কেননা সমাজতন্ত্র একটি সামাজিক ও নৈতিক লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত হয়।[২৭] বর্তমানে সমাজব্যবস্থা জাতিগত, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক সংঘাত, ঘৃণা ও বিদ্বেষে জর্জরিত। মানুষ অনেক ক্ষুদ্র গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তার স্বাধীনতা চরমভাবে সীমিত হয়ে গেছে। বর্তমান বিশ্ব দেখছে যুদ্ধ, সন্ত্রাস আর মানুষবিদ্বেষী চরমপন্থার অবিরাম বিস্তার। জবরদখল, লুণ্ঠন, আগ্রাসন, আধিপত্য বিস্তার, কিছু লোকের অতিভোগ আর বহুজনের দুর্দশায় বিশ্ব এখন অস্তিত্বের সংকটে। অথচ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলো ছিল সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মানুষের সচেতন ও সংগঠিত প্রচেষ্টা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই ধারণাই বিশ্বকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এবং এখনো করছে। বিপ্লবমুখী ক্ষমতার পরিবর্তন যে শুধু কতিপয় দেশ বা ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সমাজ ও অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন নিশ্চিত করেছিল তা নয়, বহু দেশে মুক্তির লড়াই তাতে গতি ও দিশা পেয়েছিল।

কার্ল মার্কসের বিশ্লেষণে দেখা যায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি কীভাবে মানুষের জীবন, তার জগৎ, প্রাণ-প্রকৃতি, তার মেধা, মনন, শরীর এমনকি স্বপ্ন দখল করে, নিজের মতো করে গড়ে নেয় বাজার ও মুনাফার উপযোগী করতে। দাসত্ব শৃঙ্খলকে মোহময় চাদর দিয়ে ঢেকে রাখে, মুনাফার দামামায় মানুষ হয়ে পড়ে তুচ্ছ। মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মানুষ থেকে, সমাজ থেকে। মানবিকতা, সামষ্টিক বোধ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। মার্কস এই ব্যবস্থা অতিক্রম করে ব্যক্তি মানুষ ও সামষ্টিক মানুষের মুক্তির পথ ও লক্ষ্য হাজির করেন। তিনি ঘোষণা করেন মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজের কথা। সে অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহের প্রতিশ্রুতি ছিল মানুষকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেয়া এবং তাকে একটি মুক্ত ও স্বাধীন সমাজব্যবস্থা উপহার দেওয়া।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম পর্যায়েই সমাজতন্ত্রমুখী দেশসমূহে নীতিগত অবস্থানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয় তার মধ্যে ছিল: সব নাগরিকের পূর্ণ কর্মসংস্থান, কাজ ও জীবনের নিরাপত্তা, সর্বজনীন চিকিৎসা সুবিধা, সবার জন্য নিশ্চিত আবাসন, নারীর ভোটাধিকার,

[২৭] অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, 'সমাজতন্ত্র কেন?', (সম্পা.) শরীফ শমশির, *সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে*, ঢাকা: গণপ্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ৪৭।

গার্হস্থ্য শৃঙ্খল থেকে নারীর মুক্তির আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষার সকল পর্যায়ে নাগরিকদের প্রবেশাধিকারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ, বছরে সবেতনে বিনোদন ছুটি, দীর্ঘ সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি, রাষ্ট্রীয় খরচে শিশু যতন কেন্দ্র ইত্যাদি। এসব কর্মসূচির সাফল্যের কারণে পুঁজিবাদী কেন্দ্র দেশগুলোতেও এর পক্ষে প্রবল জনমত তৈরি হয়। বিশেষত ১৯৩০ এর দশকের মহামন্দায় যখন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে নিশ্চিত, নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের খবর পশ্চিমের মানুষের কাছ থেকে আড়াল করা সম্ভব হয়নি। তাই ১৯৩০ এর দশক থেকে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত পশ্চিমা বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী ছিল, কল্যাণমূলক বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করতে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকালে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ অঞ্চল ছিল উপনিবেশ বা প্রায় উপনিবেশ। রুশ বিপ্লব থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম এবং ক্রমে একটি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের উদ্ভব এই পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিভিন্ন উপনিবেশ, আধা উপনিবেশসহ নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তির সংগ্রামে তা হয়ে ওঠে বড় অনুপ্রেরণা ও ভরসাস্থল। এই শক্তি নিয়ে পৃথিবীর মানুষ বৈষম্য ও নিপীড়নের বহু জিঞ্জির ভেঙ্গেছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণমূলক ও কর্তৃত্বপরায়ণ কোনো ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্র বলা যায় না। সমাজতন্ত্রের ধারণার সাথে এগুলো অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই পথেই গেছে, আমলাতান্ত্রিকতায় আড়ষ্ট হয়েছে, কর্তৃত্বমুখী ব্যবস্থার কারণে ব্যক্তিমালিকানার নতুন ধরন তৈরি হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরেই নতুন মালিক ও শাসক শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। তা হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামোর মধ্যে, পার্টির নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায়েই। বিপ্লব উত্তর সমাজে যদি নতুনভাবে শ্রেণিস্বার্থের উদ্ভব ঘটে, যদি বৈষম্য সৃষ্টির ব্যবস্থা বাড়তে থাকে, যদি জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা উত্তরোত্তর শৃঙ্খল হিসেবে রূপ নিতে থাকে, যদি ব্যক্তিমালিকানার প্রতি ঝোঁক বাড়তে থাকে, তাহলে সমাজতন্ত্রের মূল চেতনাই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

দুর্নীতি, বৈষম্য ও নিপীড়ন, যুদ্ধ সমরাস্ত্রসহ ধ্বংস খাতের বিকাশ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সাথে অবিচ্ছেদ্য। এগুলো ছাড়া পুঁজিবাদ টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু এসব উপাদানের সাথে সমাজতন্ত্রের সন্ধি চলে না। সে কারণে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ হলেও যদি সেই সমাজে কোনো না কোনো কারণে বৈষম্য, নিপীড়ন বা দুর্নীতির প্রভাব বা উপস্থিতি বাড়তে থাকে আর তা মূলধারাকে

গ্রাস করে ফেলে, তাহলে সেখানে পুঁজিবাদের অনুকূল ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে বাধ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে সেটাই হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা বিশ্বের রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ ও নীতিতত্ত্ববিদদের কতগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। তারা ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন পুঁজিবাদই মানব ইতিহাসের শেষ পর্যায় কি-না?[২৮] বৈষম্য, নিপীড়ন আর বর্বরতাই মানুষের জন্য স্বাভাবিক নিয়ম বা প্রাকৃতিক বিধি হয়ে উঠবে কি-না? আরও প্রশ্ন উঠতে পারে যে বৈষয়িক উন্নতির জন্য যদি সমাজতন্ত্রও পরিবেশবিনাশী প্রবৃদ্ধির পথ গ্রহণ করে, তাহলে অন্য ব্যবস্থার সাথে তার পার্থক্যই বা কী থাকে? প্রশ্ন ওঠে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন কি পুঁজিবাদকে অপ্রতিরোধ্য অনিবার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেনি?

এসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতে শুধু এটুকু বলা যায় যে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা ঘেরাও হয়ে থেকে একটি দেশে পাল্টা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে নেওয়া কঠিন। তাতে তার অন্তর্গত ক্ষমতার যথাযথ বিকাশ ও প্রয়োগ সম্ভব হয় না। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ এবং পরে অবিরাম অন্তর্ঘাত, হিটলারের জার্মানির সর্বাত্মক আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ, পরে মার্কিন পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, সমুদ্র ও মহাকাশ নিয়ন্ত্রণে রাখায় সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে প্রতিযোগিতা, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মোকাবিলা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। এই মোকাবিলা করতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও অনেক রকম পরিবর্তন আনা হয়েছে, আনার বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে। এর সবগুলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। অব্যাহত সামরিকীকরণ, সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, গোয়েন্দা সংস্থার সম্প্রসারণ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে যে কোনো মূল্যে উৎপাদন বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এসব উদ্যোগ ক্ষুদ্র কর্তৃত্ববাদী গোষ্ঠী তৈরি করেছে, বৈষম্য বেড়েছে, প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ আক্রান্ত হয়েছে। সমাজতন্ত্র কখনো জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া বিকশিত হতে পারে না। মানুষ যদি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, রাষ্ট্র যদি কর্তৃত্ববাদী হয়, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র দিয়ে যদি পার্টি ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, তাহলে সেখানে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধ শক্তির বিকাশ ঘটতে বাধ্য। পার্টি ও সমাজে যথাযথ মতাদর্শিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই দুর্বল হয়ে যাওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নে তাই হয়েছে।

[২৮] দেখুন, Karl Kautsky, *Ultra-Imperialism*, New Left Review, No. 59, January-February 1970.

বৈষম্য, নিপীড়ন ও শ্রেণিস্বার্থভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তির লড়াই মানুষের দীর্ঘকালের। বিভিন্ন পর্বে এর সুদূরপ্রসারী সাফল্য আছে। আবার আছে পশ্চাদপসরণও। এই যাত্রা সরলরৈখিক নয়, এর অনেক আঁকাবাঁকা পথ আছে। মানুষের ইতিহাস কোনো নতুন ব্যবস্থা, এমনকি সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণেও বারবার পশ্চাদপসরণ দেখা গেছে। যেমন, ফরাসি বিপ্লবের পর বিপ্লবীরা টিকতে পারেনি, আবারও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কয়েকশ বছরের ওঠানামার পরই কেবল প্রাক-পুঁজিবাদী নানা ব্যবস্থার ওপর পুঁজিবাদ নিজের বিজয় নিশ্চিত করতে পেরেছে। সেই তুলনায় সমাজতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অল্পদিনের। প্রথম চেষ্টায় প্যারি কমিউন টিকে ছিল ৭২ দিন, পরেরটি অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকেছে প্রায় ৭২ বছর।[২৯]

পুঁজিবাদ অন্তর্গতভাবে দখলদারি ব্যবস্থা। শুধু মানুষ নয়, প্রাণ-প্রকৃতির সবকিছুই তার মালিকানা ও মুনাফার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে পুঁজিবাদ যত বিকশিত হয়েছে, বিশ্বের অস্তিত্ব তত বিপন্ন হয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্র সর্বজনের মালিকানা ও কর্তৃত্বের ধারণার ওপর দাঁড়ায়। সর্বজনের নদী, বাতাস, বন, পাহাড়, প্রাণ-পরিবেশ দখল বা বিনাশ তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যদি সমাজতন্ত্র নামাবলি গায়ে দিয়ে কোনো ব্যবস্থা পুঁজিবাদের মতো মানুষ ও প্রকৃতি দখল করার দিকে যায়, তাহলে তাকে পুঁজির কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। সমাজতন্ত্রের বিকাশে মানুষের অংশগ্রহণ ও কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে গেলেই এ অবস্থা হতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে তাই হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে বিশেষ কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ কথা নয়, হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে, চীনের পরিবর্তনে সমাজতন্ত্রপন্থী রাজনীতির অবসান হয়েছে। মানুষের লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ হিসেবে কিংবা সমাজতন্ত্রের মডেল হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের নাম আর সেভাবে উচ্চারিত হবে না। কারণ, সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তো নেই-ই, খোলস থাকলেও সেই চীনও আর টিকে নেই। চীন বর্তমান যে পথ ধরেছে তা সংকটজীর্ণ দিশাহারা পুঁজিবাদী বিশ্বের নতুন ভরসা। একুশ শতকের প্রথম দশকের শেষার্ধের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের সময় বিশ্বের নামকরা অর্থনীতিবিদদের বরাত দিয়ে ইকোনমিস্ট বলেছিল যে, আগে আমরা ভাবতাম কেবল পুঁজিবাদই চীনকে বাঁচাতে পারে, কিন্তু এখন আমাদেরকে বলতে হবে যে কেবল চীনই

[২৯] আনু মুহাম্মদ, 'প্যারি কমিউন টিকে ছিল ৭২ দিন, সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকল ৭০ বছর', (সম্পা.) পারভেজ হোসেন, *সমাজতন্ত্রের সংকট: নানা চোখে*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২, পৃ. ১৩৫।

পুঁজিবাদকে বাঁচাতে পারে।[৩০] সোভিয়েত উত্তর রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারতের শাসকগোষ্ঠী এখন দেশে দেশে ঐক্য ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে আধিপত্য বিস্তারে হিংস্র ভূমিকায় লিপ্ত। তাদের আগ্রাসী বাণিজ্যিক ভূমিকা তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের জন্য এক বড় ধরনের হুমকি।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে পুরনো কাঠামোবদ্ধ ও নিশ্চয়াত্মক কোনো ধারণা নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। নিজেদের সক্ষমতা বিশ্লেষণের দক্ষতা দরকার হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সাফল্য ও ব্যর্থতা, অগ্রসরতা ও পশ্চাদপসরণ, জনগণের জীবনমান ও নিরাপত্তা, সমাজতন্ত্রী পার্টির বিপ্লবী ভূমিকা ও অধঃপতন, শক্তি ও দুর্বলতা–সবকিছুই এখন মানুষের অভিজ্ঞতার অংশ। সমাজতন্ত্র নামের মানবিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার একটি পর্ব শেষ হয়েছে, কিন্তু মানুষের অনুসন্ধান, চেষ্টা ও লড়াই শেষ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-দানবের বিরুদ্ধে লড়াই, প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার লড়াই, শ্রেণি-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব ধরনের বৈষম্য ও নিপীড়নবিরোধী লড়াই দুনিয়াজুড়ে অবিরাম চলছে। প্রতিমুহূর্তে মানুষের চিন্তা ও সক্রিয়তায়, লড়াইয়ে নতুন শক্তি যোগ হচ্ছে। এর মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজের প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে।

পুঁজিবাদে আমরা সঠিক অর্থে একটি রাষ্ট্রকে পাই, এক শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণিকে শোষণের, সংখ্যাল্প কর্তৃক সংখ্যাগুরুদের দমনের একটা বিশেষ যন্ত্র হিসেবে। শোষক শ্রেণি কর্তৃক সংখ্যাগুরু শোষিতদের নিয়মিত দমনের মতো একটা ব্যাপার সফল হতে হলে দরকার দমনের চূড়ান্ত হিংস্রতা ও পাশবিকতা, দরকার রক্তের একটা সমুদ্র, মানবজাতিকে যেখানে খুঁড়িয়ে চলতে হয় দাসত্বে, ভূমি দাসত্বে, মজুরি দাসত্বে। পুঁজিবাদী সমাজে আমরা পাই কাটাছেঁড়া, হতচ্ছাড়া, জাল করা একটা গণতন্ত্র, যা কেবল ধনীদের জন্য, সমাজের অল্পাংশের জন্য। গোটা পৃথিবী হতে শোষণ, কর্তৃত্ব, নিপীড়ন ও আগ্রাসন উৎখাত করতে হলে প্রাথমিক কাজ হিসেবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করতে হবে যাকে মার্কসীয় পরিভাষায় বলা হয় প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব। এর ব্যাখ্যায় ফ্রেডরিক এঙ্গেলস বলেন,

> পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সমাজের খুব স্বল্প মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। আর সে জন্যই তারা বেশিরভাগ মানুষের ওপর প্রভূত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্মম পন্থার আশ্রয় নিয়ে থাকে। তবে যদি একবার সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সকলের স্বার্থে শুরু হয়ে যায় তবে দ্রুত পুলিশ ও সেনাবাহিনী বিলোপ হতে থাকবে এবং এর সাথে সাথে পুঁজিবাদী

[৩০] দেখুন, প্রথম আলো, ০৫ নভেম্বর, ২০১৭।

সমাজে চলমান শোষণ, নিপীড়ন ও বৈষম্য ক্রমান্বয়ে তিরোহিত হয়ে যাবে। এছাড়া পুঁজিবাদী সমাজের প্রচলিত ভয়ভীতি প্রদর্শন, শক্তি প্রয়োগ থাকবে না, সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাটাই পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সকলের স্বার্থে সকলের প্রয়োজনে।[৩১]

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ দেশে দেশে দারিদ্র্য, বৈষম্য, যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের বিস্তার ঘটিয়েছে, পরিবেশ ধ্বংস করে পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। তাই সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন, পুঁজিবাদ নয়, সমাজতন্ত্রই মানবজাতির মুক্তির পথ। সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা দেশের শাসক শ্রেণি জনগণের ওপর এক ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম রেখেছে। জনগণের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই। মানবজাতির মুক্তির জন্য জনগণের হাতে ক্ষমতা আনতে হবে। কৃষক, শ্রমিক, নিপীড়িত জাতি ও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দেশে দেশে বিরাজমান পুঁজিবাদনির্ভর পদ্ধতিতে জনগণের মুক্তি হবে না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এ ধরনের শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করতে হবে।

৮. অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলাফল

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রত্যয় অসাম্য। অসাম্য বা অসমতা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার কারণ যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি ফল। এসব প্রক্রিয়ার কিছু ভাল, কিছু খারাপ। খারাপ প্রক্রিয়াগুলো থেকে ভাল প্রক্রিয়াগুলোকে আলাদা করার মাধ্যমেই অসাম্যের ফল উপলব্ধি করা যায় এবং বোঝা যায় তা নিয়ে কী করতে হবে। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে মনোরঞ্জনবাদের[৩২] ব্যাপক প্রভাবের মধ্যেও অসাম্যের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনায় ছিল। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত বা উৎসাহিত করতে অসাম্যের ভূমিকা, গণতন্ত্রের অবক্ষয়ে অসাম্যের প্রভাব, অসাম্যের অশুভ পরিণতি, অসাম্য অনিবার্য কি-না, এটি কতটুকু পরিমাণে আমাদের সহ্য করতে হবে–ইত্যাদি প্রশ্নগুলো নিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নীতিদার্শনিক পরিমন্ডলে ব্যাপক আলোচনা চলেছে।

---

[৩১] Fredrich Engels, *Anti-Duhring*, Moscow: Progress Publishers, 1975, pp.321-322.

[৩২] মনোরঞ্জনবাদ হলো জনগণের ইচ্ছার ওপর প্রভাব খাটানোর এক মানসিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় জনগণকে স্বল্প সময়ের জন্য আনন্দ বা মানসিক সুখ প্রদান করা হয়। এই আনন্দদান একটি কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রসমূহের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ফলাফল অনুমানপূর্বক সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে, ভুল তথ্যের ভিত্তিতে জনগণকে বিশেষ কোনো একটি ধারা বা চিন্তা-চেতনার দিকে পরিচালিত করা হয় এই বলে যে, এটিই তাদের জন্য কল্যাণকর। এখানে প্রচারিত তথ্যের সত্যতা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য মনোবল বাড়ানোর জন্য এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব তথ্যসমূহ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যেসব ক্ষেত্রে সত্য হয় পরবর্তীতে সেগুলোও প্রমাণিত হয় অন্য কোনো বৃহদাকার স্বার্থসিদ্ধির কৌশল হিসেবে। এসব ক্ষেত্রে যেসব দাবি করা হয় বা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, প্রকৃত ফলাফল তার উল্টো হয়।

অসাম্য আর অন্যায্যতাকে এক বলে বিবেচনা করা যায় না। ধনী দুনিয়ায় যত রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা গেছে তার সবই অন্যায্যতার কারণে, অসাম্যের কারণে নয়। কিছু কিছু প্রক্রিয়া আছে, যেগুলোতে স্পষ্ট অসাম্য সৃষ্টি হয় কিন্তু সেগুলোকে সাধারণভাবে ন্যায্য প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখা হয়। আবার অনেক প্রক্রিয়া আছে, যেগুলো স্পষ্টতই ন্যায্য কিন্তু সেগুলো যথার্থই অসন্তোষ ও ক্ষোভের জন্ম দেয়। পুরো মানবজাতির জন্য উপকারী পণ্য ও সেবা চালু করার মধ্য দিয়ে যদি কোনো সৃজনশীল উদ্যোক্তারা ভীষণ ধনী হয়ে যায়, তাহলে তাতে আপত্তি করা কঠিন। আজকের দিনে আমরা যেমন অসমতা দেখছি, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়গুলোর সৃষ্টি হয়েছিল ১৭৫০ সালের দিকে শুরু হওয়া শিল্পবিপ্লব ও স্বাস্থ্যবিপ্লবের ফলে। শুরুর দিকে এই প্রক্রিয়া থেকে উপকৃত হয়েছে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অল্প কয়েকটি দেশ। তারপর থেকে পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি মানুষের জীনবমান ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায়ের মাধ্যমে ধনী হওয়া স্পষ্টতই অন্যায্য এবং এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ-অসন্তোষ যথার্থ, আর বিশ্বব্যাপী তা বাড়ছেই। ইউরোপ-আমেরিকার ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মনে করা হয় যে, পুঁজিবাদ বা বাজার অর্থনীতির ফলাফলগুলো যথার্থ ও ন্যায্য। তারা মনে করে, বাজারব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ জবরদস্তিমূলক ও অন্যায্য। তারা সংখ্যালঘু বা অভিবাসীদের মতো বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ সরকারি কর্মসূচিগুলোর বিরোধিতা করে।

মানুষের অসন্তোষ বাড়ার আরও একটা কারণ আছে। তা হলো, বিগত প্রায় অর্ধশতক ধরে মধ্যম প্রকৃত মজুরি (মূল্যস্ফীতি সমন্বয়সহ) স্থবির হয়ে আছে। মাঝারি আয় ও শীর্ষ আয়ের ব্যবধানের দুই ধরনের ব্যাখ্যা আছে। প্রথম ব্যাখ্যা হচ্ছে, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মতো নৈর্ব্যক্তিক ও অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়াগুলোর ফলে নিম্ন দক্ষতার শ্রমিকের শ্রমের মূল্য কমে যায় আর উচ্চশিক্ষিতদের আয় বাড়ে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, মাঝারি আয়ের স্থবিরতা আসলে ধনীদের আয় বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল। এই মতের লোকেরা মনে করেন, ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে অন্য সবার বঞ্চনার বিনিময়ে। যদিও বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে চিরাচরিত কর্মব্যবস্থাগুলো ভেঙ্গে পড়েছে, তবুও উভয় প্রক্রিয়াতেই সব মানুষের উপকারের সম্ভাবনা আছে। কী ধরনের নীতি ও প্রক্রিয়ার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও শ্রমজীবি শ্রেণির আয় স্থবির হয়ে আছে এবং তা কী মাত্রায়, তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা কঠিন।

আরেকটি প্রাসঙ্গিক সমস্যা হচ্ছে, অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বাজার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাওয়া। যেমন, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো একীভূত হওয়ার কারণে চিকিৎসার খরচ দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু সেখানকার কর্মীদের মজুরি বাড়েনি। আবার বছরের পর বছর ধরে রয়েছে সেবাকর্মীদের সংকট। এই প্রবণতার অন্তর্নিহিত কারণ হলো উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া। সর্বোপরি উদ্ভাবন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা করার চেয়ে নীতিগত সুবিধা নিয়ে ও ব্যবসায় একচেটিয়াত্ব প্রতিষ্ঠা করে মুনাফা করা সহজ। ব্যাপক জনসমর্থন থাকলেও ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো সব সময়ই কঠিন, যার কারণ হলো ধনী প্রতিষ্ঠান ও দাতাদের প্রভাব এক রকম নয়।

পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার কারণ হলো, অধিকাংশ দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ শ্রমিক 'নন-কমপ্লিট ক্লজ'[৩৩] নামক একটা আইনের শিকলে বাঁধা পড়ে আছে। এই আইনের কারণে কর্মীরা অন্য প্রতিষ্ঠানে একই রকমের চাকরি নিয়ে যেতে পারে না। এতে শ্রমিকদের দর কষাকষির ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। অনেক দেশে আবার কাজের অধিকার আইন করা হয়েছে। এই আইনে যৌথ দর-কষাকষির ব্যবস্থা নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে। ফলে ব্যবসায়ীদের সাথে ভোক্তা ও কর্মীদের বিবাদ এখন আদালতের বাইরে সালিশির মাধ্যমে সমাধান হচ্ছে, যেটা ব্যবসায়ীদের জন্য ক্রমেই অনুকূল হয়ে উঠছে।

আউটসোর্সিং[৩৪] নামক সমস্যাটিও এখন প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো বেতনভুক্ত ও পূর্ণকালীন কর্মীদের সরিয়ে দিয়ে স্বাধীন ঠিকা কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। খাদ্য পরিবেশনকারী, দারোয়ান, রক্ষণাবেক্ষণকর্মীরা একসময় কোম্পানীর অংশীদার বা স্থায়ী বেতনভুক্ত ছিলেন। কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন সার্ভিস কোম্পানির হয়ে কাজ করেন। এই কোম্পানিগুলো এখন খুবই প্রতিযোগিতাপূর্ণ নিম্নমজুরির শিল্পের কাজ করছে। ফলে তারা কর্মীদের

---

[৩৩] নন কমপ্লিট ক্লজ হলো কোনো কোম্পানি এবং কর্মচারীদের মধ্যে চুক্তিনামার একটি শর্ত, যে শর্ত মোতাবেক কোম্পানী যদি কোনো কারণে কোনো কর্মচারীকে চাকুরীচ্যুত করে তাহলে চাকুরীচ্যুতির পর সে কর্মচারী তার কর্মকালীন সময়ে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে যেসব ভোক্তার সাথে পরিচিত হয়েছে বা যেসব ভোক্তাকে পরিসেবা দিয়েছে বা অনুরূপ অন্য কোনো কোম্পানির মালিক বা প্রতিনিধির সাথে মিথষ্ক্রিয়া হয়েছে, তাদের কাছে নতুন চাকুরী বা অনুরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অনুরোধ করতে পারবে না। এছাড়া কর্মকালীন সময়ে কোম্পানীর যেসব গোপনীয় তথ্য সে জানতে পেরেছে সেগুলো সে অন্য কোনো কোম্পানি বা কোনো ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করতে পারবে না।

[৩৪] আউটসোর্সিং বলতে কোনো একটি ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেয়াকে বোঝায়। আউটসোর্সিং এর ধারণাটি এসেছে ইংরেজি শব্দ 'outside resourcing' থেকে। ১৯৮০ এর দশকে আমেরিকায় ধারণাটির সূত্রপাত হয়। আউটসোর্সিং বলতে কখনো কখনো এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মী হস্তান্তর করাকেও বোঝায়। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সরকারি কাজ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বিদেশি ও দেশি ঠিকাদার উভয়ই আউটসোর্সিং এর অন্তর্গত। আউটসোর্সিং এ কখনো কখনো দূরবর্তী দেশে নিজের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে একটি কোম্পানি আউটসোর্স করতে পারে দূরবর্তী কোনো দেশের সাহায্য ছাড়াই। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। কারণ এতে বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা শ্রমবাজার ব্যবহার করা যায়। এটাই আউটসোর্সিং এর সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

খুবই কম বা একেবারেই সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে না। আর কর্মীদের উন্নতির সম্ভাবনা তো নেই-ই। অন্যদিকে দক্ষতাহীন মানুষের অভিবাসনের কারণেও মজুরি নিয়ে সমস্যা হয়। কোনো দেশের নাগরিকেরা নিম্ন মজুরির কারণে যেসব কাজ করেনা, অভিবাসীরা সে কাজই করে। দক্ষতাহীন অভিবাসীরা আসার কারণে বা বিশ্বায়নের কারণে মজুরি যদি সরাসরি না-ও কমে, তাহলে অন্তত মজুরি বাড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে।

এখন ব্যাপারটা হলো, নীতি ঠিক থাকলে পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্র সবার ক্ষেত্রেই বিরাজমান বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভাল কাজ করতে পারে, শুধু ধনীদের ক্ষেত্রে নয়। পুঁজিবাদকে আমাদের উচ্ছেদ করতে হবে বা বাছবিচার করে উৎপাদনের উপকরণের ওপর সরকারি মালিকান প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু যেটা করতে হবে তা হলো, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের সেবায় প্রতিযোগিতাকে কাজে লাগাতে হবে।

৯. পরিবেশের ওপর সমাজতন্ত্রের প্রভাব

শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই প্রকৃতির সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। প্রবল, বিপুল, রুদ্র প্রকৃতিকে মোকাবিলা করে মানুষকে টিকে থাকতে হয়েছে। একটা সময় ছিল, যখন প্রকৃতিকে জয় করাই ছিল মানুষের প্রধান উদ্যম। কিন্তু আজ আর সে অবস্থা নেই। মানুষের দ্বারা প্রকৃতি এমনভাবে উত্ত্যক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে যে, সে পাল্টা প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই বৈরিতা পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয় ব্যবস্থার মধ্যেই আছে। মাত্রাগত পার্থক্যটা নির্ভর করছে দেশ বা অঞ্চলভেদে মানুষের সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর।

পুঁজিবাদের সীমাহীন প্রকৃতি শোষণের ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে প্রসঙ্গে কথা উঠলে পরিবেশবাদীদের ন্যায় সমাজতন্ত্রীরাও বরাবরই যে কথাটি বলে আসছেন তা হলো, পুঁজিবাদের কঠিন কুঠারাঘাতে প্রকৃতি আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে, ধরিত্রী উত্তপ্ত হচ্ছে। উত্ত্যক্ত প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে। ভয়াবহ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে জলবায়ুতে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সংখ্যা ও মাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে, বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের পানির স্তর দিচ্ছে উঁচু করে। ফলে অনেক নিম্নাঞ্চল ঝুঁকিতে পড়ছে তলিয়ে যাওয়ার। এসব পরিবেশবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীরা মনে করেন, প্রকৃতিকে বিরূপ করার জন্য দায়ী পুঁজিবাদী বিশ্বের বিলাস ও ভোগবাদিতা, এর ভুক্তভোগী বিশ্বের গরিব মানুষ।

পরিবেশবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের এমন বক্তব্যের মূলকথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে সমাজতন্ত্রীদের কথার প্রেক্ষিতে ভেবে দেখার অবকাশ আছে যে, পুঁজিতন্ত্রের বিপরীতে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে, তা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে কতটা মনোযোগী ছিল। প্রকৃতিকে শোষণ ও দোহন করে বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র পশ্চিমা পুঁজিতন্ত্রের চেয়ে বেশি বিবেচক ও কম ক্ষতিকর ছিল কি-না তাও বিবেচনার বিষয়। এ বিষয়ে প্রথমেই যা দেখা যায় তা হলো, বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য অভিন্ন। আর তা হলো, আরও বেশি পরিমাণে সম্পদ উৎপদন করা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে দরিদ্র পৃথিবীতে নয়, সর্বাধুনিক উন্নত পৃথিবীতে। সর্বাধুনিক উন্নত পৃথিবী গড়ে উঠতে পারে মানুষের ভোগ্য বৈষয়িক সম্পদের প্রাচুর্য ঘটানোর মধ্য দিয়ে। কার্ল মার্কস নির্দেশিত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে তখন, যখন পৃথিবীতে মানুষের ভোগ্য বৈষয়িক সম্পদের উপচে পড়া প্রাচুর্য সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয় ব্যবস্থাকেই নিজ নিজ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রথমে বিপুল পরিমাণ বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করতে হবে। এ দুই ব্যবস্থার পার্থক্য শুধু সেই সম্পদ বিতরণ ও ভোগের ব্যবস্থায়। সমাজতন্ত্রকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রধান কারণ সম্পদ বিতরণ ও ভোগের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি বা প্রত্যাশা রয়েছে এই ব্যবস্থার মধ্যে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাকে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব-উত্তর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের আমলানির্ভর রাষ্ট্রতন্ত্র ও সমরতান্ত্রিক আধুনিকায়নের একটা সাধারণ প্রবণতা ছিল অতি উচ্চাভিলাসী উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং যেকোনো মূল্যে তা অর্জনের চেষ্টা। এজন্য বিপুল সংখ্যক মানুষের স্থানান্তর, বিভিন্ন ছোট ছোট নৃগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক জীবনধারায় পরিবর্তন, জবরদস্তিমূলক শ্রম, বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য উৎপাদন, বন উজার, নির্বিচার পশু শিকার ইত্যাদি ক্ষতিকর কর্মকান্ড চলেছে। সোভিয়েত অর্থনীতির প্রধান উৎসই ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ। সেই সব সম্পদ বিপুল পরিমাণে আহরণ করে পুঁজিবাদী দুনিয়ার কাছে বিক্রি করাই ছিল তাদের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রধান উপায়। এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিকে জয় করা, শোষণ ও দোহন করা ছিল সোভিয়েত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনধারার আধুনিকায়নের প্রধান পন্থা। সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক আরবান ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সেন্টার

গড়ে তুলতে গিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। সেখানে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাস্থ্যকর মানব বসতি গড়ে তোলার লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা করতে গিয়ে অনাহার, রোগব্যাধি, বন-জঙ্গল উজাড় ও পরিবেশের মারাত্মক দূষণ ঘটার দৃষ্টান্তও অনেক আছে।

রাশিয়া ও ১৪ টি সোভিয়েত রিপাবলিক মিলিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের যে বিশাল দেশ গড়ে উঠেছিল, আয়তনে তা ছিল পুরো পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ ভূখন্ডজুড়ে। সে সময় ঐ দেশের মোট মানুষের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮ কোটি। তাদের কাছে প্রকৃতি ছিল সীমাহীন, অফুরান এক ব্যাপার, যাকে শোষণ ও দোহন করে নিঃশেষ করা যাবে না বলেই তারা মনে করত। তারা পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার ধনী লোকদের মতো ধনী ছিল না, কিন্তু ওই সব দেশের গরিব লোকদের তুলনায় অনেক সচ্ছল ছিল। কিন্তু সেই সচ্ছলতায়ও তাদের তৃপ্তি ছিল না। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজে শুধু ব্যক্তিই অতৃপ্ত ছিল না, রাষ্ট্রও অতৃপ্ত ছিল। তারা আরও সচ্ছলতা চেয়েছিল। তাদের বৈষয়িক সম্পদ ভোগের তৃষ্ণা পুঁজিবাদী দুনিয়ার মানুষদের চেয়ে কম ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের নাগরিকদের সেই ভোগলিপ্সা মেটাতে পারেনি।

বিষয়টা এমন নয় যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের বৈষয়িক সম্পদ ভোগের তৃষ্ণা মেটাতে চায় না। এমন নয় যে সে তার সব নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের চাহিদা মিটিয়েই তৃপ্ত হয়। না, তা নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বৈষয়িক সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টি করতে চায়; এত ধনী, আধুনিক ও উন্নত হতে চায় যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবে। সমস্যা এখানেই। কি পুঁজিতন্ত্রে, কি সমাজতন্ত্রে মানুষের লক্ষ্য যদি হয় বৈষয়িক সম্পদের সীমাহীন প্রাচুর্য সৃষ্টি করা, তাহলে প্রকৃতিকে যথেচ্ছ শোষণ ও দোহন করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পৃথিবীকে ধ্বংস হতে দেবে না। তারা নিজেদেরকে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করবে। কাজেই এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে হলে মানুষের বৈষয়িক উন্নতির ধারণা বদলাতে হবে, সীমাহীন ভোগলিপ্সার রাশ টানতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির সাথে মিতালি রক্ষা করার শুভকামনা মানুষকে অবশ্যই লালন করতে হবে, নইলে তাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পড়ে যাবে।

১০.পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

পৃথিবীর প্রায় সব বিপ্লবের মতো রুশ বিপ্লবেরও শুরু এক মহান গণ-অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে। বস্তুত ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় প্রথম যে বিপ্লব ঘটে, যার ফলে রুশ জার দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের পতন ঘটে, তা নাগরিক অংশগ্রহণের হিসেবে সম্ভবত ১৯১৭ সালের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভাবনার অর্থে, সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভের ভাষায়, রুশ বিপ্লব ছিল গণতান্ত্রিক সম্ভবনায় পূর্ণ। এর ফলে একটি বহুপক্ষীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হতে পারত, কিন্তু পারেনি। তার কারণ, রুশ বিপ্লব পরবর্তী বুর্জোয়া সরকারের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা। ব্যর্থতার দায়ভার শুধু সেই সময়ের অস্থায়ী সরকার নয়, বিপ্লবী নেতাদের ওপরও বর্তায়। জার সরকারের পতন এত দ্রুত ও নাটকীয়ভাবে ঘটে যে এরা কেউই বুঝতে পারেনি, এখন কী করা দরকার। লেনিন তো স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে তার জীবদ্দশায় বিপ্লবের সাফল্য দেখা সম্ভব হবে না। রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়া ছিল বিশ্বের সবচেয়ে মুক্ত একটি দেশ। সেই মুক্ত রাশিয়ার গর্ভ থেকেই উঠে আসে অক্টোবর বিপ্লব। অথচ অপার সম্ভাবনার সেই বিপ্লব যে শেষ পর্যন্ত একটি স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রে পরিণত হয়, তার একটি প্রধান কারণ সফল রুশ বিপ্লবের পর বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সম্মিলিতভাবে কাজ করার অক্ষমতা। অন্য কারণ, সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারণ হলো, সব ক্ষমতা শুধু দলের শীর্ষ নেতার হাতে তুলে দেওয়া এবং ভিন্নমত দমন করা। স্তালিন ও লেনিনের হাত ধরেই এই প্রক্রিয়ার শুরু।

রুশ বিপ্লবের অনেক আগেই ১৯০৩ সালে রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা মেনশেভিক ও বলশেভিক–এ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মেনশেভিকদের প্রস্তাব ছিল, দলের সদস্যপদ উন্মুক্ত রাখা। কিন্তু লেনিন চেয়েছিলেন, শুধু পেশাদার বিপ্লবীদের জন্যই দলের সদস্যপদ খোলা থাকবে। এ দুই উপদল যাতে পুনরায় একত্রিত হয়, তার জন্য ম্যাক্সিম গোর্কির মতো অনেকেই অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লেনিন তাদের অনুরোধ ও প্রস্তাবসমূহ এককথায় বাতিল করে দিয়েছিলেন। লেনিন ও তার বলশেভিক বন্ধুরা ছিলেন পেশাদার বিপ্লবী, রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। এত দ্রুত ও এত সহজে ক্ষমতা তাদের হাতে আসবে, এটিও তাদের অনুমানের বাইরে ছিল। বিপ্লব পরবর্তী বিশৃঙ্খলা ও প্রতিশোধের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের কোনো আগাম পরিকল্পনা তাদের ছিল না। বিপ্লবের অব্যবহিত পর তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ছিল একদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা, অন্যদিকে দলীয় নেতৃত্বে সব ভিন্নপন্থীকে ছেঁটে ফেলা। অক্টোবর বিপ্লব সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরপরই লেনিন সব ক্ষমতা বলশেভিকদের হাতে ধরে রাখার কার্যকর উদ্যোগ নেন।

১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর বলশেভিক পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির এক সিদ্ধান্তে তিনি দলের গৃহীত মতের বিরুদ্ধে যারা, এমন সবাইকে দল থেকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব আইনসিদ্ধ করে নেন। ১৬ মার্চ, ১৯১৮ গৃহীত হয় আরও একটি অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব। দলের এক গোপন বৈঠকে লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে ঠিক করা হয় যে, কেন্দ্রীয় কমিটির বাইরে কোনো উপদল গঠন করা যাবে না। এই আইনের অর্থ ছিল, দলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে যে কেউ, তা সে যতবড় নেতাই হোন না কেন, দলবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত হতে হবে। পরে এই দুই সিদ্ধান্তের জোরেই ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন স্তালিন। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ত্রৎস্কিকে প্রথমে দল ও পরে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয় এ দুই আইন ব্যবহার করেই। এসব কারণে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা বরাবরই বলে এসেছেন, বলশেভিকরা নিজেদের বাদে অন্যসব দলকে ধ্বংস করেছিল। প্রথমে তারা সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বের স্থলে দলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করল, তারপর সেখান থেকে প্রতিষ্ঠিত হলো নেতার একনায়কত্ব।

সোভিয়েত ঐতিহাসিকেরা একসময় দাবি করতেন, সোভিয়েত ব্যবস্থা হলো বিশ্বের সবচেয়ে সেরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা কথাটিকে হাস্যকর বলেন। কারণ, সোভিয়েতরা নিজেরাই অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী অভিযোগে তাকে বাতিল করেছে। লেনিন নিজে কিন্তু বিপ্লবের আগে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অনুগত থাকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি তখন মনে করতেন, গণতন্ত্র ছাড়া প্রলেতারিয়েতের পক্ষে বিপ্লবে বিজয় অর্জন অসম্ভব, গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো পথে তারা নতুন সমাজ গড়তে সক্ষম হবেন না। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা বলেন, কিন্তু লেনিন বিপ্লবের একদম গোড়া থেকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলা শুরু করেন।

লেনিনই প্রথম ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য শক্তি ব্যবহারের যুক্তি দেখান। অক্টোবর বিপ্লবের এক প্রধান খুঁটি ছিল ক্রনস্তাদ নৌবহর। কিছু কিছু অর্থনৈতিক সুবিধার দাবি এবং অধিকতর গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের দাবিতে ক্রনস্তাদের নৌসেনারা বিদ্রোহ করলে বলশেভিক পার্টির নির্দেশে তাদের বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করা হয়। সেটি বিপ্লবের মাত্র দুই বছর পরের কথা। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হচ্ছে এমন সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই শুরু হয়ে যায়। ১৯২২ সালে লেনিনের পরামর্শে নতুন যে ফৌজদারি আইন কার্যকর হয়, তাতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংস ব্যবহার আইনসম্মত বলে ঘোষিত হয়। ক্ষমতার স্বার্থে অস্ত্র ও নির্যাতনকে কতদূর ব্যবহার করা যায়, সে

ব্যাপারে লেনিনের মতামতের আরেক প্রতিফলন ছিল গোপন পুলিশ চেকার গঠন। রুশ বিপ্লবের আগে জারের গোপন পুলিশের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেছিলেন লেনিন ও ত্রৎস্কি। তারা দুজনেই সেই পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। অথচ ক্ষমতা গ্রহণের এক মাসের মধ্যেই তারা চেকা গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন, পরবর্তী সময়ে এই চেকাই হয় কেজিবি, যাকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকার রাস্তা করা হয়। শুধু গোপন পুলিশ নয়, জারের আমলে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানোর ধারাও অব্যাহত রইল লেনিনের বিপ্লবী রাশিয়াতে। আমরা আজ যাকে গুলাগ (অভ্যন্তরীণ অন্তরীণাবস্থা) বলি, তারও সূত্রপাত লেনিনের সময় থেকেই। বস্তুতপক্ষে, গুলাগ শব্দটি লেনিনের সময় শ্রমশিবির পরিচালনার জন্য যে সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়, তারই আদ্যক্ষর।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানব ইতিহাসের একটি বড় ঘটনা। নাৎসি জার্মানির উত্থানও একটি বড় ঘটনা, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং ইরানের ইসলামি বিপ্লব পৃথিবী কাঁপানো ঘটনা। কিন্তু সেই বড় ঘটনার পেছনে রয়েছে গভীর বেদনার, গভীর অবমাননার ইতিহাস। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে চীন, কিউবা, নিকারাগুয়া, ইথিওপিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মতো বিশ্বের আরও অনেক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এইসব বিপ্লবের যূপকাষ্ঠে নিহত হয়েছে যেসব মানুষ, তাদের দুঃখগাথা ভুলে যাবার নয় বলেই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করেন।

১১. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কিত পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ

এ পর্যন্ত পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া অন্যান্য বিপ্লব ও রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের মতো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহকেও দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়ে থাকে। একটি হলো মুক্তিকামী মানুষের চোখ দিয়ে, অপরটি হলো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী তথা শোষক শ্রেণির চোখ দিয়ে। এখনো পৃথিবীর অনেক দেশেই মানবমুক্তির সংগ্রামে নতুন করে প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহ নিয়ে মানুষ আলোচনা করে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেসব বিপ্লবের দর্শন ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিতে যারা দেখেন, তারা এসব বিপ্লববিরোধী কুৎসা ও অপপ্রচার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কথা বলেন। তারা এসব বিপ্লবের মধ্যে দেখে থাকেন স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্বের আবির্ভাব।

প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সেগুলোর পরবর্তী ব্যবস্থা সম্পর্কে বুর্জোয়া অপপ্রচারের নানা কৌশল আছে। তার মধ্যে একটি হলো বিপ্লব পরবর্তী সময়ে হত্যা; যেমন, অক্টোবর বিপ্লব পরবর্তী সময়ে প্রচার করা হয়েছিল যে, রাশিয়ায় বিপুল পরিমাণে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এসব হত্যার বিবরণ তারা নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করেন। তারা এসব হত্যার যে বিরাট সংখ্যার কথা বলেন, তাতে বিশ্বাস রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, তারা যেসব সূত্র ব্যবহার করেন, সেসবেরও কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। তারা এসব বিপ্লবের পথপ্রদর্শক, সমাজতন্ত্রের নির্মাতা ও মানবমুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টাদের সম্পর্কে যে চিত্র তুলে ধরেন, তাতে মনে হয়, নিষ্ঠুরতা ও হত্যা করাই যেন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বুর্জোয়ারা মনে করেন, সোভিয়েত ব্যবস্থাকে বিশ্বের সেরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দাবি করা হাস্যকর। কারণ তাদের মতে, ওটা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র।

পৃথিবীর বহু বড় মাপের শিল্পী, কবি, লেখক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি ও সৎ-সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যারা লেনিন-স্তালিন মতাদর্শের অনুসারী না হয়েও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কারণ, তারা এ ব্যবস্থাকে দেখেছেন মানবিকতার চোখ দিয়ে অথবা উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সমাজের সাম্য, মৈত্রী, বৈষম্যহীনতা ও মানবিক দিকটাই তাদের আকৃষ্ট করেছিল। ১৯৩০ সালে স্তালিন আমলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া ভ্রমণ করে এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে, ১৯৩১ সালে প্রকাশিত *রাশিয়ার চিঠি* নামক প্রবন্ধ সংকলনে তিনি এই ভ্রমণকে তীর্থ দর্শনের মতো পবিত্র মনে করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন।[৩৫] সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণকে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান বলে বিবেচনা করে তার বিভিন্ন দিকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, "যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভাল লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।"[৩৬] তিনি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দেখেছিলেন মানবিকতার চোখ দিয়ে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহের যে অর্জন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। অক্টোবর বিপ্লবই প্রথম নারীর ভোটাধিকারসহ নারী-পুরুষের সমানাধিকার আইনগতভাবে ও বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখনো পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার কোনো দেশে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল না বর্ণবৈষম্য ও জাতিগত নিপীড়ন। অন্যদিকে গত শতকের

[৩৫] দেখুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাশিয়ার চিঠি*, ঢাকা: রহমান বুকস, ২০১৪, পৃ. ৯।
[৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৮।

ষাটের দশক পর্যন্ত আমেরিকায় বর্ণবাদ ভয়াবহ আকারে ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বের কারণে পরাধীন দেশসমূহ দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করেছিল। অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকীতে স্তালিন যথার্থই বলেছেন, সোভিয়েত রাষ্ট্র হলো দুনিয়ায় সকল নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঘাঁটি।[৩৭]

লাস্কি যে বস্তুগত অর্জনের কথা বলেছিলেন, তাও ছিল বিস্ময়কর। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছিল ১৯২৮ সাল থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে। এটা ছিল সেই সময়, যখন সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় চলছিল ভয়াবহ মন্দার কাল। তখন একমাত্র নিউইয়র্ক শহরেই না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল দুই হাজার বেকার মানুষ। আর সেই সময় সোভিয়েতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ১২ শতাংশ।[৩৮] সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজের কাছেই হিটলারের নাৎসি জার্মানি পরাজিত হয়েছিল। এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নই ভয়াবহ ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল সর্বাধিক। পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদেরা বলেছিলেন যুদ্ধ পূর্ব অর্থনৈতিক অবস্থানে আসতে সোভিয়েত ইউনিয়নের লাগবে কম করে হলেও ৫০ বছর। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদের অর্ধেক সময়ের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছিল, তাও আবার কোনো বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য ছাড়াই। বিজ্ঞান, শিল্পকলা এমনকি ক্রীড়াক্ষেত্রেও সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্জন ছিল অসামান্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল এবং সবারই ছিল সব ক্ষেত্রে সমান সুযোগ। এর ফলে পাশ্চাত্যের জগৎ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

পুঁজিবাদ মূলত শোষণমূলক ব্যবস্থা। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র হলো সামাজিক মালিকানাভিত্তিক শোষণহীন, বৈষম্যহীন ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, এত বড় বিজয়, এত সাফল্য ও এত অর্জন সত্ত্বেও ৭০ বছর পর কেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেল, কেন এবং কীভাবে পুঁজিবাদ ফিরে এল তার নোংরা চেহারা নিয়ে? এসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের নীতির কোনো পরিবর্তন বা পতন ঘটেনি। বিপ্লবের কয়েক যুগ পরে পরবর্তী প্রজন্মের রাষ্ট্রনায়ক ও পার্টির নেতারা নিজেরাই সমাজতন্ত্রের পথ থেকে সরে গিয়েছিলেন।

---

[৩৭] অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মস্কোতে পার্টির কর্মীদের র‍্যালি শেষে মায়াকোভস্কি রেলস্টেশনের কাছে এক পথসভায় স্তালিন যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন সেখানে তিনি এ কথা বলেন।

[৩৮] সূত্র: প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর, ২০১৭।

১২. সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির অবক্ষয়

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকের শুরু থেকেই বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি নিয়ে অনেক বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে। বিশেষ করে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারকে পরাজিত করার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। তারপর সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন জার্মানি বা জাপানের মতো বাইরের সাহায্য না নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সব নাগরিকের জন্য খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিল। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের উপনিবেশগুলো ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছিল। ফলে সারা দুনিয়ায় মানুষের মুক্তির ব্যাপারে একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল, চারদিকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হচ্ছিল। কিন্তু তারপরও বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে সরে যায়। তারপর সেসব জায়গায় সংসদীয় রাজনীতি শুরু হয়। পঞ্চাশের দশকে যখন এসব ঘটছে, তখনো কিন্তু সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র নিয়ে আশা-উদ্দীপনা ছিল। তারপর স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চভ ভিন্ন পথ নিলেন। ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হলো, দেশে দেশেও কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হয়ে গেল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর চীন, আমেরিকা ও পাকিস্তানের মতো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে সমঝোতা করে তাদের পক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে আগে চিন্তার ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেল। লেনিন তো পরিত্যাক্ত হলেনই, এমনকি চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সব বইপত্র বাদ দিয়ে লাল বই পড়া শুরু হলো, তার ফলে মাও সে-তুংয়ের গুরুত্বপূর্ণ লেখাপত্রও পরিত্যাক্ত হলো। চীন বলত যে সশস্ত্রভাবে সংগ্রাম করতে হবে, সেই মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম বা গেরিলাযুদ্ধ করার মতো প্রকৃত পরিস্থিতি ছিল না বলে সন্ত্রাসবাদ দেখা দিল। এর ফলে অধিকাংশ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

রাশিয়া ও চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির যে ভিত্তি ছিল, অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে তা ছিল না। এসব দেশে পার্টিতে মধ্য শ্রেণির প্রাধান্য ছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কোনো লক্ষ্য, রণনীতি ও কর্মসূচি কমিউনিস্ট পার্টির ছিল না। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত দেশসমূহে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশদের উচ্ছেদ করে নিজেরা

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবে এমন কথা কখনো উচ্চারণ করেনি। এসব দেশ বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে–এটা ধরে নিয়েই রাজনীতি করেছিল। অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি নয়, দেশের বুর্জোয়া শ্রেণির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যই তারা কাজ করেছিল। আবার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লব করার পরিবর্তে তারা সন্ত্রাসবাদের দিকে চলে যায়। অনেক দেশ আবার নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করে। সংসদীয় রাজনীতি এবং নির্বাচন এসব দেশের রাজনীতির প্রকৃতিতে একটা বড় পরিবর্তন ঘটায়। নির্বাচনে কমিউনিস্টরা অংশ নিতে থাকে, ফলে কমিউনিস্ট রাজনীতি সংসদীয় রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে ঢুকে যায়। এই কাঠামোতে কমিউনিস্টদের প্রতিদ্বন্দ্বী তো কোনো বিপ্লবী শক্তি নয়, তারা অন্যান্য সংসদীয় রাজনৈতিক দল, যাদের মূল চরিত্র বুর্জোয়া।

পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির দুরবস্থা রাতারাতি হয়নি। এর ঐতিহাসিক কারণ আছে। কমিউনিস্টরা সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও তেমনভাবে সফলতার মুখ দেখতে পারেনি। কমিউনিস্ট পার্টির নের্তৃস্থানীয় পর্যায়ের লোকেরা অধিকাংশ দেশে নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয় অথবা রাজনীতি ছেড়ে দেয়। ফলে সেসব জায়গায় বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যের অভাব দেখা দেয়। সমাজ একটা অখন্ড জিনিস। সমাজের একটা জায়গা কলুষিত থাকবে আর একটা জায়গা পবিত্র থাকবে, এ রকম হয় না। সমাজের প্রতিটি অংশ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষতি সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয়ের বাইরে থাকতে পারে না। এই অবক্ষয় থেকে বেরোনোর উপায় এই পুরো সমাজটার নতুন রূপান্তর ঘটানো।

১৩. কাঙ্খিত উন্নয়নে রাশিয়ার ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ

সাবেক সোভিয়েত ব্লকের অনেক দেশেই কর্তৃত্বপরায়ণ সরকার ক্ষমতায় আছে। তাদের অনেকেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মতো কীভাবে নির্বাচিত হওয়া যায় সেই বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেছেন। তারা অনুদার গণতন্ত্রের ধারণা বিক্রি করেছেন প্রায়োগিকতার কথা বলে, ইতিহাসের সর্বজনীন তত্ত্বের ভিত্তিতে নয়। জাতীয়তাবাদী আবেগ উসকে দেওয়া ও ভিন্নমত দমনের বেলায়ও তারা দক্ষ। যদিও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে তারা অতটা কার্যকর নন। রাশিয়া একসময় পৃথিবীর দুই পরাশক্তির একটি হলেও এখন তার দেশজ উৎপাদন জার্মানির ৪০ শতাংশ ও ফ্রান্সের ৫০ শতাংশের কিছু বেশি। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দেশটির অবস্থান এখন বিশ্বে ৭৩ তম

(ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে)।[৩৯] মানে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের যে প্রান্তস্থ দেশগুলো ছিল, রাশিয়ার অবস্থা এখন সেগুলোর চেয়েও খারাপ। দেশটির শিল্পকারখানা কমে গেছে। ফলে তার রপ্তানির সিংহভাগই আসে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে। দেশটি স্বাভাবিক বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি, বরং সেখানে অদ্ভূত ধরনের এক পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে।

তা সত্ত্বেও রাশিয়া এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার গড়পরতা অবস্থানের চেয়ে বেশি সামর্থ্য দেখায়, যেমন পারমাণবিক শক্তির বেলায়। এমনকি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তার এখনো ভেটো দেওয়ার সামর্থ্য আছে। আর সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির ওয়েবসাইট হ্যাক করে সে জানান দিল, পশ্চিমের নির্বাচনে নাক গলানোর সামর্থ্য তার আছে। এটা বিশ্বাস করার সব কারণই আছে যে এই নাক গলানো চলতেই থাকবে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বাজে রুশিদের সম্পর্ক থাকায় মার্কিনরা তাদের রাজনীতিতে রুশ প্রভাব নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

আয়রন কার্টেনের (আদর্শিক বিভাজন) পতনের সময় অনেকেই রাশিয়া ও বৃহত্তর অর্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে বড় আশা পোষণ করতেন। তবে সাত দশকের সমাজতান্ত্রিক শাসনের পর রাশিয়ার পক্ষে বাজার অর্থনীতিতে ঢোকা সহজ ছিল না। কিন্তু সদ্য পড়ে যাওয়া ব্যবস্থার তুলনায় গণতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির সুবিধা দৃশ্যত অনেক বেশি হওয়ায় ধারণা করা হয়েছিল, অর্থনীতি বিকশিত হবে এবং নাগরিকরা বৃহত্তর স্বাধীনতা দাবি করবে। কিন্তু ভুলটা কোথায় হলো? দোষটা কার? রাশিয়ার সমাজতন্ত্র উত্তর ক্রান্তিকাল কি ভালোভাবে সামলানো যেত?

আমরা কখনো নিশ্চিতভাবে এই সমস্যাযুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারব না। ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করে, আজ আমরা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি, তার আংশিক কারণ হচ্ছে ওয়াশিংটন কনসেনসাসের অন্তর্গত ভুল, যার আলোকে রাশিয়ার ক্রান্তিকাল পরিচালিত হয়েছে। সংস্কারবাদীরা বেসরকারিকরণের ওপর যে ব্যাপক জোর দিয়েছেন, তার মধ্যেই এ কাঠামোর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এখানে গতিই সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে, তা সে যেভাবেই করা হোক না কেন। এমনকি বাজার অর্থনীতির কার্যকারিতার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন ছিল তার মধ্যেও এই তাড়াহুড়ো দেখা গেছে। অর্থনৈতিক

[৩৯] সূত্র: প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল, ২০১৭।

সংস্কারের ক্ষেত্রে এই থ্যারাপি যে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হবে সে আশংকাও অনেকেই করেছিলেন। আবার এই তরিকার সমর্থকেরা ধৈর্য ধরার কথা বলেছিলেন।

রাশিয়াতে ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থ করার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তা সংবরণ করা খুবই কঠিন ছিল। পরিষ্কারভাবে রাশিয়াতে গণতন্ত্রায়ন নিশ্চিত করার জন্য সবার সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হতো, ধণিকতন্ত্র তৈরির নীতি গ্রহণ করে সেটা সম্ভব নয়। তবে পশ্চিম যে মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দেশ তৈরির সংকল্প করে ব্যর্থ হয়েছে, সেটাকে খাটো করে দেখা যাবে না।

১৪. সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রধান দ্বন্দ্ব

সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বের কথা আলোচনা করতে গেলে এর যে দুটি পক্ষ আমাদের সামনে চলে আসে তার একদিকে রয়েছে প্রিন্সিপাল বা ট্রাডিশনাল সমাজতন্ত্র বা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর অন্যদিকে রয়েছে চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বের কথা বলা হয় মূলত চীনের অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক নীতির কারণেই। চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্র কথাটি চীনে একটা আপ্তবাক্যের মতো প্রচলিত। সে দেশে কেউই শুধু সমাজতন্ত্র বলে না, তার সাথে অবশ্যই 'চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত' কথাটা জুড়ে দেয়। আর প্রিন্সিপাল সমাজতন্ত্রের কথা মার্কসবাদী তত্ত্বালোচনায় বহুকাল ধরে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সমাজতন্ত্রের এ প্রধান ধারা ও অপ্রধান ধারার দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক রয়েছে।

সমাজতন্ত্রের এ ধারণাগুলোর কোনোটিই আমাদের কাছে অপরিচিত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুটি কথা নিয়ে চিন্তাবিদদের মনে বরাবরই প্রশ্ন জেগেছে ও আলোচনা হয়েছে। প্রথমত, তারা বুঝতে চেয়েছে, চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝানো হয়েছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে সব সম্পদের মালিক ছিল রাষ্ট্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে সেখানে কিছু ছিল না। রাষ্ট্র সব নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের দায়িত্ব নিয়েছিল, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নাগরিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের। ব্যক্তিগত মালিকানার দোকানপাট, এমনকি চুল কাটার সেলুন পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু চীনে প্রাইভেট সেক্টর বা ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত বিশাল, সে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান অবদান ব্যক্তি খাতের। ১৯৭৮ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি অর্থনৈতিক সংস্কার

কর্মসূচি হাতে নেয়। ১৯৮১ সাল থেকে তারা বাজার অর্থনীতি চালু করে। বাজার অর্থনীতিকে তারা ম্যাজিকের মতো চিন্তা করতে শুরু করে। তার ফলে অভূতপূর্ব দ্রুতগতিতে চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। টানা তিন দশক ধরে সে দেশে ১০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।[৪০] চীন হয়ে ওঠে পৃথিবীর ফ্যাক্টরি ফ্লোর। দেশটি আজ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর অর্থনৈতিক শক্তির দেশ।

এখন স্বাভবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এটা কি সমাজতন্ত্র? পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সাথে এর পার্থক্য কোথায়? চীনের অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক রাষ্ট্র বা চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নয়, বরং কয়েকজন মানুষের একটা গ্রুপ। সেই গ্রুপে অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাও থাকতে পারেন। অন্যদিকে চীনে এখনো পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে মানবেতর জীবনযাপন করে। তাদের মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ ১ মার্কিন ডলারের কম। আর হিউরান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জরিপে বলা হচ্ছে, চীনে সবচেয়ে ধনী তিন ব্যক্তির প্রত্যেকে ৩ হাজার মার্কিন ডলার সম্পদের মালিক।[৪১] চীনে অঞ্চলভেদে উন্নয়নের পার্থক্যও বিস্তর। যেমন পাহাড়-পর্বতময় গুইঝু প্রদেশের মানুষের গড় বার্ষিক আয় সাংহাই এলাকার মানুষের গড় আয়ের তিন ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা অবশ্য কোনোভাবেই দারিদ্র্যের বিষয়টি লুকাবার চেষ্টা করেন না। বরং দারিদ্র্য কমানোর জন্য তারা যে তৎপর রয়েছেন এবং তা বেশ গুরুত্বের সাথেই বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। তারা বরাবরই বলে আসছেন, দারিদ্র্য বিমোচনের এই তৎপরতা অব্যাহত থাকবে এবং খুব শীঘ্রই চীনে আর কোনো মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে থাকবে না। তারা এই দশকের মধ্যেই চীনকে মাঝারি মানের সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চান।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, এত কিছু সত্ত্বেও চীন দীর্ঘ সময় ধরে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক ধাপেই রয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চীন যে উন্নয়নশীল দেশ বলে পরিচিত, তার সেই পরিচয়ে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে পথ চীন অনুসরণ করে চলেছে, সেটাকে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক ধাপই বলা চলে। এই ধাপে চীন আরও দীর্ঘ সময় থাকবে। চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্র বলতে মোটামুটি এটুকুই বোঝা যায়। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য আশাবাদী যে, আগামী দুই দশকের মধ্যে চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্রের আধুনিকায়ন ঘটানো হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমস্ত সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে

[৪০] সূত্র: প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর, ২০১৭।
[৪১] *প্রাগুক্ত*।

আধুনিকায়নের এই প্রক্রিয়ায় বৈষয়িক সম্পদের এমন বৃদ্ধি ঘটবে যে চীন আর সমৃদ্ধির মাঝারি পর্যায়ে থাকবে না, পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি অর্জন করবে। তার পরবর্তী এক থেকে দেড় দশকের মধ্যে চীন হয়ে উঠবে এক মহান আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশ। সমাজতন্ত্র শব্দটির সাথে তখন আর 'চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত' কথাটা জুড়তে হবে না, সাধারণ অর্থে সমাজতন্ত্র বলতে যা বোঝায়, চীন সেই অবস্থায় পৌঁছে যাবে।

এ রকম স্বপ্ন পূরণের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া উচ্চাভিলাসী বলেই মনে হয়। বিশেষত এই পর্যায়ে, যখন চীনা সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক ধাপই অতিক্রম করতে পারেনি বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রনেতাদের উচ্চাভিলাস থাকে, সময় ধরেই তারা কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন। সেই কাজ করতে গিয়ে তাদের কী ধরনের বাধা বা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে, সে সম্পর্কেও তাদের ধারণা রাখতে হয়। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়ে সচেতন হন না। চীনা সমাজতন্ত্রের সামনে এই সময়ের চ্যালেঞ্জ সনাক্ত করতে পেরেছেন বলেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা মনে করছেন। তারা বলে চলেছেন, চীনা সমাজতন্ত্র এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এই যুগে তার প্রধান দ্বন্দ্ব হলো ভারসাম্যহীন ও অপর্যাপ্ত উন্নয়ন এবং আরও ভালভাবে জীবনযাপনের জন্য জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ তাদের মতানুসারে, এতকাল চীনে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা ভারসাম্যহীন ও অপর্যাপ্ত। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব অগ্রাহ্য হয়েছে, পানি ও বাতাস বিষাক্ত হয়েছে। নির্মল বায়ু আর নীল আকাশ আজ চীনের শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলো থেকে হারিয়ে গেছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরাট ক্ষতির বিনিময়ে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, সেটা অনেকের মতেই পর্যাপ্ত নয়। কারণ, মানুষের আরও ভালো জীবনযাপনের চাহিদা বেড়ে চলেছে। ভালো জীবনযাপনের চাহিদার কোনো নির্দিষ্ট মাত্রা নেই। মাত্রাগত তারতম্য যাই হোক, আরও ভাল জীবনযাপনের মূল কথা হলো আরও বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য। অনুন্নত বা প্রাথমিক পর্যায়ের সমাজতন্ত্রের সাথে জনগণের এই স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দ্বন্দ্বই চীনা সমাজতন্ত্রের নতুন যুগের প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আর শুধু তাই নয়, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে মানুষের আরও কতগুলো চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যেমন গণতন্ত্র, আইনের শাসন, পক্ষপাতহীন বিচারব্যবস্থা, ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা, উন্নত পরিবেশ ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে চীনা সমাজতন্ত্রের এই মুহূর্তের প্রধান দ্বন্দ্ব গোটা মানবজাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আরও একটু ভালভাবে

বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের আকাঙ্ক্ষা। প্রধানত এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টাই দেশে দেশে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। যেসব দেশ এই পথে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে, আর যারা মোটেও সফল হতে পারছে না, উভয় ধরনের দেশেই এই দৌড় অব্যাহত রয়েছে। এই তাড়নার নাম ভোগবাদ। এটা গোটা মানবসভ্যতার সংকট, শুধু সমাজতন্ত্রের বা নির্দিষ্ট কোনো দেশের নয়। এসবের বাইরে এসে, সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বের কথা ভুলে গিয়ে চীনে এখন ভাবা হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে কীভাবে উন্নয়ন অব্যাহত রাখা যায়। তারা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও কলকারখানা স্থাপনের ওপর অনেক বেশি জোর দিচ্ছে, প্রচুর বিনিয়োগ করছে।

১৫. চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্র

চীনা সমাজতন্ত্র এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এটা চীনের অগ্রগতির এক নতুন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। এই নতুন যুগে চীনের লক্ষ্য একটি আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়ে তোলা। এটা হবে এমন এক যুগ, যখন চীন মধ্যমঞ্চের কাছাকাছি এগিয়ে যাবে এবং মানবজাতির জন্য আরও বড় অবদান রাখবে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ১৯ তম কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র সি চিন পিং বলেন, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার মহান আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে সব ক্ষেত্রে মাঝারি শ্রেণির সমৃদ্ধ সমাজ হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং তারপর দুই ধাপে লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবে। ২০২০ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে সমাজতন্ত্রের আধুনিকায়ন সম্পন্ন করা হবে এবং ২০৩৫ থেকে একুশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ চীন একটি 'গ্রেট মডার্ন সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি' হয়ে উঠবে। সেই আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চীন হবে সমৃদ্ধ, শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিকভাবে অগ্রসর, সম্প্রীতিপূর্ণ ও সুন্দর।

১৯৭৮ সালে বাজার অর্থনীতি ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আহ্বানের নীতি গ্রহণের পর থেকে চীনে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু এখনো এই দেশের ৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে।[৪২] দারিদ্র্যসীমার ওপরেরও বিপুলসংখ্যক মানুষের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। অন্যদিকে অল্পসংখ্যক ধনী মানুষের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে। ধনী-দরিদ্রের এই বৈষম্য পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য, সমাজতান্ত্রিক সমাজের নয়। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এই দিকে আগে কতটা দৃষ্টি দিত তা তেমন একটা পরিষ্কার না হলেও, এখন তারা এ বিষয়ে

[৪২] সূত্র: প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর, ২০১৭।

ব্যাপকভাবে কথা বলছে, তা স্পষ্ট। গত পাঁচ বছরে চীনে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য কমেছে। এই সময়ের মধ্যে ছয় কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে এসেছে। পাঁচ বছর আগে চীনে ১০ শতাংশ মানুষ ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। এখন এই হার কমে ৪ শতাংশে নেমেছে। দারিদ্র্য কমার অন্যতম কারণ হলো দ্রুত নগরায়ণ। গত পাঁচ বছরে আট কোটি মানুষ গ্রাম থেকে শহরে এসে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছে।

চীনের দারিদ্র্য বিমোচনের এই প্রক্রিয়াও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বহন করছে। ব্যাপারটা এ রকম যে গোটা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটলে সমাজের সবচেয়ে নিঁচু শ্রেণিতে অবস্থানকারী মানুষের কাছেও তার কিছু সুফল আস্তে আস্তে পৌঁছাবে। চীন এই পথেই আরও অগ্রগতি, আরও সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সম্ভবত এটাকেই বলছে 'সোশ্যালিজম উইথ চায়নিজ ক্যারেক্টারিস্টিকস' বা চীনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাজতন্ত্র। চীনা সমাজতান্ত্রিক পার্টির আর কেউ এখন শুধু 'সোশ্যালিজম' শব্দটি ব্যবহার করে না, তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় 'উইথ চায়নিজ ক্যারেক্টারিস্টিকস'। ইদানিং তারা মার্কসবাদের কথা উচ্চারণের সময়ও মার্ক্সিজমের সাথে জুড়ে দিচ্ছেন 'ইন চায়নিজ কনটেক্সট', অর্থাৎ চীনা প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদ।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে বলশেভিকরা যখন বিপ্লব করে, তখন ঐ দেশে পুঁজিতন্ত্র পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি। ইউরোপের মতো শিল্পবিপ্লব রাশিয়ায় ঘটেনি, ১৮৬১ সাল পর্যন্ত সে দেশে ভূমিদাস প্রথা ছিল। মূলত কৃষিভিত্তিক একটা দেশে, যেখানে শিল্পায়ন শুরু হয়েছে মাত্র, সেখানে পুঁজিতন্ত্র তার পরিণতির কাছাকাছি পৌঁছানো দূরে থাক, শৈশবই অতিক্রম করতে পারেনি। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্ষমতা দখল করার পর লেনিন উপলব্ধি করেছিলেন যে বড্ড শর্টকাট পথ বেছে নেয়া হয়েছে। তাই তিনি 'নিউ ইকোনমিক পলিসি' নামে আংশিক পুঁজিতান্ত্রিক পন্থা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যু সোভিয়েত ইউনিয়নকে সেই পথে এগোতে দেয়নি। স্তালিন সরাসরি সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ বেছে নিয়ে যা যা করেছিলেন, ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তা টেকসই হয়েছে। তারপর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয় ঘটেছে এবং রাশিয়াকে আবার বিপ্লবপূর্ব সময় থেকে পথচলা শুরু করতে হয়েছে। কিন্তু চীনা কমিউনিস্টরা সোভিয়েত কমিউনিস্টদের আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পুঁজিতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে বা শর্টকাট পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ১৯৭৮ সালের পর থেকে চীন যে পথে চলছে, সেই পথে আর কতটা এগিয়ে গেলে চীন তাদের কল্পিত 'গ্রেট মডার্ন সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি' হয়ে উঠবে, তা ভবিষ্যতই বলে দেবে।

১৬. রাশিয়ার পুনর্জাগরণ

সেদিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ফিরে আসবে না, এটা অন্যদের মতো রাশিয়ার মানুষও জানে। আর তারা এটা চায়ও না। কিন্তু যে দেশটিকে তিন দশক আগেও সবাই মান্য করত, যে দেশ পরাশক্তি হিসেবে সারা বিশ্বের সমীহ আদায় করত, সে দেশের এমন করুণ পরিণতি রাশিয়ার মানুষকে কষ্ট দেয়। তাই তারা আবার উঠে দাঁড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর যার নেতৃত্বে তারা এই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে চাইছে, তিনি হলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। কারণ, ইতিমধ্যে পুতিন রাশিয়ানদের মধ্যে পুনর্জাগরণের নেতা হিসেবে ভাবমূর্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি যে সময় রাশিয়ায় ক্ষমতায় আসেন, সে সময়টাতে পুরো রাশিয়া যেন ছিল তলিয়ে যেতে থাকা এক জাহাজের মতো, যার ঘুরে দাঁড়ানোর আশা ও সম্ভাবনা খুব সামান্যই। ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর ভ্লাদিমির পুতিন ক্ষমতায় এসে রুশদের ঘুরে দাঁড়ানোর নেতৃত্ব হাতে নেন।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার পর ক্ষমতায় এসে প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন রাশিয়ার যে দরজাগুলো খুলে দেন, তাতে পশ্চিমের বাতাসের সাথে সাথে অনেক আবর্জনা রাশিয়ায় প্রবেশ করে। আমেরিকার ভোগবাদী জীবনের আলোটুকু দেখেই তরুনসমাজ উন্মাদনায় অধীর হয়। এ সময়ই রাশিয়ার সমাজে প্রকাশ্য অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সুযোগে সোভিয়েত যুগে যে রুবলের মূল্য ছিল ডলারের চেয়ে বেশি, রাশিয়ার সেই রুবল আর ডলারের কাছে দাঁড়াতেই পারে না। পুতিন ক্ষমতায় এসে রাশিয়ার সে পতন ঠেকাতে চেষ্টা করেন। পুতিন দিয়েছেন নয়া রাশিয়ার ডাক। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্তির পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া স্বাধীন দেশগুলো যখন চরম অর্থনৈতিক মন্দায় পতিত হয়, তখন সেখান থেকে দলে দলে মানুষ রাশিয়ায় আসতে থাকে, কমিউনিস্ট মতাবলম্বীদের ওপর রাষ্ট্রীয় পীড়ন চলে। মোটকথা, একটা অরাজক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় রুশরা।

পুতিন এসে সবাইকে নিয়ে রাশিয়াকে ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক দিয়েছেন। তাই বন্ধ হয়ে যাওয়া গির্জাগুলোতে যেমন এখন আলো ঝলসায় ও ঘন্টা বাজে, তেমনি রাস্তায় রাস্তায় কার্ল মার্কস, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনসহ অন্য সমাজতন্ত্রীদের ভাস্কর্য এখনো শোভা পায়। অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে মস্কোতে 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ডেমোক্রেটিক উয়ুথ' ১৫ থেকে ২১ অক্টোবর, ২০১৭ মহাসম্মেলন করেছে। এর অনুমোদন ও আয়োজনও রাশিয়ার আধুনিক বহুমুখী গণতন্ত্রের নবযাত্রার জয়ই ঘোষণা করে। রাশিয়ায় শতকরা আশি ভাগ রুশ ছাড়াও ঐতিহাসিকভাবে আছে তাতার, বাশকির, চুভাস,

চেচেন, ইউক্রেনিরা। আরও অন্যান্য জাতের কিছু মানুষ নানা সময় রাশিয়ায় গেছে। পুতিন সবাইকে নিয়ে তার নয়া রাশিয়া গঠনের ডাক দিয়েছেন। তিনি জোর দিয়েছেন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ওপর এবং অবশ্যই তা রুশ পরিচয় বিসর্জন না দিয়ে। ঐশ্বর্য প্রদর্শনের দিক থেকেও পুতিন বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে রাশিয়া পারে। বহু উচ্চ ভবনের সমন্বয়ে 'মস্কো ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৬ সালে মস্কোতে স্থাপিত হয় ১২২৬ ফুট উচ্চতার 'ফেডারেশন টাওয়ার' যা ইউরোপের মধ্যে সর্বোচ্চ ভবন। উচ্চতার দিক থেকে ইউরোপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভবনও রাশিয়ায়। আর সেগুলোও নির্মিত হয়েছে পুতিনের সময়কালেই। ডজনে ডজনে চলছে দ্রুতগামী রকেট ট্রেন এবং সেগুলোর ভাড়া বেশি হলেও আসন শূন্য থাকছে না মোটেও। তার মানে রাশিয়ার মানুষের সামর্থ্য বাড়ছে।

সামর্থ্য বাড়ার আরেক প্রমাণ দেখা গেল আমেরিকার গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়। ব্যাপারটি ভেতরে ভেতরে কতটুকু গড়িয়েছিল এবং তা থেকে রাশিয়া আদৌ কি ও কতটুকু পাবে বা পেয়েছে, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। আপাতত সাধারণ রুশরা আমেরিকার ওপর 'জিতে নিয়েছে' এমন একটা ভাবে আছে। এই ভাবটি তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজন ছিল। তবে সরকারি চাকরিতে বেতন আশানুরুপ বাড়েনি। মানুষ তাই চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করছে। এই চ্যালেঞ্জ শুধু ব্যবসার ক্ষেত্রেই নয়, মানব সম্ভাবনার সীমা বাড়িয়ে দিয়ে এক থেকে একাধিক কর্ম করার আগ্রহ।

রাশিয়ার সামনে এখন এক বড় চ্যালেঞ্জ হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার এক দশক পরের প্রজন্ম। সেই দশকের সন্তানেরা এখন চারিদিকে। স্বেচ্ছাচারিতার যে পাঠ তারা সে সময় পেয়েছে, তা ছাড়তে পারছে না অনেকে। তাদের বাগে আনাটাও খুব একটা সহজ নয়। তবে সাহিত্য রচয়িতারা বা সংস্কৃতির কর্ণধারেরা স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত হয়েই চলছেন। তাদের সামনেও রাশিয়াকে দাঁড় করানোর স্বপ্ন। রুশরা বাসে, ট্রেনে, ট্রামে বসে উচ্চকণ্ঠে আড্ডা নয়, কাগজের বই বা ট্যাবে ধরে রাখা বইই পড়ছে। স্কুল-কলেজগুলোতে চলছে তাদেরই ঐতিহ্যকেন্দ্রিক লেখাপড়া। তবে কোনো কোনো স্কুলে ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে একটা পর্যায়ে গ্রহণ করার সুযোগ রাখা হয়েছে। জাগরণ ও সমন্বয়ই হলো ভ্লাদিমের পুতিনের আজকের রাশিয়ার মূলমন্ত্র। জাগরণ হলো রুশদের এবং সমন্বয় হলো নিজেদের বহুমতের। আজকের তরুণ সমাজ পুতিনের ওপর খুবই আস্থা রেখেছে। পুরোনো দিনের রুশরা এখন বিশ্বাস করেন, ভ্লাদিমির লেনিন যেমন একসময় তাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনিভাবে ভ্লাদিমির পুতিন তাদেরকে আবার তাদের গৌরবের জায়গায় তুলে নিয়ে আসবেন।

১৭. সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কিত কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে কৌতুহল ও জিজ্ঞাসার শেষ এখনও হয়নি। এ নিয়ে গভীর ও বিশদ গবেষণা চলছে, নতুন নতুন লেখা প্রকশিত হচ্ছে, যতটা না রাশিয়ায় তার চেয়ে বেশি পশ্চিমা দুনিয়ায়। এখনও বোঝার চেষ্টা চলছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমুহ কেন ও কীভাবে ঘটেছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের গোড়াপত্তন থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় পরাশক্তি হয়ে ওঠা পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছিল, সেসব কী করে সম্ভব হয়েছিল এবং স্পষ্ট কোনো পূর্বলক্ষণ ছাড়াই সেই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রটি কেন ও কীভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গেল। এতসব প্রশ্নের মধ্যে এখনও রাষ্টতত্ত্ববিদদের প্রধান জিজ্ঞাসা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন ও কীভাবে ভেঙ্গে গেল।

এই জিজ্ঞাসার প্রচলিত দুটি সরল উত্তরের প্রথমটি হলো, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন একটা ষড়যন্ত্রের ফল। আর এ ষড়যন্ত্রের হোতা মিখাইল গর্বাচেভ। তিনি আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর এজেন্ট ছিলেন। তিনি নিজের চারপাশে যেসব লোককে জড়ো করেছিলেন, তারাও সবাই ছিলেন পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্বের সহযোগী। এরা আমেরিকা ও তার পুঁজিবাদী মিত্রদের সাথে যোগসাজস করে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙেছে, নইলে দেশটির পতনের কোনো কারণ ছিল না। প্রচলিত দ্বিতীয় উত্তরটা হলো, সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎপত্তিই হয়েছে অবৈধভাবে, এটা ছিল একটা অশুভ শক্তি, এর পতনের বীজ তার ভেতরেই লুকানো ছিল। তাছাড়া এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল অস্বাভাবিক, যা কিনা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বাজার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়ে প্রত্যেক নাগরিকের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্র নির্বিঘ্নে অনন্তকাল চলতে পারে না। গর্বাচভ ব্যবস্থাটার সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা সংস্কারের যোগ্য ছিল না, বরং সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এক পর্যায়ে তার ভেঙে পড়াই অনিবার্য ছিল। অবশেষে সেটাই হয়েছে।

এসব মতের কোনোটাই ভাবুক ও কৌতুহলী মানুষকে সন্তুষ্ট করে না। তারা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন সে সময়ে সামগ্রিকভাবে আসলে কী ঘটেছিল। ১৯৮৫ সালের মার্চে মিখাইল গর্বাচভ যখন দায়িত্ব নেন, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে অথবা বাইরে কেউ কল্পনা করতে পারেননি যে পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রটি ভেঙ্গে পড়বে। তার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ ছিল না, কিন্তু বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমতে শুরু করায় খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ধীরে ধীরে বাড়ছিল। ১৯৭৩

সালে চতুর্থবারের মতো আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ বাধলে তা কয়েক মাসের মধ্যে ৪০০ শতাংশ বেড়ে যায়। এতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি অপ্রত্যাশিতভাবে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার ৮০ শতাংশ আয় হয়েছে তেল রপ্তানি থেকে।[৪৩] তেলের দাম বাড়ার ফলে তেল রপ্তানিকারক আরব দেশগুলোরও প্রচুর লাভ হয়, সেই লাভের টাকায় তারা ব্যাপক সামরিকায়ন করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অস্ত্র ও সামরিক সারঞ্জাম কেনা বাড়িয়ে দেয়। এই সুবাদে সোভিয়েত ইউনিয়নেও ব্যাপক সামরিকায়ন ঘটে, প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় দেশটি আমেরিকার সমকক্ষ হয়ে ওঠে। পশ্চিমা অর্থনীতিবিদেরা জ্বালানি তেলকে বলতেন সোভিয়েত ইউনিয়নের 'আকিলিসের গোড়ালি'[৪৪] মানে অত্যন্ত নাজুক জায়গা। গর্বাচভের দুর্ভাগ্য, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই তেলের দাম কমতে শুরু করে। তেল কেনাবেচার সেই মার্কিন ডলারেরও দরপতন ঘটে। এর মধ্যেই ঘটে যায় চেরনোবিল দুর্ঘটনা, যার প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল।

আরও বড় সমস্যা হলো, সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পকারখানাগুলো ১৯৮০ এর দশক নাগাদ সেকেলে ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। বিশেষত বিশালাকার যেসব শিল্প ১৯৩০ এর দশকে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেই পুরোনো মডেলেই পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল, সেগুলোর উৎপাদনক্ষমতা ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে ব্রেঝনেভের আমলে যে ব্যাপক সামরিকায়ন শুরু হয়েছিল, তা অব্যাহত ছিল। এ রকম অবস্থায় গর্বাচভ এসে দেখলেন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার মতো অর্থনৈতিক সাধ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের আর নেই। এটা থামাতে হবে। তার পররাষ্ট্রনীতির একটা গোড়ার কথা ছিল এটাই। এজন্য তাকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটানোর উদ্যোগ নিতে হয়েছে। গর্বাচভ সামরিক ব্যয় কমানোর প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক গতিসঞ্চারের জন্য শিল্পকারখানার কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সেটা ঘটেনি। কারণ, সংস্কার করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো ছিল না। যে কমিউনিস্ট পার্টি কার্যত সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত, তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল এককেন্দ্রিক। পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক চর্চা ছিল না। ব্যাপক বিস্তৃত দুর্নীতি পার্টির জন্য হয়ে উঠেছিল এক দুরারোগ্য ব্যাধির মতো। পার্টির নেতাদের অধিকাংশই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

---

[৪৩] সূত্র: প্রথম আলো, ২৩ নভেম্বর, ২০১৭।

[৪৪] দুর্বল জায়গা বা অভেদ্য নয় এমন জায়গা বোঝাতে S. T. Coleridge সর্বপ্রথম 'আকিলিসের গোড়ালি' এই বাগধারাটি ব্যবহার করেন। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে দেখা যায়, যখন আকিলিস শিশু ছিলেন তখন তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছিল যে, তরুন বয়সেই তার মৃত্যু হবে। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আকিলিসের মা থেটিস তাকে স্টিক্স নদীতে নিয়ে যান যে নদী সম্পর্কে কথিত আছে যে সেখানে অবগাহন করলে অমরত্বের শক্তি লাভ করা যায়। এই যাদুর নদীতে ডুবানোর সময় আকিলিসের মা তার পায়ের গোড়ালি ধরে ডুবিয়েছিলেন। ফলে তার পায়ের গোড়ালি নদীর পানিতে ভেজেনি। আকিলিস বিশ্বনন্দিত যোদ্ধা হিসেবে বেড়ে ওঠেন এবং অনেক যুদ্ধ জয় করেন। একদা এক যুদ্ধে একটি বিষাক্ত তীর এসে বিদ্ধ হয় আকিলিসের গোড়ালিতে। তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়।

গর্বাচভ অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়নের উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন পেরেস্ত্রোইকার[৪৫] মাধ্যমে। সেজন্য তিনি এসে বললেন, পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র দরকার। গণতন্ত্রের চর্চা হলেই সমাজতন্ত্র আরও বিকশিত হবে। তার পেরেস্ত্রোইকার প্রথম শ্লোগানই ছিল, 'আরও গণতন্ত্র, আরও সমাজতন্ত্র'। তিনি পেরেস্ত্রোইকার আগে শুরু করেন, গ্লাসনস্ত[৪৬] কর্মসূচী। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ গ্লাসনস্তের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। তারা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল, যেন এক বিশাল বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সোভিয়েত সংবাদমাধ্যম বিশেষ করে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন এমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল, যেমনটা আগে কখনো ঘটেনি। সবাই যখন নির্ভয়ে কথা বলার ও লেখার সুযোগ পেল, তখন যে বিষয়টা প্রকট হয়ে উঠল, তা হলো অতীতের সমালোচনা। অতীতের অর্জনের চেয়ে ভুল ও ব্যর্থতাগুলো বড় হয়ে দেখা দিতে শুরু করল। র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটরা চূড়ান্তবাদী হয়ে উঠলেন, তারা বলে উঠলেন, ভুল নয়, ব্যর্থতা নয়, সেগুলো ছিল অপরাধ।

অন্যদিকে সোভিয়েত জনগণ পুঁজিবাদী দুনিয়ার খবর পেতে শুরু করল। টেলিভিশনের পর্দায় তারা দেখতে পেল ইউরোপ-আমেরিকার মানুষ কত ভালো জীবন যাপন করছে, কী চাকচিক্যময় তাদের জীবন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তাদের জনগণকে সবসময়ই বলে এসেছেন, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের চেয়ে ভালো ব্যবস্থা। কিন্তু জনগণ দেখতে পেল যে কথাটা সত্য নয়। এ রকম পরিস্থিতিতে একটা সময় খোদ কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরেই এমন একটা গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে গেল যারা সংস্কারের ধীরগতিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। ফলে সব প্রত্যাশা মিথ্যা হয়ে গেল, যখন গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রোইকার ফলে আমলাতন্ত্রে ও কল-কারখানায় ভীষণ বিশৃংখলা দেখা দিল, তখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়ল। কো-অপারেটিভের নামে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া হয়ে উঠল রাষ্ট্রীয়

---

[৪৫] সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মিখাইল গর্বাচভের আগমনের পর (১৯৮৫) দেশ ও পার্টির সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপক সংস্কারমূলক কর্মসূচী পেরেস্ত্রোইকা হাতে নেওয়া হয়েছিল। পেরেস্ত্রোইকায় প্রধান যে বিষয়গুলো স্থান পেয়েছিল তা হলো : অর্থনৈতিক সংস্কার, সামাজিক অগ্রগণ্যতা, রাজনৈতিক গণতন্ত্রায়ন, পার্টির ভূমিকা সংশোধন, মতাদর্শ, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিন্যাস, অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় সমস্যা সমাধান, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতিতে পরিবর্তন। এ বিষয়গুলোর ব্যাপক পুনর্গঠনের মাধ্যমে গর্বাচভ পূর্ব ইউরোপে এক নতুন ধারার সূচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বহুল প্রচারিত 'পেরেস্ত্রোইকা' তে লিখেছেন, "বহুবার আমি ব্যাখ্যা করেছি যে পশ্চিমা স্বার্থবিরোধী কোনো লক্ষ্য আমরা অনুসরণ করি না। আমরা জানি যে মার্কিন ও পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনীতির পক্ষে প্রধানত কাঁচামালের উৎস হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের এলাকা এবং এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে ছেদ ঘটাবার কথা আমরা চিন্তাও করি না এবং ঐতিহাসিক কারণে সৃষ্ট পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থের হানি ঘটাবার কোনো অভিপ্রায় আমাদের নেই।"

[৪৬] রুশ শব্দ গ্লাসনস্ত এর অর্থ খোলানীতি বা খোলামেলা আলোচনা। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচভ এ নীতির প্রবর্তক। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে পার্টি বা রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন নেতাদের বিরোধিতা বা সমালোচনা করার অবকাশ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ ছিল। কিন্তু গর্বাচভ ক্ষমতাসীন হয়েই অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রেই নাটকীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৫ সালে ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ নির্ভয়ে খোলামেলাভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে এবং পার্টি ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের কর্মকান্ডের সমালোচনা করতে পারবেন। গর্বাচভ নিজেই তার এ নীতিকে গ্লাসনস্ত বলে অভিহিত করেন।

সম্পত্তি লুটপাটের উৎসব, যার নেতৃত্বে ছিলেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দুর্নীতিবাজ নেতারা। জনসাধারণের দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে চলল এবং ১৯৯০ সালের শেষ নাগাদ গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রোইকা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

একদিকে দেশের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নামে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার দাবি, অন্যদিকে আরও দ্রুত ও ব্যাপক সংস্কারের নামে বাজারব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার দাবি–এ দ্বিমুখী চাপে তখন সরকার দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। সংস্কারপন্থী নেতাদের সাথে সরকারের দূরত্ব সৃষ্টি হলো, সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে যে রদবদল হলো তাতে মনে হয়, ক্ষমতা সেই সব লোকের হাতেই সংহত করা হলো যারা সংস্কারের বিরোধী। অনেকে এটাকে বললেন সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক কট্টরপন্থা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এদুয়ার্দ শেভার্দনাদজের মতো সরকারের মধ্যে থেকেও অনেকে বলতে শুরু করে দিলেন যে স্বৈরতন্ত্র ফিরে আসছে। কিন্তু গর্বাচভের সমাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করতে দেরি হয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের রাষ্ট্রটি বিলুপ্ত হওয়ার আগে ঐ দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে সমাজতন্ত্র। কার্যত এটা ঘটেছে সংবাদমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা, গ্লাসনস্তের সুযোগে সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রচারণা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের বৃহত্তর অংশকে ভীষণভাবে বদলে দিয়েছে। তাদের মনে উন্নত পুঁজিবাদী দুনিয়ার মতো বৈষয়িক সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে না বলে তাদের মনে হয়েছে। আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন চেয়েছিল, মাঝামাঝি সংস্কারমূলক পদক্ষেপে তারা আর তুষ্ট থাকতে পারছিল না। ১৯১৭ সালেও তারা কেরেনস্কির বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, বৈপ্লবিক পরিবর্তন চেয়েছিল। বলশেভিকরা অক্টোবর বিপ্লব ঘটাতে পেরেছিল সে কারণেই।

১৮. সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতাবিষয়ক প্রাসঙ্গিক শিক্ষা

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতন এবং সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনমানসে এক ধরনের অনীহা আজকের দিনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনাকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নামে প্রবল পরাক্রমশালী যে পার্টি রাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছিল, সেটি কোনোভাবেই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার শ্রমজীবি মানুষের কাছে পুঁজিবাদের বিকল্প মডেল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। এর মানে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমের শ্রমজীবী

মানুষের প্রবল অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল, তার ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক রূপটি সর্বজনগ্রাহ্য হবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল না। সেখানে অভাব ঘটেছিল এমন কিছু উপাদানের, যেগুলোকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে সার্থক কোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানী চার্লস টেলর[৪৭] মার্কসবাদের বুনিয়াদী ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৪৮] তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, মার্কসবাদের ব্যাখ্যায় একটি ঝোঁক দেখা যায় যেখানে গুরুত্ব পেয়েছে মানুষের চেতনা, স্বাধীনতা, আত্মিক মুক্তির বিষয়টি, যার সূত্র ধরে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র নির্মাণে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রশ্নগুলোতে পৌঁছানো যায় এবং এই বিষয়গুলোর গুরুত্বকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যায়।[৪৯] অপরদিকে কিন্তু আরও একটি প্রবণতা লক্ষ্যণীয় এবং কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে এই মতটিকেই অনুসরণ করে মার্কসবাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ মতানুযায়ী, সমাজতন্ত্র যেহেতু পুঁজিবাদের বিকল্প একটি ভিন্ন ব্যবস্থা, এর আশু লক্ষ্যটি হবে সম্ভাব্য সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্বকে অতিক্রম করা। সেখানে প্রয়োজন হবে দ্রুত শিল্পায়নের এবং এক ধরনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের, যাদের কাছে প্রাধান্য পাবে আর্থিক উন্নয়ন, প্রযুক্তির অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়গুলো।[৫০] এই যুক্তিতেই সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্রুত শিল্পায়নের শ্লোগানকে আশ্রয় করে সমাজতন্ত্রের একটি বিশেষ ধরনের মডেল গড়ে ওঠে, যেখানে প্রাধান্য পায় পার্টি নেতৃত্ব, পার্টি শৃঙ্খলা ও এক বিপুল রাষ্ট্রশক্তির উপস্থিতি। এগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে ব্যাহত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও গণতান্ত্রিক মানসিকতা প্রসারের গুরুত্ব।

পরিস্থিতিগত কারণে বিশ শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতাত্ত্বিকেরা সমাজতন্ত্রের এই ধরনের সমস্যাবলী নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা থেকে বিরত ছিলেন। পেরেস্ত্রোইকার পর্বে এসে এই বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা, তর্কবিতর্ক শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৭ সালে বুলগেরিয়াতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত-বুলগেরীয় আলোচনাচক্র, যেখানে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে চিরাচরিত মডেলটির যথার্থতা সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়। এই জাতীয়

[৪৭] দেখুন, Charles Taylor, 'Socialism and Weltanschauung, in Leszek Kolakowskij', Stuart Hampshire (ed.), *The Socialist Idea, A Reappraisal*, London: Quarlet Books, 1977.
[৪৮] শোভনলাল দত্তগুপ্ত, *মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জুন,২০১৪, পৃ. ১৬০।
[৪৯] *প্রাগুক্ত* ।
[৫০] *প্রাগুক্ত।*

প্রতিবেদনসমূহে সামগ্রিকভাবে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ঘিরে বর্তমানকালে যে ধরনের তর্কবিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা চলছে, তার ভিত্তিতে কতগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, তাত্ত্বিক বিচারে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সংকুচিত করে শ্রমজীবী মানুষের গণতন্ত্র ও তার প্রাতিষ্ঠানিক আধারগুলোকে প্রসারিত করতে হবে। লেনিন তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বের একাধিক রচনাতে[৫১] এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। লেনিনোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, সেখানে এর বিপরীতটাই ঘটে এবং তার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত গোটা সোভিয়েত ব্যবস্থাটিই জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে বিপর্যয় ডেকে আনে।

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে জনগণকে প্রকৃত অর্থে তাদের মননের স্তরে, চিন্তা ও সংস্কৃতির স্তরে সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক স্বার্থের গুরুত্বের মতো ধারণাসমূহকে সন্নিবিষ্ট করা। তার জন্য প্রয়োজন যথার্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে এর কোনোটাই ঘটেনি। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে নয়, রাষ্ট্র বহির্ভূত যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্টানগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাছাকাছি অবস্থান করে, তাদের মাধ্যমেই এই লক্ষ্যকে চরিতার্থ করতে হবে। যথার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সচেতনতার বিকাশে সুশীল সমাজের কাঠামোর এই আধারগুলোর ভূমিকা সমাজতন্ত্রে তাই খুব জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। লেনিনের মতো অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন।[৫২]

তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বুনিয়াদী মার্কসবাদে আমরা যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের যে মডেল আমরা দেখছি, সেটি বহুলাংশেই তার সাথে অসংগতিপূর্ণ। কিন্তু এই অসঙ্গতিকে স্বীকার না করে নিজেদের মডেলের সমর্থনে যে যুক্তি দেওয়া হলো, তার পরিণতিতে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে দীর্ঘ সময় ধরে কতগুলো একপেশে, যান্ত্রিক ধারণা সৃষ্টি হলো এবং তার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ল এই মডেলটি ও তার বিশ্বাসযোগ্যতা। অথচ লেনিনের একাধিক রচনায়, বলশেভিক পার্টির অন্যতম তাত্ত্বিক নিকোলাই বুখারিনের প্রতিবেদনে এই যান্ত্রিক, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ও গণতন্ত্রবিরোধী

[৫১] দেখুন, V. I. Lenin, *Marxism on the State*, Moscow: Progress publishers, 1972, আরও দেখুন,V. I. Lenin, 'The State and Revolution' *in Selected Works,* Moscow: Progress publishers, 1967, vol. 2.
[৫২] শোভনলাল দত্তগুপ্ত, *মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জুন,২০১৪, পৃ. ১৬০।

মডেলটির বিকল্পের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। বাস্তবে কোনোদিনই এগুলোকে আমল দেওয়া হয়নি এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে গোটা সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রই ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়ায়।

চতুর্থত, মার্কস ও লেনিনের রচনায় তত্ত্বগতভাবে সমাজতন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কী হবে, তার কোনো আলোচনা না থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টির উপস্থিতির সঙ্গে কিংবা সমাজতন্ত্রের অন্যতম পরিচালিকা শক্তি হিসেবে পার্টির ভূমিকার সাথে শ্রমজীবী মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যখন পার্টি হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের, সরকারের মুখপাত্র এবং জন্ম নেয় পার্টি ও রাষ্ট্রের গাঁটছড়ার কল্যাণে এক প্রবল ও আগ্রাসী পার্টি-রাষ্ট্রব্যবস্থা। মার্কস থেকে লেনিন কারও রচনাতেই এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সমর্থনে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে এ ঘটনাটিই ঘটেছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে। তার ফলে ব্যাহত হয়েছে সমাজতন্ত্রের যাত্রাপথ, বিকৃত হয়েছে সমাজতন্ত্রের আদর্শ, বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে অনুসৃত সমাজতন্ত্রের মডেলটি ভুল প্রমাণিত হওয়ার অর্থ এটা নয় যে সমাজতন্ত্র দ্রুত শিল্পায়ন, আর্থ-সামাজিক প্রগতি ও পুঁজিবাদের পরাক্রমকে অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে। এই লক্ষ্যগুলো অনেক বেশি কার্যকরীভাবে পূরণ করার জন্যই বরং প্রয়োজন শ্রমজীবী মানুষের গণতন্ত্রকে সার্থক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া, পার্টিরাষ্ট্রের তত্ত্বকে খন্ডন করা এবং রাষ্ট্রশক্তির সংকোচন ঘটিয়ে বিপুল শ্রমশক্তির উন্মেষ ঘটানো যার সবগুলোই বুনিয়াদী মার্কসবাদের শিক্ষা।

১৯. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আলোকবর্তিকা

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাত দশকেরও বেশি সময় টিকে ছিল। আজ সে রাষ্ট্র আর নেই। বিগত তিন দশক ধরে আমরা সোভিয়েতবিহীন বিশ্বে বসবাস করছি। এই সময়কালের অভিজ্ঞতা সোভিয়েত ইউনিয়নের উপস্থিতির মূল্য অনুধাবনে সহায়ক হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নমূলক পরিবর্তনসহ অনেক দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পেছনে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অমূল্য অবদান।

যুগ যুগ ধরে মানুষ শোষণহীন ও সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে উনিশ শতকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। তাঁদের মতাদর্শ ধারণ করে লেনিনের পরিচালনায় ও বলশেভিক পার্টির (কমিউনিস্ট পার্টি) নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় দেশে দেশে অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিপ্লব থেকে সোভিয়েত বিপ্লবের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, আগের সব বিপ্লব কেবল শাসকশ্রেণির ও শোষণের রূপ ও পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল, কিন্তু শোষণের অবসান ঘটাতে পারেনি। অন্যদিকে সোভিয়েত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছিল মানুষের ওপর মানুষের শোষণের অবসানের যুগ। বলা যায় যে এটি ছিল এক মহাবিপ্লব।

সোভিয়েত বিপ্লবের আগে রাশিয়া ছিল পিছিয়ে থাকা একটি দেশ। রাশিয়াকে বলা হতো ইউরোপের পশ্চাৎভূমি। জারের আমলে অনাহার, দারিদ্র্য ও অসহনীয় শোষণ ছিল জনগণের নিত্যসঙ্গী। উন্নত শিল্প দূরের কথা, সাধারণ মানের শিল্প উৎপাদনের ব্যবস্থাও সেখানে তেমনভাবে ছিল না। জারের শাসনামলে রাশিয়ায় সামান্যতম গণতান্ত্রিক অধিকারও ছিল না। বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত নতুন সোভিয়েত সরকারের প্রধান পদক্ষেপগুলো ছিল প্রথমত, 'শান্তির ডিক্রি'র মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য অবিলম্বে শান্তি আলোচনা শুরুর ঘোষণা করা। দ্বিতীয়ত, 'জমির ডিক্রি'র মাধ্যমে খোদ কৃষককে জমির ওপর অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, সর্বপর্যায়ের সোভিয়েতগুলোর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা সংহত করা। অন্যান্য ডিক্রি ছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, অবৈতনিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের নতুন ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কিত।

বিপ্লবে বিজয়ের পর সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের কাজ শুরু করার আগেই সোভিয়েত বিপ্লব প্রতিবিপ্লবী শক্তির আক্রমণের মুখে পড়ে। বেশ কিছু সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের সামরিক বাহিনী আগ্রাসন শুরু করে। এদের সাথে যুক্ত হয় দেশের অভ্যন্তরে ক্ষমতাচ্যুত শাসকশ্রেণির অনুগত শ্বেত সেনাবাহিনী। চার বছরের গৃহযুদ্ধের পর 'লাল ফৌজ' দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সেই প্রত্যক্ষ আক্রমণকে পরাভূত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। আরও বড় আঘাত আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। ফ্যাসিবাদ বিশ্বকে গ্রাস করতে যুদ্ধ শুরু করে। হিটলারের নাৎসি বাহিনী দেশের পর

দেশ দখল করে নিতে থাকে। কিন্তু লাল ফৌজের অসীম সাহসী লড়াই ও বীরত্বের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল হিটলারের বাহিনী সোভিয়েত সেনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তিন কোটি মানুষের প্রাণের বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন রক্ষা করে বিশ্বকে, মানবসভ্যতাকে। মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের কারণেই বিশ শতকের মহাবিপদ ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়।

এসব বাধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাত্র দুই দশকের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। শোষিত-বঞ্চিত সব শ্রেণি শোষণ থেকে মুক্তি পায়। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা হয় কাজসহ সাধারণ মৌলিক চাহিদাগুলো। এক দশকের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য আসে। নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে। দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক সরকার ১৯২৭ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দু-তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। ১৯২৯-১৯৩৩ সালের মহামন্দায় যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন উন্নত পুঁজিবাদী দেশ আক্রান্ত হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্পর্শ করতে পারে নি।

সমাজতন্ত্র প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেয়, মানুষকে দীর্ঘ আয়ু দান করে, নারীদের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার, শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষকে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান এবং বঞ্চিত ও নিপীড়িত জাতিসমূহকে মুক্ত করে। সব ধরনের পুরোনো সংস্কৃতি, যেমন গোষ্ঠীবাদ, জাতীয়তাবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ইত্যাদি অপসারণ করা হয়। প্রতিক্রিয়াশীলতা, ভোগবাদ, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটানো হয়। প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নতুন চেতনা, মূল্যবোধ ও আত্মমর্যাদার উন্মেষ ঘটে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও ঘটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মহাবিশ্বকে স্পর্শ করে স্পুতনিক। ১৯৫৯ সালে মহাশূন্যে প্রথম পাড়ি দেন সোভিয়েত নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন। সব মিলিয়ে সোভিয়েত ব্যবস্থা উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হয়। একটি পিছিয়ে পড়া দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে ওঠে একটি পরাশক্তি।

সোভিয়েত বিপ্লবের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের আন্দোলন জোরদার ও ব্যাপক বিস্তৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপসহ বিশ্বের প্রায় এক ডজন দেশ সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করে। চীনে বিপ্লব সফল হয়। গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা। একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামও তীব্রতা লাভ করে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই বেগবান হয়। এশিয়া ও

আফ্রিকার শতাধিক দেশ অর্জন করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সদ্য স্বাধীন এসব দেশের জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনেও সোভিয়েত ইউনিয়ন আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে। ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর পক্ষে দাঁড়ায় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। অনেক দেশের যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা মোকাবিলা করতে গিয়ে সোভিয়েত সেনারা জীবন পর্যন্ত দিয়েছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণে নানা ভুল-ত্রুটির কারণে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ যে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিকতা বিলুপ্ত হওয়া বোঝায় না, তার নিদর্শন আজ আমরা দেশে দেশে দেখতে পাচ্ছি। সমাজতন্ত্রের শক্তি কিছুটা দুর্বল হলেও নিঃশেষ হয়নি, বরং দেশে দেশে তা আবার জেগে উঠতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গভীর সংকটে। সমাজতন্ত্রেই এই সংকটাবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহ এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের আলোকে সংকটাবস্থার মধ্যে থাকা দেশগুলোকে পথ দেখাবে।

২০. পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহ এখন ঐতিহাসিক ঘটনা। এক শতক পূর্বে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেটা বিশেষ কোনো দেশের ব্যাপার ছিল না, ব্যাপার ছিল সারা বিশ্বের। সেটা ছিল এমন একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব, বিশ্বকে যা বদলে দিয়েছিল। এই বিপ্লব মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আগেও হয়েছে, দার্শনিক ও লেখকেরা স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সর্বপ্রথম ১৭৮৯ সালে ফরাসি দেশে হয়েছিল। বানীটি ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর। স্বাধীনতা এসেছিল কেবল ধনীদের জন্য, ফলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর আট দশকেরও বেশি সময় পরে প্যারিসে আরেকটি বিপ্লব হয়, সেটিতে সাম্য অর্জিত হয়েছিল। নেতৃত্বে ছিল মেহনতি মানুষ। সেখানে গৃহযুদ্ধ হয়েছে, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে। তবে সে সাম্য ব্যবস্থা বেশিদিন টেকেনি। আগের সব বিপ্লবী প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা থেকে সারবস্তু ও রুশ দেশের সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত বিপ্লব ঘটে। সেখানে সাম্য প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু হয়। ব্যক্তিমালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানার প্রক্রিয়া শুরু হয় ও দেশটি তখন বলতে পারে, আমাদের এখানে কোনো মানুষ অভুক্ত নেই, কেউ নিরক্ষর নয়, বাস্তুহারা নয়। তারপর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে পূর্ব ইউরোপ, চীন, কিউবা ও ভিয়েতনামে। বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষ শোষণ থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে। উন্নতি ঘটেছিল অভূতপূর্ব।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সমাজতন্ত্র যদি এতই ভাল হবে, তবে তার পতন হলো কেন? আসলে সমাজতন্ত্রের পতন হয়নি, পতন হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। তা পুঁজিবাদে ফিরে গেছে। কারণ, বাইরে থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদ ছলে-বলে-কৌশলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিতে চেয়েছে। নিজেদের দেশে মেহনতি মানুষকে তারা কিছু কিছু ছাড় দিয়েছে, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে। আর ওই রাষ্ট্রগুলোর ভেতরেও আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যারা অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালিয়েছে। বাইরের আক্রমণ ও ভেতরের অন্তর্ঘাত–এই দুইয়ে মিলে রাষ্ট্রগুলোকে সমাজতন্ত্র থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সমাজতন্ত্র পরিত্যাগ করে ওই রাষ্ট্রগুলোর মানবিক চেহারা বদলে গেছে। বৈষম্য ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। রাশিয়ায় নতুনভাবে জারতন্ত্র ফিরে এসেছে। চীন এখন মিয়ানমারের গণহত্যাকে পর্যন্ত সমর্থন দিচ্ছে।

সমাজতন্ত্রীরা এখন মনে করছেন, সমাজতন্ত্র কখনো বিলুপ্ত হবে না, বরং পতন ঘটবে পুঁজিবাদের। তার পতন ঘটবে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক কারণে। মানুষের সভ্যতার বিবর্তন হয়েছে। সে আরও এগোবে। একসময় ছিল দাস ব্যবস্থা, পরে এসেছে সামন্ত ব্যবস্থা, তারপর এল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ ইতিহাসের শেষ কথা হতে পারে না, হবে না। তার পতন ঐতিহাসিকভাবেই অনিবার্য। দাস ব্যবস্থা, সামন্ত ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদ–এ তিনের ভেতর অনেক পার্থক্য, কিন্তু ঐক্য আছে এক জায়গায়, সেটা হলো ব্যক্তিমালিকানা। এই তিন ব্যবস্থাই ব্যক্তিমালিকানাকেন্দ্রিক। ব্যক্তিমালিকানায় মুষ্টিমেয় মানুষ সম্পদের মালিক হয়েছে, অধিকাংশকে শোষণ ও বঞ্চিত করে। অথচ সম্পদ সৃষ্টি করেছে এই শোষিত ও বঞ্চিতরাই। ব্যক্তিমালিকানার শেষ অবস্থা পুঁজিবাদ। কিন্তু পুঁজিবাদ একটি বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক ব্যবস্থা। এটি এর মূল সংকট। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ সমাজতন্ত্র।

পুঁজিবাদ মুনাফানির্ভর, অনবরত সে মুনাফা খোঁজে। মুনাফা ছাড়া আর কিছু চেনে না। মুনাফার লালসায় সে মানুষ মারে, প্রকৃতিকে ধ্বংস করে। যুদ্ধ বাধায়, মারনাস্ত্র তৈরি করে, মাদকের কারখানা বসায়। নিজেকে রক্ষা করার জন্য সব চেষ্টা শেষ করে দিয়ে এখন সে চরম ফ্যাসিবাদী রূপ নিয়েছে। পুঁজিবাদ যে কতটা বর্বর, অমানবিক ও বেপরোয়া হতে পারে, তা দুটি বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেছে। দেখা যাচ্ছে মিয়ানমারে, যেখানে দেশের সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘু একটি জনগোষ্ঠিকে গণহত্যার মধ্যে দিয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে বলে ঠিক করেছে এবং গণধর্ষণের মতো

নিপীড়নের নিকৃষ্টতম হাতিয়ারসমূহ প্রয়োগ করছে। এই বর্বরতা পুঁজিবাদের। নানারূপে ও ছদ্মবেশে এর দৌরাত্ম্য এখন পৃথিবীব্যাপী চলছে। কোথাওই পুঁজিবাদবিরোধী অভ্যুত্থানের যে লক্ষ্য, সেটি অর্জিত হয়নি। রাষ্ট্র ও সমাজ রয়ে গেছে আগের মতোই। উন্নতি যা হয়েছে তা পুঁজিবাদী ধরনের। পুঁজিবাদী উন্নতির পরিণাম এমনই হওয়ার কথা। সমস্যাটা কেবল আইনের শাসনের অনুপস্থিতির নয়, কথিত নৈতিক অধঃপতনেও এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। এসব সমস্যা যার গভীরে নিহিত আছে সে হলো পুঁজিবাদ।

পৃথিবীতে একসময় ডাইনোসর নামে অতিকায় এক প্রাণি ছিল। হাজার হাজার বছর টিকেছে। তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কারণ, পরিবর্তিত পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি। তাদের বুদ্ধি ছিল না, হাত ছিল না, হাতিয়ারের ব্যবহারও জানত না। একইভাবে পুঁজিবাদও বিদায় হবে। পুঁজিবাদীদের বুদ্ধি আছে, হাত আছে, হাতিয়ার আছে কিন্তু বিবেক নেই, উল্টোদিকে তার আছে অপরিমেয় লোভ ও লালসা। মানবসভ্যতার জন্য এবং তার নিজের জন্য যে মহাসংকট পুঁজিবাদ সৃষ্টি করেছে, সেটি থেকে সে বের হয়ে আসতে পারবে না। কাজেই পরিবর্তন আসবে। কোনো এক দেশে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে। মুক্তিকামী মানুষের দায়িত্ব সেই অপরিহার্য ও অনিবার্য পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা। সেক্ষেত্রে পরিবর্তনের পথপ্রদর্শক হতে পারে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কাউকে ভয় দেখানোর জন্য নয়, বরং সবাইকে এ কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে পৃথিবীর সব উন্নতির পেছনে রয়েছে মানুষের শ্রম। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহে আপোসের কোনো জায়গা ছিল না, ছিল কেবল সমাজবিপ্লবীদের ঐক্য ও তাদের জ্ঞানের প্রয়োগ। বিপ্লবের ক্ষেত্রে আপোসের কোনো জায়গা নেই। সমাজবিপ্লবীদের ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই এবং জ্ঞানের সৃষ্টিশীল প্রয়োগ ছাড়া মুক্তি নেই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসমূহের উদ্দেশ্য হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন। আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চালিকাশক্তি হচ্ছে শ্রেণিসংগ্রাম। শ্রেণিবিভাজন ও শোষণ থাকলে শ্রেণিসংগ্রাম থাকবেই। শ্রেণিসংগ্রামের ভেতর দিয়েই শ্রেণিবৈষম্য দূর হবে, অর্জিত হবে সাম্য এবং প্রতিষ্ঠিত হবে সমবন্টনব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠারই ডাক দেয়।

পঞ্চম অধ্যায়
পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

১. পুঁজিবাদী গণতন্ত্র

বর্তমান বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র এক অনন্য ধারণা। এর অনুসারীরা মনে করেন, এটি সর্বোৎকৃষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের সাথে সর্বোত্তম রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রের সমন্বয় সাধন করেছে। এই সমন্বয় সাধিত হয়েছে বিশ শতকের শুরুতে, যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিচালিত হতো অনিয়ন্ত্রিতভাবে। সে সময়ে কিছু কিছু দেশে সরকার সম্পদশালীদের ক্রমবর্ধমান নিরঙ্কুশ ক্ষমতার হাত থেকে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করত। সম্পদশালী বলতে বিশেষভাবে কেবল সম্পদের অধিকারী বা ধনী ব্যক্তিদের বোঝায় না। ঐতিহাসিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় 'সম্পদশালী' ধারণাটি একটি শ্রেণিচরিত্র অর্জন করেছিল। আর্নল্ড টয়েনবি[১] এবং উইল ডুরান্টের[২] মতো ঐতিহাসিক সম্পদশালীদের একটি শ্রেণি হিসেবে নির্দেশ করেছেন, যারা সাধারণত যেকোনো উপায়ে তাদের ক্ষমতা এবং সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদেরকে আলাদা অবস্থানে নিয়ে যায় এবং পরিণামে সমাজকে ধ্বংস করে। প্রকৃতপক্ষে, ধনী এবং গরিবের মধ্যে অস্থিতিশীল আয়বৈষম্য ও সম্পদের অসমতা জাতীয় বিভেদের প্রধান লক্ষণ।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র হলো একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভাবাদর্শ, যেখানে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সমন্বিত হয়। এটি একটি ত্রিবিধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যেখানে তিনটি বিষয় বিদ্যমান থাকে: ব্যক্তিগত খাতে পরিচালিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিনির্ভর বাজার অর্থনীতি, মুক্তবাজারে অর্থনৈতিক উদ্দীপক ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং উদারনৈতিক সাংস্কৃতিক পদ্ধতি যা বহুত্ববাদকে উৎসাহিত করে।[৩] এই মতবাদ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে যা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৪] সামাজিক সুবিধাভোগী গ্রুপ, যেমন রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক লবিস্টদের প্রভাবকে সীমিত করে এই মতবাদ যৌথ স্বার্থের

---

[১] দেখুন, Arnold Toynbee, 'Heroic Ages: Contacts Between Civilizations in space' *A Study of History,* v. 8, Oxford University Press, 1969.

[২] দেখুন, Will and Ariel Durant, *The Lessons of History*, 1st ed, New York, Simon & Schuster, 1968.

[৩] Novak, Michael, *The Spirit of Democratic Capitalism,* New York, The free press, 1993, p. 31.

[৪] Benne, Robert, *The Ethic of Democratic Capitalism:A Moral Reassessment,* Philadelphia: Fortress Press, 1981, p. 97.

পক্ষে অবস্থান নেয়। এমনটা বলা হয়ে থাকে যে, যুদ্ধত্তোরকালের পৃথিবীতে যে কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলেই আধুনিক পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্রের সমন্বিত অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়েছিল। এই ধারণাই পুঁজিবাদের পক্ষে একটি আপাত স্থিতিশীল ও বিশ্বব্যাপী সমর্থন সম্ভবপর করে তুলেছিল। ইতিহাসের এই অধ্যায়টিকে সবসময়ই পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ধারণাটি মধ্যযুগ থেকেই চলে আসছে। এটি নির্ভরশীল মূলত উদারনৈতিকতার নীতি এবং রাজনৈতিক দলের ভাবাদর্শের ইতিহাসের ওপর, যেখানে স্বাধীনতা ও সমতার ধারণা নিহিত থাকে।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র শুধু কোনো অর্থনৈতিক পদ্ধতি নয়; এটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাবাদর্শগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়সমূহের একটি প্রগতিশীল যৌগ। এ রাজনৈতিক আদর্শ কয়েক শতকের দর্শন, অর্থনীতি, আইন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের মতো বিষয়সমূহের মৌলিক ধারণা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পূর্ব ইউরোপের দেশের জাতিগুলো তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র এবং বাজার অর্থনীতির সমন্বয়ে এক বৈপ্লবিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র তিনটি পদ্ধতির মিশ্রণ: ১. অর্থনীতিনির্ভর একটি মুক্তবাজার এবং অর্থনৈতিক উদ্দীপক, ২. একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এবং ৩. একটি চিরায়ত উদারনৈতিক সাংস্কৃতিক পর্যায় যা বহুত্ববাদকে[৫] উৎসাহিত করে। মুক্তবাজার চাহিদা ও যোগানের এক জটিল সম্পর্ক তৈরি করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক গতিশীলতা এবং নতুনত্বকে উৎসাহিত করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সাংবিধানিক পদ্ধতির সরকারকে স্বীকৃতি দেয় যেখানে ব্যক্তি এবং সমষ্টি উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। নৈতিক অনুশীলন কতগুলো মূল্যবোধ যেমন, কাজের নৈতিকতা, ব্যক্তি উদ্যোগ, সততা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতি ইত্যাদি ধারণ করে সেগুলোকে যেগুলো বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, চার্চ এবং এ ধরনের স্বাধীন ঐচ্ছিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত। প্রাকৃতিক

[৫] ধাতুগত অর্থে বহুত্ববাদ সৃষ্টির আদিসত্তা সম্পর্কীয় মতবাদ। এ মতবাদ অনুসারে এক বা দুই সত্তার সাহায্যে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা করা যায় না, সঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে বহুত্ববাদ মেনে নিতে হয়। প্রাচীন আইওনীয় দার্শনিকদের চিন্তাধারা থেকে শুরু করে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের ব্যাখ্যায় বহুত্ববাদী মতবাদের পর্যালোচনা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে মৌলিক রাজনৈতিক আদর্শসমূহের আপাত ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন একাধিক রাজনৈতিক আদর্শের সম্মিলিত ব্যবস্থা সমকালীন রাষ্ট্রদর্শনে বহুত্ববাদী ধারণার সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রদার্শনিক চিন্তা হিসেবে বহুত্ববাদ রাজনৈতিক অঙ্গনে বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি দেয়। এখানে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, সম্পর্ক, বিশ্বাস এবং জীবনপদ্ধতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুমোদন করা হয়। বহুত্ববাদে মনে করা হয় যে, সুনির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক আদর্শ বা বিশ্বাস রাষ্ট্রীয় চুক্তি বা সংলাপকে সম্ভবপর করে তুলতে নাও পারে। বহুত্ববাদ বিশ্বাস করে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যকার দ্বন্দ্বসমূহের পর্যালোচনা এবং রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সংলাপ আমাদেরকে একটি আপাত সার্বজনীন ভালত্বের নির্দেশনা দিতে পারে। এই সার্বজনীন ভালত্ব কোনো বিমূর্ত রাজনৈতিক আদর্শ নয়, এটি কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনৈতিক আদর্শ ও রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করার চেষ্টা মাত্র।

স্বাধীনতার নিয়মানুসারে, আমরা সংঘ বা শ্রমিক ইউনিয়নের মতো অসংখ্য ঐচ্ছিক সংগঠন গঠন করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। আমাদের রাজনৈতিক পদ্ধতি বহুত্ববাদকে মেনে নেয়, স্বীকার করে নেয় যে ব্যক্তির মতামত এবং ব্যক্তিস্বার্থে ভিন্নতা আছে। এটি ব্যক্তিকে তার স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে স্বাধীনভাবে সংগঠিত হওয়ার অনুমোদন দেয়। বহুত্ববাদে প্রগতিশীল নানা গ্রুপ তাদের কাজের মাধ্যমে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে।

পুঁজিবাদ এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে স্বাধীনভাবে চিন্তাশীলতা এবং ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ডকে উৎপাদনে নিয়োজিত করা যায়। এটি মূলত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, অর্থনৈতিক ন্যায়পরতা, মুনাফার অভিপ্রায়, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা, শ্রমবিভাজন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পূর্বস্বীকৃতি এবং গণতন্ত্র, অনুমোদনের নীতি এবং রাজনৈতিক সমতানির্ভর। একে আখ্যায়িত করা যেতে পারে একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে যেখানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সংখ্যাগুরুর মতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়। অবশ্য বলা হয় যে, পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয় কিন্তু পর্যাপ্ত নয়, কেননা গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন মৌলিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যা রাষ্ট্র থেকে ভিন্ন।

ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন রাষ্ট্রনীতির পূর্ববর্তী, অন্যদিকে রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতির পূর্ববর্তী। ফলস্বরূপ যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়েছে তা মুক্তবাজার ও পুঁজিবাদের সংগঠনকে অনুমোদন করে। এর প্রণেতারা যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক। প্রতিযোগিতা ব্যক্তির আগ্রহ ও যোগ্যতাকে নৈপুণ্যের দিকে নিয়ে যায়, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ঐচ্ছিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবিষ্যতের প্রতিবিধান করে এবং এভাবেই সর্বোচ্চ সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। এভাবে ব্যক্তিস্বার্থই পারে (এবং প্রতিনিয়ত করে থাকে) অর্থনৈতিক প্রাচুর্য আনতে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এবং স্বাধীন ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করতে। এটি অ্যাডাম স্মিথের 'অদৃশ্য শক্তির'[৬] কাজের প্রতিরূপ।

[৬] সমাজের ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করতে গিয়ে যা করে তার মধ্য দিয়ে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেই সমাজের সকলের মঙ্গল সাধন করে বা সামজিক কল্যাণ সাধন করে ফেলে, এই বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য অ্যাডাম স্মিথ অদৃশ্য শক্তি (**invisible hand**) এই বিশিষ্টার্থক ব্যক্যাংশটি ব্যবহার করেছিলেন। আয় ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে থাকে বলে স্মিথ মন্তব্য করেন। তিনি মনে করতেন, অনেক সময় ব্যক্তির এ ধরনের কাজের মাধ্যমে এমন পরিমাণ সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয় যা ঐ ব্যক্তি সামাজিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে কাজ করলে হয়ত করতে পারত না।

২. স্বাধীনতার ধারণা

সমন্বিত রাজনৈতিক তত্ত্বে বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষ হওয়ার গুণেই আমরা ইচ্ছার স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারী এবং তা ভোগ করার একটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার আমাদের আছে। আমরা স্বাধীনভাবে সম্পত্তির অধিকারী হতে পারি, কর্ম নির্বাচন করতে পারি, উপাসনা করতে পারি, কথা বলতে পারি, ভ্রমণ করতে পারি, আমাদের ব্যক্তিস্বার্থ, পরিচিতি, চুক্তি, প্রতিযোগিতা, সৃষ্টিশীলতা, অন্যের সাথে সুসম্পর্ক বজায় ইত্যাদি রক্ষা এবং উন্নত করতে পারি। কিন্তু সমন্বিত রাজনৈতিক তত্ত্বই চূড়ান্ত কথা নয়। অনুমোদিত স্বাধীনতা বা আইনসিদ্ধ স্বাধীনতা সম্পর্কিত আমাদের ধারণা আসে স্বাধীন কাজ, আইন, কর্তব্য, দায়িত্বশীলতা, গভীর চিন্তা, বিবেক, ন্যায়পরতা, বিচারবুদ্ধি, নীতিবোধ হতে; যেগুলো যুক্তিতর্কের উর্দ্ধে অবস্থান করে। প্রকৃত স্বাধীনতা হলো কোনো কিছু করার সেই সামর্থ্য, যা ভুল কাজের অধিকারকে স্বীকার করে না।

আমাদের স্বাধীনতার ধারণা আইন, নিয়মকানুন এবং সামাজিক প্রথা দ্বারা সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষাকল্পে কতকগুলো আচরণকে সীমাবদ্ধ করা দরকার যেগুলো অন্যের স্বাধীনতা বিঘ্নিত করে। আমাদের সমাজে, কাজের স্বাধীনতা নির্ভর করে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ এবং পদ্ধতিগত স্বাধীনতার ওপর। যখন মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং শ্রমের ফলাফল ভোগ করতে পারে, তখন তাদের সাথে ন্যায় হয়েছে বলা যায়। ন্যায়পরতা হচ্ছে সেই গুণ যা প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দেয়ার অনুমোদন দেয়। যখন মানুষ দেখে যে পুরষ্কার বা কাজের ফলাফল প্রাপ্তি নির্ভর করে ব্যক্তির চেষ্টা এবং উৎপাদনের ওপর, তখন কাজের প্রতি তাদের উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা, ন্যায়পরতা এবং উৎপাদনক্ষমতা এই গুণগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না।

যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের স্বাধীনতা কেবলমাত্র একটি বিকশিত সমাজেই সম্ভবপর। সভ্য সমাজের অস্তিত্বের জন্য পরিবার এবং রাষ্ট্রের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ অপরিহার্য। অন্যান্য ধরনের প্রতিষ্ঠান যেমন যেকোনো সংঘ এবং শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এর সদস্যদের বিশেষ কোনো চাহিদার প্রয়োজনে।

৩. সংঘ ও শ্রমিক ইউনিয়ন

নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে বিপুল পুঁজি কেন্দ্রীভূত না করেই বিশ্ববাসী গত দুই শতকেরও বেশি সময়ে বিস্ময়কর পরিমাণ প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক অগ্রগতি সাধন করেছে। কোনো সংস্থা বা সংঘের সদস্য হবার মানসিকতা ও যোগ্যতা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্যে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। যেসব দেশ বিশ্বে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে বিরাজ করছে, তারা এ অবস্থায় আসতে সক্ষম হয়েছে মূলত সংগঠিত হওয়ার মানসিকতার কারণে।

ইউনিয়ন বা সংঘের ধারণা গঠিত হয় স্বেচ্ছাধর্মী এবং বাধ্যতামূলক উপাদানের সমন্বয়ে। স্বেচ্ছাধর্মী সংঘগুলো গণধর্মঘট এবং বয়কট করার মতো কাজের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখে। বাধ্যতামূলক সংঘগুলো হলো সেইসব সংঘ যারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার সাথে সাথে ব্যক্তিগতভাবে শারীরিক আক্রমণের মতো কিছু অযৌক্তিক কাজও করে। যেমন, পিকেটিংকে অবশ্যই বৈধ বলে বিবেচনা করা উচিত যেখানে এর উদ্দেশ্য থাকে সরবরাহকারী, ক্রেতা, প্রতিযোগিতাকারী, এবং শ্রমজীবীর প্রতি নিয়োগকর্তার জবরদস্তিমূলক সিদ্ধান্ত ও শারীরিক লাঞ্ছনামূলক ঘটনাসমূহ ঘটে থাকে। যদিও ইউনিয়নভুক্ত ও ইউনিয়নের বাইরের সব ধরনের শ্রমিকের সমধর্মী মানবাধিকার স্বীকৃত, তবুও ইউনিয়নের বাইরের শ্রমিকেরা বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করে। যেমন, তারা ব্যক্তিস্বার্থের অতি ক্ষুদ্র ইউনিটের প্রতি মনোযোগী হতে পারে, তারা অন্যত্র চাকুরীর চেষ্টা করতে পারে, যেমনটা ইউনিয়নভুক্ত কর্মচারীরা স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে পারে না। কারণ, একটা চাকুরী হচ্ছে দুটি ভিন্নধর্ম (মালিক-শ্রমিক) অথচ কোনো বিষয়ে সম্মত দলের মধ্যে চুক্তির প্রতিমূর্তি। এটাকে কোনো ব্যক্তি বা কোনো দল নিজের মনে করতে পারে না। যদি ঐচ্ছিক সংঘগুলো এবং পারস্পরিক সম্মতিই চাকুরি বা কাজের বৈধ ভিত্তি হয়ে থাকে তাহলে একদল শ্রমিককে অন্যদলের সাথে চাকুরীর জন্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জোরপূর্বক বাধাপ্রদানকে অবশ্যই বৈধ বলে বিবেচনা করতে হবে।

উদারতাবাদী অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, সংঘ হলো শ্রমিকদের একাধিপত্য যার প্রাথমিক প্রভাব হলো এর সদস্যদের মজুরি বা শ্রমমূল্যের দাবির সুরাহা যা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানকারী কোনো শ্রমিকের ক্ষেত্রে কাজ করে না। অর্থনৈতিক ক্রিয়াশীলতায় এটি ফলদায়ক হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি যে খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তা হলো, উৎপাদনশীলতায় সংঘের নীতিসমূহই কাজ করে, সর্বোচ্চ উৎপাদন প্রধান লক্ষ্য হয় না। শ্রমিক ইউনিয়নের প্রভাবের কারণে শ্রমের অপচয় হয়। ফলে মালিকপক্ষ উৎসাহী হয় যেকোনো ধরনের সংঘবিহীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এবং তারা চায় সবসময় শ্রমিকদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখতে। কেউ কেউ আবার শ্রমিক ইউনিয়নের গুণকীর্তন করে বলেন, এটি শ্রমিকদের দক্ষতার উন্নতি ঘটায় এবং তা ধরে রাখতে সহায়তা করে, কারখানায় কী ঘটছে তা শ্রমিকেরা সবসময় জানতে পারে, শ্রমিকদের মনোবল বৃদ্ধি পায়, দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের জন্য তারা মালিকদের চাপ দিতে পারে এবং মালিকপক্ষের অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিবাদ করতে পারে।

শ্রমিক সংঘ বা শ্রমিক ইউনিয়নের গতানুগতিক ধারণায় বলা হয়ে থাকে যে, শ্রমিকদের নৈতিক দায়িত্ব হলো মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা, মালিক প্রদত্ত যৌক্তিক আদেশ পালন করা, যাতে সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত হয়। তেমনিভাবে, শ্রমিক নেতাদের একমাত্র দায়িত্ব হলো সংঘের সদস্যদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করা। সাম্প্রতিককালের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয়, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের স্বার্থরক্ষার উর্দ্ধে কারখানার কার্যনির্বাহী সদস্যগণ এবং শ্রমিক নেতাদের একটি সামাজিক দায়িত্বও আছে।

৪. সামাজিক দায়িত্বশীলতা

সামাজিক দায়িত্বশীলতার ধারণা বিশেষভাবে আলোচনায় চলে আসে বিশ শতকের প্রথমার্ধে, যখন সংঘগুলো প্রতিনিয়তই সমাজবিরোধী এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাববিরোধী কর্মকান্ডে নিয়োজিত বলে সমালোচনার মুখোমুখি হতে থাকে। ব্যবসাবিরোধী এ ধরনের মনোভাবের ফলে কিছু ব্যবসায়ী প্রতিনিধি তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ ও শক্তি সামাজিক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নিজেদেরকে এভাবে বিবেচনা করতে বলা হয় যেন তারা প্রত্যেকে সার্বজনীন ব্যক্তিঅধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত। এ মতানুসারে, কর্মচারীদের এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে তাদের কারখানার সাথে সম্পর্কযুক্ত মজুদকারী ও পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাথে শ্রমিকগণ, ক্রেতা, সরবরাহকারী, সমাজের সদস্য এবং সাধারণভাবে সমাজের সকলে সর্বোচ্চ লাভবান হতে পারে।

দুটি সাধারণ মতবাদ-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ[৭] এবং সমভোগতন্ত্রবাদ[৮] নিয়ে সমকালীন বিশ্বে বিতর্ক রয়েছে। প্রথমোক্ত মতবাদের অবস্থান হলো সামাজিক দায়িত্বশীলতার পক্ষে যা অংশত নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিকতার ওপর। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে যেকোনো সংঘকে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশের হাতিয়ার

---

[৭] ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবাদর্শ ব্যক্তির নৈতিক মূল্যায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তির নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কামনা-বাসনার স্বার্থে ব্যক্তিস্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতার ওপর জোর দেয়। এ মতবাদ রাস্ট্রীয় বা গোষ্ঠীস্বার্থের উর্দ্ধে ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষে। এ মতবাদ অনুসারে ব্যক্তি হচ্ছে মুখ্য এবং সমাজ-সম্প্রদায় গৌণ, অর্থাৎ ব্যক্তির জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য ব্যক্তি নয়। এ মতবাদ ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের জয়গান করতে গিয়ে সমাজের চেয়ে ব্যক্তির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা সমাজ বলতে এসব স্বতন্ত্র ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝেন। এসব স্বনির্ভর ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিরা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজ গড়ে তোলে।

[৮] সমভোগতন্ত্রবাদ একটি সমাজদার্শনিক ও রাষ্ট্রদার্শনিক মতবাদ। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, ব্যক্তির আত্মপরিচয় নির্ধারণ, ব্যক্তিকল্যাণ সাধন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সমভোগতন্ত্রবাদ জোর দিয়ে থাকে। সমকালীন উদারনীতিবাদ এবং অবাধ ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যবাদ নামক দুটি প্রখ্যাত দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে ১৯৮০ এর দশকে এ মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল। সমভোগতন্ত্রবাদী দর্শনে ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। এ মতবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, একজন ব্যক্তির সামাজিক পরিচিতি এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশে সম্পদায়গত সম্পর্কের ভূমিকা সর্বাধিক। যদিও একটা পরিবারকে সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়, বৃহত্তর ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের বিপুল সংখ্যক লোকের নানাবিধ বিষয়ে মিথষ্ক্রিয়া যেমন, তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের আদান-প্রদান, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কর্মকান্ডে সমষ্টিগত অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলোর মধ্যে দিয়ে সমভোগতন্ত্রবাদ পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয়ে ওঠে।

হিসেবেই দেখা হয়, সমাজে কোনো শক্তি প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে নয়। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি সংঘের কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না। সংঘের সদস্যরা নির্ধারিত কর দেবে এবং রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন মেনে চলবে এটাই স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। অন্য কথায়, যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী পরিষদ সে প্রতিষ্ঠানের মূল কাজগুলো দেখভাল করবে যাতে বিনিয়োগকারীর অর্থ বা মূলধন সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। যেকোনো কাজ বা শ্রমিকের দক্ষতার বিশেষীকরণ এবং বিনিয়োগকারী, শ্রমিক, মুনাফাকারী সকলের স্বার্থ সংরক্ষণকে সমাজে কার্যনির্বাহীদের সর্বোত্তম সংগঠন পদ্ধতি হিসেবে দেখা হয়। যখন প্রতিটি সংঘ আইনসঙ্গতভাবে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে, ফলস্বরূপ তখন সমাজের সর্বোচ্চ ভাল সাধিত হয়।

বিপরীতদিকে, সমভোগতন্ত্রবাদ অনুসারে সমাজের সদস্য হওয়ার কারণে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সেই বৃহৎ সম্প্রদায়ের সকলের প্রতি কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। এভাবে একটি সংঘ কোনো একক ব্যক্তির চেয়ে একটি সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হিসেবেই বেশি পরিগণিত হয়। একটি সংঘ যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সমাজের সাথে তার একটি চুক্তি আপনাআপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলে সংঘের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় সার্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষণ করা। সমভোগতন্ত্রবাদে আরও মনে করা হয়, কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী পর্ষদের যেহেতু বিনিয়োগকারীদের প্রতি এবং শ্রমিকদের প্রতি প্রত্যক্ষ কিছু বাধ্যতা আছে, তাদের কর্তব্য হলো ক্রেতা, সরবরাহকারী, মুনাফা অর্জনকারী এবং সর্বোপরি, যে সমাজে সেই প্রতিষ্ঠানটি অস্তিত্বশীল তার প্রতিটি সদস্যের স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৫. মূল্যবোধ

নৈতিক সংস্কৃতির ধারণা থেকে কতগুলো মূল্যবোধ আসে যেগুলো সমাজে ধারাবাহিকতা ও সঙ্গতি রক্ষা করে এবং নৈতিক দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। মূল্যবোধগুলো নিহিত থাকে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে। বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষামূলক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সাথে পরিবার এসব মূল্যবোধগুলোকে প্রজন্মের পর প্রজন্মে প্রতিফলিত করে। কিছু ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত মূল্যবোধ পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের উদ্ভবে সহায়ক হয়েছে, যা ব্যক্তিস্বার্থ, কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্যমের মতো বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। আত্ম-নির্ভরশীলতা, এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়, সম্পদ অর্জন ও ভোগের অধিকার, কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক শক্তির প্রতি অনীহা, ন্যায়পরতা, সততা, কর্তব্য, নিরপেক্ষ বিচার, নৈতিক মানদণ্ড ইত্যাদির প্রতিও এ মতবাদ গুরুত্ব প্রদান করে।

গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় হুমকি অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, বরং নৈতিকতার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। বস্তুগততা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অগ্রগতির সাথে সাথে সম্পদ অর্জনের ধর্মীয় ন্যায্যতা প্রতিপাদন এবং আত্মসংযমের মতো বিষয়গুলো নিঃশেষিত হয়ে যৌক্তিক বিশ্বাসে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতির চেয়ে সম্পদ আহরণই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে থাকে। ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ যা কোনো কর্তৃপক্ষ, প্রজ্ঞা, বস্তুগততা এবং ধারাবাহিক অস্তিত্বের ধারণার বিরুদ্ধবাদী তা দ্বারা এই সুখবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থিত হতে থাকে। এভাবে আর মানুষকে বিবেচনা করা হয় না যে, তারা অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির, বরং প্রতিটি মানুষের বিশেষত্ব, সরলতা, আবেগ, অবাধ আত্মপ্রকাশ এবং নতুন-পুরাতনের পার্থক্যকরণে আত্মবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে। কিন্তু একটি সুখবাদী সমাজ তার দাবিসমূহ সরকারের কাছে জানাতেই বেশি আগ্রহী হয়। আত্মনির্ভরশীলতা অবশ্যম্ভাবীরূপে অধিকারবোধের ধারণার জন্ম দেয়। বিলাসিতা প্রয়োজনীয়তায় রূপান্তরিত হয় এবং প্রয়োজনীয়তা অধিকারে পরিণত হয়। ফলস্বরূপ, সুযোগ ও ফলপ্রাপ্তি উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমতা নিশ্চিতকরণের ওপর রাজনৈতিক বিন্যাস নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যেকোনো বস্তুগত, আধ্যাত্মিক ও পরম নৈতিক মান যেগুলো দ্বারা মানুষের কাজের মূল্যায়ন করা যায়, বিপরীত সংস্কৃতির প্রতিনিধিরা সেগুলো অস্বীকার করে। সম্প্রদায়বাদীরা কঠোরভাবে পরম নৈতিক আদর্শ বিষয়ক বিতর্ককে এড়িয়ে চলেন। তাদের যুক্তি হলো মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই প্রগতিশীল এবং পরিবর্তনশীল। আর এ কারণে মূল্যবোধগুলোর বিনিময়ের জন্য আমাদের দরকার কেবল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপ, মতবিনিময় ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

৬. ব্যক্তিগত সম্পত্তি

ঐতিহাসিকভাবেই, বিভিন্ন সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী মুল্যবোধ বলে বিবেচিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষার অধিকারকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের মতোই প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। জন লকের[৯] মতানুসারে, ভূমিশ্রমব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা নিয়ে আসে। লকের মতবাদ অনুসারে বিভিন্ন সমাজের ব্যক্তিবর্গ সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বা সমন্বিত শক্তি লাভের জন্য, নিজেদের সুরক্ষা ও স্বস্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে অধিকৃত সম্পত্তির ওপর নির্ভর করত। লকের 'অর্থনৈতিক মানব' এর ধারণার সারার্থ হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা একটি প্রকৃতিগত অধিকার। জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকারের মতো

[৯] দেখুন, John Locke, *Of Civil Government*, Ernest Phys, (ed.), London: J. M. Dent and Sons, 1943.

বিষয়গুলো লকের প্রাকৃতিক স্বাধীনতার ধারণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কারও ব্যক্তিগত সম্পদের সুরক্ষার অধিকার ছাড়া অন্যান্য সব অধিকারগুলো খুব কমই অর্থবহ হয়।

যখন সম্পদের অধিকারের স্বীকৃতি এবং নিশ্চয়তা দুটোই থাকে, ব্যক্তি তার শ্রমের ফল ভোগ করতে পারে এবং অর্জিত সম্পদ নিজের কাছে রাখতে পারে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতার ধারণা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্যবাদীরা যেভাবে প্রাচুর্যের ধারণার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, যখন রাষ্ট্র সমাজের উৎপাদনশীলতা এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ করে তখন এটা ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমন করে এবং স্বীয় মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করে। বিপরীতদিকে, যেসব সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারের নিশ্চয়তা আছে, সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত এবং জনগণ ব্যক্তিগত সুখের কথা অধিকতর স্বাধীনভাবে বলতে পারে।

৭. শাসন

শাসনের ধারণার মধ্যে কর্তৃপক্ষের ধারণা এবং তাদের পরিচালনা, নেতৃত্ব, পথপ্রদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। একদিকে, এটি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের অধিকারের কথা বলে। অন্যদিকে, একটি অবাধ ও স্বাধীন সমাজে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা এবং কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এভাবে, শাসনের ধারণায় অন্তর্ভুক্ত হয় কর্তৃপক্ষ, ক্ষমতা, ন্যায়, আইন, বহুত্ববাদ এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মতো কতগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়। ক্ষমতা হলো সেই শক্তি যার দ্বারা সমাজের কেউ অন্যদেরকে বাধ্য করে তাকে মানতে। কর্তৃপক্ষের সেই ক্ষমতা থাকে যার কারণে সমাজের ব্যক্তিবর্গ তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। কর্তৃপক্ষবিহীন ক্ষমতা স্বৈরশাসনের পর্যায়ে পড়ে। এভাবেই বৈধতার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, নৈতিকতার পরিমণ্ডল এবং সাংবিধানিক সরকারের মধ্যে একটি গভীর আন্তঃসম্পর্কের ব্যাপারে এরিস্টটল[১০] বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। এরিস্টটলের ভূস্বামী-ব্যবস্থা বিষয়ক কল্পনা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণির জনগোষ্ঠীর ধারণায় যে বিশ্বাস তার সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা জন লকের লেখার[১১] মধ্যে লক্ষ্য করি।

---

[১০] দেখুন, John M. Cooper, *Reason and Human Good in Aristotle*, Harvard University Press, 1975.

[১১] দেখুন, Dunn John, *The political Thoughts of John Locke: An Historical Account of the Argument of the 'Two Treatise of Government'*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969.

বিগত দুই শতকেরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীর রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ দুটি প্রাচীন অনুসরণীয় ধারণা থেকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এসব ধারণার প্রথমটি হলো, 'একটি আদর্শ সমাজ ন্যায়পরতার ধারক ও বাহক' এই গ্রীক ধারণা এবং এর বিপরীতে দ্বিতীয় ধারণাটি হলো 'ন্যায়পরতা আইনের সমার্থক ও ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে সজাগ' এই রোমান ধারণা। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ সার্বিকভাবে যথেষ্ট আইনসিদ্ধ হয়েছে। রোমান আইনজ্ঞরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, ন্যায়পরতা পুরো সমাজের পালনীয় ও সামাজিক কার্যক্রমের কোনো বিষয় নয়, বরং বিশেষায়িত আইনি কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় এবং আইনি ক্ষেত্রের সাথেই কেবল এর সম্পর্ক। সমকালীন নিরপেক্ষ আইনশাস্ত্র রোমান এই আইনগত-নৈতিকতার বৈপরীত্য থেকেই এসেছে।

বহুত্ববাদ নানাবিধ বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্বের কথা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে এবং এর জন্য অনুষঙ্গবাদ[১২] ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উভয়েরই দরকার হয়। একটি বহুত্ববাদী সমাজ ক্ষমতাসমূহকে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা সংঘের মধ্যে ভাগ করে দেয়। এভাবে তা স্বৈরশাসনের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। অধীনতাবাদের[১৩] নীতিতে ধরে নেয়া হয় যে, যেসব ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ফলপ্রসূতার সাথে কাজ করতে পারে না, রাষ্ট্রের উচিত তাদের কার্যক্রমকে সীমিত করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বন্ধ করে দেয়া। রাষ্ট্রের ক্ষমতার ব্যাপারে জনমনে যে সংশয় রয়েছে, তাই রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যবর্তী বিপুল পরিমাণে ঐচ্ছিক সংঘ গড়ে তোলার ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে।

---

[১২] অনুষঙ্গবাদের ধারণা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় প্লেটো ও এরিস্টটলের লেখার মধ্যে। স্মৃতির পর্যায়ক্রমকে বোঝাতে গিয়ে তারা এ ধারণা দেন। পুনরুক্তিমূলক বা প্রত্যাবর্তনমূলক ধারণা ও ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে এরিস্টটল চার ধরনের অনুষঙ্গ নীতির কথা বলেন: সান্নিধ্য নীতি, সাদৃশ্য নীতি, বৈপরীত্য নীতি এবং পুনঃসংগঠন নীতি। জন লক, ডেভিড হিউম, ডেভিড হার্টলি, জোসেফ প্রিস্টলি, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল, আলেকজান্ডার বেইন এবং আইভান প্যাভলভ প্রমূখ অনুষঙ্গবাদী স্কুলের সদস্যবৃন্দ দাবী করেন যে, অধিকাংশ মানসিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই এ ধারণাটি কাজ করে। অনুষঙ্গবাদীরা মনে করেন, সচেতনতার প্রতিটি পর্যায়কে অনুষঙ্গের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। অনুষঙ্গবাদের উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে মানব মনকে পৃথক বলে চিহ্নিত করা।

[১৩] ক্যাথলিক সামাজিক চিন্তাধারার মৌলিক নীতিসূত্রসমূহের অন্যতম একটি হলো অধীনতাবাদের নীতি। এ মতবাদে মনে করা হয়, যে কাজ স্বল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা বা ছোট এবং সাধারণ কোনো সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদন করা সম্ভব সে কাজে বিপুল সংখ্যক জনবল নিয়োগ বা বৃহৎ ও জটিল কোনো সংস্থার হাতে সে কাজের দায়িত্ব দেয়া অনুচিত। অন্যকথায়, সব কাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করা উচিত বিকেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যে। সীমিত ধরনের প্রতিষ্ঠান ও সরকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে এ নীতিটি আত্মরক্ষামূলকভাবে কাজ করে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত সরকার এবং আমলাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে এর চরম দ্বন্দ্ব রয়েছে। এজন্য ১৯৯১ সালে পোপ জন পল ২ বহুস্থানে প্রেরিত তাঁর শতবার্ষিকী বার্তায় (*Centesimus Annus*) কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বিপরীতে সামাজিক সহায়তামূলক রাষ্ট্রের কথা বলেন। এ ধর্মজাজক মনে করতেন, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র অধীনতাবাদের নীতির বিরোধিতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে সমাজকে তার দায়িত্ব পালন থেকে বঞ্চিত করছে। ফলে জনশক্তির অপচয় হচ্ছে এবং পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অপরিমিত, অসঙ্গত, অতিরিক্ত এবং অযৌক্তিক কর্মকান্ড বেড়েই চলছে।

বহুত্ববাদ এবং নিয়মতন্ত্রবাদ[১৪] ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের বিষয়টিকে সবসময় সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে। প্রতিটি সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সমমনা অনেকের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়। কাজেই ব্যক্তির পক্ষে পুরোপরিভাবে অন্যজনের বা অন্য কোনো সংঘের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাংবিধানিক পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, আইনগতভাবেই ক্ষমতাধারীদের প্রতি কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে যাতে ব্যক্তি অধিকার ক্ষুন্ন না হয়। সংবিধান হলো রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্র ও সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এটি নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করে।

৮. রাষ্ট্রের ভূমিকা

গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক পৃথিবীর সব দেশেরই রাষ্ট্রদার্শনিক চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা। অর্থাৎ ব্যক্তির অধিকারের ধারণাই সরকারের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং রাষ্ট্র ও এর শাসকবর্গকে এমনভাবে পরিচালিত হতে বাধ্য করে যাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নাগরিকেরা আত্মস্বার্থমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে পারে বা অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। অবশ্য একুশ শতকের প্রথম থেকেই বিশ্বব্যাপী সরকারের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ এবং বিচারিক নিয়ন্ত্রণের ধারণায় পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। পরিবর্তনশীল এই ধারণা ক্রমেই আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে অনধিকার প্রবেশমূলক কেন্দ্রীয় সরকারব্যবস্থার দিকে।

'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' নামে নতুন এক ধরনের কর্তৃপক্ষের ধারণা রাষ্ট্রতত্ত্বে বিকাশ লাভ করেছে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এ তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটে। অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ যেখানে উন্মুক্ত বাজার, প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক ভেরিয়েবলস্, অবাধ প্রবেশাধিকার ইত্যাদির ওপর গুরুত্বারোপ করে, সেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন ফার্ম বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা ও প্রভাবের ওপর যেখানে জনগণকে বিবেচনা করা হয় মূলত কর্মচারী, ভোক্তা ও অনুগামী হিসেবে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হলো শ্রমবৈষম্য হতে সুরক্ষা, নিরাপদ,

[১৪] নিয়মতন্ত্রবাদ হলো সরকারি কর্তৃত্ব হতে উদ্ভূত কতকগুলো ধারণা, মনোভাব এবং আচরণরীতি হতে উদ্ভূত এক জটিল ধারণা যা আবার উচ্চতর মৌলিক আইন-কানুনের দ্বারা সীমিত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মতান্ত্রিক এই অর্থে যে জনগণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই তারা ক্ষমতার অধিকারী এবং নিয়ন্ত্রক। এক্ষেত্রে যেকোনো ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থও তারা সংরক্ষণ করে থাকে। নিয়মতন্ত্রবাদ আইনের শাসনের বাঞ্চনীয়তা ঘোষণা করে এবং গ্রহনযোগ্যতা প্রচর করে। এ মতবাদ সাধারণ সালিশি সিদ্ধান্ত, জনমতভিত্তিক সিদ্ধান্ত এবং অপ্রশাসনিক আমলাদের প্রণীত বিধিবিধানের বিরোধিতা করে। নিয়মতন্ত্রবাদে মনে করা হয় যে, একটি রাজনৈতিক সমাজে আমলারা ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিমতো কিছু করতে পারে না এবং বলতে পারে না। তাদেরকে আইনগত সীমাবদ্ধতা, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রণীত বিধিবিধান, এবং সাংবিধানিক আইন বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হয়। সর্বোপরি বলা যেতে পারে যে, নিয়মতন্ত্রবাদ হলো উচ্চতর আইনের অধীন একটি সীমাবদ্ধ সরকারের ধারণা।

স্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিহীন কর্মক্ষেত্রের নিশ্চয়তা প্রদান, অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পণ্য হতে ভোক্তাদের এবং পরিবেশ দূষণের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা।[১৫]

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা সব ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সরকারের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ম্যানেজারের হাত থেকে ক্ষমতা সরকারি আমলা ও নীতিনির্ধারকদের হাতে চলে যাওয়া ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারণার মধ্যে অস্পষ্টতা নিয়ে আসে। গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সংবিধান ন্যূনতম আকারে হলেও সরকারকে কতগুলো বিষয়ে হস্তক্ষেপের অনুমোদন করে। যেমন, ১. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, ২. কর আদায় ও তা ব্যয় করার ক্ষমতা, ৩. আপদকালে ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের সময় ধার করার ক্ষমতা, ৪. জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের প্রবর্তন ও প্রবৃদ্ধি ঘটানো, ইত্যাদি। আসলে গণতান্ত্রিক দেশসমূহের লক্ষ্য হওয়া উচিত যথেষ্ট পরিমাণে মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ধ্যানধারণার প্রচলন করা। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রাষ্ট্রীয় আইন মুক্তবাজার অর্থনীতিকে বাধাগ্রস্ত করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা যুক্ত হয়ে যে সমীকরণটি দাঁড় করায় তা গণতন্ত্র ও মুক্তবাজারের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

৯. পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা

চিন্তা করা এবং তা প্রকাশ করা একটি প্রাকৃতিক বিষয়। চিন্তা না করে মানুষ থাকতে পারে না। আজকের সমাজ, সভ্যতা, দর্শন, বিজ্ঞান সবই মানুষের সৃষ্টিশীল চিন্তার ফসল। চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চিন্তাশীল মানুষের মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। রেনেসাঁর পথ ধরে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব, আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা, সর্বোপরি কয়েকশ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অর্জন করে। আজকের দিনে অবশ্য বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। সাধারণত মনে করা হয়, এ স্বাধীনতা মানুষের প্রকৃতিগত অধিকার। আসলে এটি মানুষের প্রকৃতিপ্রদত্ত অধিকার নয়, এটি মানুষের অর্জিত অধিকার। সক্রেটিসের ন্যায় বহু দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ, নীতিচিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীর জীবনের বিনিময়ে, অনেক লড়াই সংগ্রাম করে মানুষ এ অধিকার অর্জন করেছে। চিন্তার স্বাধীনতা ও তা প্রকাশ করার অধিকার মানুষ লড়াই করেই অর্জন করেছে।

---

[১৫] Murray L. Weidenbaum, *Business, Government, and the Public,* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,1990, pp. 37-44.

পুঁজিবাদের সাথে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অর্জনের এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। পুঁজির স্বার্থেই ক্যথলিক ধর্মের মধ্য থেকে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের উত্থান; কেননা, পুঁজির স্বার্থে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োজন ছিল। তাই প্রথম যুগে পুঁজি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষ নিয়েছিল। পুঁজিবাদ সে সময় প্রগতিশীল ছিল, কিন্তু পুঁজিবাদের চরম বিজয়ের পর তা ক্রমেই তার প্রগতিশীল চরিত্র হারাতে থাকে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো পুঁজির সন্ধানে সতের-আঠার শতকে সমুদ্রজয়ের মাধ্যমে সারাবিশ্ব জয় করেছিল। তখন সারাবিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তির দখলে চলে যায়। তখন ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশিত দেশের মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চায়। তারা নানা কারণে, বিভিন্ন উপায়ে আইন তৈরি করে মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করেছে কিংবা হরণ করার চেষ্টা করেছে। যুক্তরাজ্য যখন পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব করছিল, তখন সমাজতন্ত্রের ওপর কোনো কিছু লেখা ও প্রকাশ করার ব্যাপারে বৃটেনে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না, কিন্তু উপনিবেশগুলোতে মার্কস-এঙ্গেলসের প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এভাবে পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার ধারক হয়ে ওঠে, তখন সে পুঁজিবাদ আর প্রগতিশীল থাকে না, থাকতে পারে না। তখন পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের জন্য পুঁজিবাদ নিজেই শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদ তিনটি স্তর পার হয়ে আজ করপোরেট পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে। এ পুঁজিবাদের বদৌলতে বিশ্বের শতকরা এক ভাগ মানুষের হাতে পৃথিবীর অর্ধেক সম্পদ জমা হয়েছে। তাই চরিত্রগতভাবে করপোরেট পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল। যে পুঁজিবাদ একসময় সব ধরনের প্রগতিশীল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই পুঁজিবাদ আজ সব প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর নানাভাবে আক্রমণ শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে উন্নত আকাশ সংস্কৃতির সুযোগ নিয়ে দেশে দেশে আজ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশই আজ ইন্টারনেট তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের শরীক। অধিকাংশ দেশের সরকার বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ব্লগ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে তথ্যের আদান-প্রদান ও সত্য সংবাদ প্রকাশের ওপর প্রকারান্তরে হামলাই শুরু করেছে। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে ভিন্ন মত প্রকাশকারীদের ধরে জেলে ঢোকানো এখন এক স্বাভাবিক ব্যাপার। এভাবে প্রতি বছর মত প্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত হয়ে পড়ছে। অনেক দেশই আজ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী আইন তৈরি করছে। অর্থাৎ আমরা আরেকটি অন্ধকার যুগের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। অনেক সংগ্রামের পর বিশ্ববাসী মত প্রকাশের স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সে স্বাধীনতা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে।

১০. পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ইতিবাচক দিক

কিছু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ইতিবাচক দিক হলো, এটি অনেক ধরনের পুঁজিবাদ এবং অনেক ধরনের গণতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৮০ এর দশকে বিশ্বের অনেক দেশের অবস্থানকেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমন্বয়ধর্মী বলা যেত না। কিন্তু আজকের দিনে অনেক দেশকেই রাজনৈতিক দিক থেকে গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পুঁজিবাদী বলা যায়। এশিয়ান ইমার্জিং টাইগার হিসেবে ফিলিপাইন এবং বাংলাদেশের কথা, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ এবং আরও অনেক দেশ যারা ১৯৮০ এর দশকের শুরুতে পুঁজিবাদী কিন্তু গণতান্ত্রিক নয় এমনরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। মূলত দুই ধরনের রাজনৈতিক আদর্শ পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বোধগম্যতায় সহায়তা করেছে।

প্রথম রাজনৈতিক আদর্শের ধারণাটি গঠন করেছিলেন প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ পিটার বার্গার[১৬] যা পুঁজিবাদী বিপ্লব সাধন করেছিল। সামাজিক সমৃদ্ধি, সমতা এবং স্বাধীনতার জন্য তিনি ৫০ টি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছিলেন। অভিজ্ঞতামূলক নিরীক্ষণের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য পুঁজিবাদ একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। বার্গার অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে, নব্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যারা অর্থনৈতিক দরিদ্র্যতার হাত থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেছিল, কিন্তু তাদের তখন পর্যন্ত গণতান্ত্রিক বলা যেত না। পিনোশের নিয়ন্ত্রণাধীন চিলি এর একটি দৃষ্ঠান্ত। ফিলিপিন, সিঙ্গাপুর, স্পেনের মতো অনেক দেশই গণতান্ত্রিক হবার পূর্বে পুঁজিবাদী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। চরম অর্থনৈতিক দরিদ্র্যতার হাত থেকে উত্তোরণের জন্য ইণ্ডিয়া ও চীনের মতো প্রায় এক ডজন জাতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনুসরণ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক ছিল না।

শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সফলতার জন্য গণতন্ত্র একটি আবশ্যিক শর্ত। দুই ধরনের নিরীক্ষণ এই পরিবর্তনচিন্তায় প্রভাব ফেলে। প্রথমত, স্বৈরতন্ত্রে প্রায়ই অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় নির্বাচকমণ্ডলী বা বিধানসভার অনুমোদন ছাড়াই। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন, ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্র যারা শুল্ক প্রদান করে, বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রযুক্তিনির্মাতা প্রতিষ্ঠান, বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে যাদের পার্টনারশিপ আছে

[১৬] দেখুন, Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Anchor Books, Random House, New York, 1966, pp. 163-172.

তারাও এক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক গতিশীলতা তখন স্থবির হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, এমনকি সফল পুঁজিবাদী জাতিগুলো যেমন সিঙ্গাপুর উন্নয়নের সমস্যায় জর্জরিত। সামাজিক স্থিতিশলীতা রক্ষার জন্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কোনো সুস্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব সেখানে ছিল না। বিনিয়োগকারীদের এবং ভবিষ্যতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে যে প্রাতিষ্ঠানিক অনিশ্চয়তা ছিল তা সে জাতিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। চীনের অনুসরণীয় দ্বৈতনীতির মডেলের ব্যাপারে কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেও তাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি সাম্প্রতিককালে যে ধরনের ফল দিচ্ছে তাতে সেটাকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মডেলের চেয়ে কিছুটা উন্নততর ও উর্দ্ধগামী বলে ধরে নেয়া যায়। এটি মূলত অভিজ্ঞতামূলক প্রশ্ন, যা কেবল পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ। চূড়ান্তভাবে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ত্রিমাত্রিক আদর্শের ওপর জোর দিতে হবে। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক অর্থনীতির ধারণা যা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত তিনটি স্বাধীন পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত: মুক্তবাজার অর্থনীতি, স্বাধীন রাষ্ট্র যেখানে নির্বাচিত সরকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা, এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্পনির্ভর প্রতিষ্ঠানসমূহ (পরিবার ও চার্চের মতো মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সুশীল সমাজের মুক্ত ও স্বাধীন সকল সংঘ, সমিতি, জোট, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী এর অন্তর্ভুক্ত)।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে, বিগত এক শতকের ইতিহাস থেকে মনে হয় যে, তিনটি আদর্শই পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথম আদর্শটি দেখিয়েছে যে, গণতন্ত্র নাকি স্বৈরতন্ত্র কোনটি মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানবাধিকার রক্ষা করেছে। দ্বিতীয় আদর্শটি এ প্রশ্নের সমাধান দিয়েছে যে, সমাজতন্ত্র নাকি পুঁজিবাদ কোনটি অর্থনৈতিক দরিদ্র্যতার হাত থেকে মুক্ত হতে অধিক কার্যকরী। তৃতীয় আদর্শটি, যা ক্রিয়াশীল রয়েছে বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকায়, তাকে এই প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে হবে যে, এই তিনটি আদর্শের মধ্যে কোনটি মানুষের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জন্য উপযোগী? মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জন্য কোনটি গ্রহণযোগ্য? স্বাধীন সমাজের অস্তিত্ব এবং তার উন্নতির জন্য কোন প্রতিষ্ঠানগুলো সফলতার সাথে কাজ করতে পারে ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারে। এখন মৌলিক যে প্রশ্নটি রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিকদের সামনে এসে দাঁড়ায় তা মূলত একটি নৈতিক প্রশ্ন: স্বাধীন সমাজের অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও আদর্শ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ কোনটি?

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র নামে যে মডেলের কথা আমরা বলছি তা বিশ্বব্যাপী এখনো কোনো আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এটি এখনো কেবল অনুসরণীয় একটি মডেলের পর্যায়েই রয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জাতি এখনো এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু নৈতিক দিক থেকে কাজটি খুব চাহিদাপূর্ণ অবস্থায়ই রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের বিগত প্রায় ছয় দশকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, একটি প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই গরিবদের জন্য অধিকতর উপযোগী। একটি প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো উদ্যোগ, উদ্যম, কর্মপ্রচেষ্টা, উদ্ভাবন, নব নব কৌশল আবিষ্কার, বোধশক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কঠোর বৌদ্ধিক ও কায়িক পরিশ্রম। এই ব্যবস্থা যেসব গুণের ধারক সেগুলো হলো: আইনের শাসন, ব্যক্তিগত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার, সংগঠনের স্বাধীনতা, নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কম ব্যয়বহুলতা, সহজ সরকারি আইন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা, মৌলিক ধারণা ও মানসিক দক্ষতার স্বত্ব সংরক্ষণের আইন (কপিরাইট আইন) এবং করের পরিমাণ ও করসীমা যৌক্তিক হওয়া। একটি প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদ এসব ধারণা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কেন্দ্রস্থল। পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক সৃজনশীলতায় সহায়তা করে। ভূস্বামী প্রথায় সম্পদের হিসাব করা হতো গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির মাথা গণনা করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নতুন ধারণা, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ক্ষমতাকে সম্পদ বলে বিবেচনা করা হয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের 'পুঁজিবাদী' দিকটি এর অর্থনৈতিক দিকের নির্দেশ করে, আর 'গণতন্ত্র' শব্দটি এর রাজনৈতিক দিকের নির্দেশক। কিন্তু 'গণতান্ত্রিক' শব্দটির অপব্যবহার খুব সহজ। প্রায়ই মানুষ এই শব্দটি দ্বারা যা বুঝে থাকে তা হলো 'একজন মানুষের একই সময়ে একটিমাত্র ভোট' বা সুক্ষ্মভাবে বলতে গেলে 'অধিকাংশের শাসন'। কিন্তু সেটি আবার স্বৈরশাসনের পথও উন্মুক্ত করে দেয়। এই স্বৈরশাসনের প্রকৃতি এমনই যে, জনগণের ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা, উদ্যোগ এবং কর্মপন্থা পর্যন্ত নির্বাচিতদের হাতে সমর্পণ করা হয়। অধিকন্তু, এর বিরোধীরা যুক্তি দিতে পারেন যে, এখানে অত্যাচারী শাসক তৈরির সুযোগ থাকে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী লোকজন সংগঠন তৈরি করে রাষ্ট্রযন্ত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

গণতন্ত্রের অবশ্য একটি ন্যায়সম্মত অর্থ আছে। এই অর্থে গণতন্ত্র ক্ষমতার বিভাজনের কথা বলে, ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার তাগিদ দেয়, দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সমতার কথা বলে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষার প্রতি জোর দেয়, প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন ঐচ্ছিক ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং যেসব গুণসমূহ সজাগ, সতর্ক, সক্রিয়, কর্মক্ষম, পরিশ্রমী, দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে সেগুলোর প্রতি জোর দেয়। এই ধরনের জনগণ তাদের নিজস্ব এলাকার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই ধরনের গণতন্ত্র সংখ্যালঘুর স্বৈরশাসনমূলক গণতন্ত্রের বিপরীত। এখানে কেউই অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হয়

না। রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বিভাজন ও পৃথকীকরণের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বিভাজিত হয়ে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ, শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মনোভাব সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের সমর্থকেরা আসলে যে কথাটি বলতে চান তার সারার্থ হলো, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর নৈতিক-সাংস্কৃতিক দিকটি। পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্র কোনটিই বিশেষ কোনো গুণের কারণে বা সেগুলোর সহায়ক কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে সাফল্য লাভ করতে পারে না। এভাবেই পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের নৈতিক-সাংস্কৃতিক দিকটি অন্য যেকোনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক হয়ে ওঠে।

জনগণ নির্দিষ্ট কিছু গুণের অধিকারী না হলে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি বা রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনোটিই স্থায়ী হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মুক্তবাজার অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন সৃজনশীলতা, নব নব উদ্ভাবন, আত্মস্বার্থ ত্যাগ এবং নিয়মতান্ত্রিক কাজ। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক যদি নিজেদের জীবনবিধানকে নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে সার্বজনীন আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দীর্ঘকাল ক্রিয়াশীল থাকতে পারে না, যদি এর বিভিন্ন ধরনের সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সকল নাগরিকের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব না থাকে। পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চাহিদার আনুপাতিক হারে পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা এবং জনগণের বদ্ধমূল ধারণার মর্মার্থ উপলব্ধি করা। আবার গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও তাই।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের তৃতীয় বিষয়টি মূলত একটি নৈতিক প্রশ্ন। এটি দরিদ্রতা থেকে অর্থনৈতিক মুক্তি এবং স্বৈরশাসন থেকে রাজনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করার কথা বলে। কারণ এগুলো মানবতার ধারণা, এর উদ্ভব ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। একটি দুর্নীতিগ্রস্থ, অলস, অসৎ, সৃজনীশক্তিহীন এবং অধঃপতিত সমাজ মানবিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ করতে পারে না। এটি একটি জাতিকে ভূমিদাসদের এবং ক্রীতদাসদের জাতিতে পরিণত করবে। গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের মডেল অনুসরণের জন্য একটি অতীব কঠিন মডেল। এর নৈতিক পূর্বশর্তসমূহ সঠিকভাবে পালন করতে অধিকাংশ জাতিই ব্যর্থ হয়।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং সর্বব্যাপী পুঁজিবাদের সমন্বয়ী এ ব্যবস্থা স্থায়ী হবে কি-না তা এখন এক বড় প্রশ্ন। পশ্চিমা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন, বিশেষ করে গণতন্ত্রের উদারতার অবাধ সুযোগ নিয়ে স্বৈরাচারী ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগপ্রাপ্তি এবং তাদের সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ এ প্রশ্নকে জোরালো করেছে। কেউই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সফলতার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিগত কয়েক দশক ধরে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সাথে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মনোযোগ এ বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে নিবিষ্ট হয়ে আছে। উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সংযোগ রয়েছে। কেননা উদারনৈতিক গণতন্ত্র সার্বজনীন ভোটাধিকারের অনুমোদন দেয় এবং বেসামরিক জনগণ, সুশীল সমাজ এবং ব্যক্তিগত অধিকারের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। অন্যদিকে, পুঁজিবাদ পণ্যদ্রব্য কেনাবেচা, পুঁজি ও সেবার আদান-প্রদান এবং স্বাধীনভাবে ব্যক্তির নিজস্ব শ্রমশক্তি নিয়োগের অধিকার প্রদান করে।

গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ উভয়ই এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, ব্যক্তি বা নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই নিজের পছন্দের অধিকার থাকা উচিত। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয় ক্ষেত্রেই মনে করা হয় যে ব্যক্তি নিজস্ব কর্তৃত্বের অধিকারী। কাজেই মানুষকে দেখতে হবে কর্তা হিসেবে, অন্যের শক্তির উৎস বা লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নয়। গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের মধ্যেকার পার্থক্য বা সমন্বয় নির্দেশ করা কঠিন কিছু নয়। ফলাফলের দিক থেকে, গণতন্ত্র সমমাত্রিক কিন্তু পুঁজিবাদ সে ধরনের নয়। যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো ভুল হয়, অধিকাংশ জনগণ কর্তৃত্ববাদকে পছন্দ করতে পারে। আর্থিক নীতিসমূহ যদি সমতাবিধানে ব্যর্থ হয়, ধনিক শ্রেণি গণতন্ত্রকে ধনতন্ত্রে রূপান্তর করে ফেলতে পারে। ঐতিহাসিক দিক থেকে, পুঁজিবাদের উদ্ভব ও উন্নয়ন এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিষয়টি একই সাথে এসেছে। এই কারণে ধনী দেশসমূহ উদারনৈতিক গণতন্ত্রমনা হওয়ার সাথে সাথে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কমবেশি পুঁজিবাদী। পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে প্রকৃত আয়ের ক্রমবৃদ্ধি পুঁজিবাদের বৈধতাদানে এবং গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এখনকার পুঁজিবাদ সর্বব্যাপী। এটাকেও স্বাভাবিক বিষয় মনে করা যায়। এতকিছুর পরও পুঁজিবাদীরা কোনো কারণেই তাদের কার্যধারাকে থামিয়ে রাখবে না। যেহেতু তাদের কার্যক্রম বিশ্বজনীন, কাজেই তাদের কর্যক্রম চলতেই থাকবে। ফলে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে বড় বড় কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হতেই থাকবে।

যারা উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং বৈশ্বিক পুঁজিবাদের সংরক্ষণ ও চালু রাখার পক্ষে, তাদেরকে কঠিন কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। যেমন, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সমন্বয় কি আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থাকে নতুনরূপে ঢেলে সাজাবে, যা কিনা বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কঠোরভাবে জাতীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে বাধাগ্রস্থ করবে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতির ন্যায্যতা যদি সংরক্ষণ করতে হয়, অর্থনৈতিক নীতিসমূহ এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে তা মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে বিপুল সংখ্যক জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। এ ধরনের যেকোনো রাষ্ট্রে নাগরিকদের অবস্থানই হবে সর্বাগ্রে, যাদের কাছে রাজনীতিবিদেরা জবাবদিহি করতে বাধ্য। যদি কোনো রাষ্ট্র তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও নীতি-প্রণালী এককথায়, রাজনৈতিক স্বাভাবিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। কাজেই, সর্বত্র গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সমন্বিত ব্যবস্থার চর্চার প্রয়োজন।

১১. পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা

যুক্তির খাতিরে ধরে নেয়া যায় যে, বর্তমান বিশ্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সবচেয়ে প্রভাবশালী, ফলপ্রসূ এবং সফল তত্ত্ব হিসেবে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করেছে। এই তত্ত্বটি এই অবস্থায় এসেছে কারণ স্বল্প সংখ্যক বা বিশেষ কোনো শ্রেণির অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের বদলে সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের অর্থনৈতিক ভাগ্যন্নোয়নের চেষ্টায় নিয়োজিত এই মতবাদ। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কিছু কিছু দেশে এই মতবাদের জনপ্রিয়তায় সাম্প্রতিককালে ভাটা পড়েছে। কারণ, দেখা যাচ্ছে এসব দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয় দীর্ঘকালব্যাপী একই অবস্থায় থেমে আছে, যে সময়কালে উচ্চবিত্তের অর্থনৈতিক স্তর ইতিহাসের অন্যান্য সময়কালের চেয়ে ব্যাপক সাফল্যজনক অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই দুর্দশার কথা চিন্তা করতে গিয়ে অনেকে এ মতবাদের গঠনগত দিকের সাথে সাথে কোনো দেশের ত্রিবিধ ব্যবস্থাপনাগত দিককে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন, যা এর প্রতি সমর্থন যোগাতে, এ পক্ষের মতকে জোরালো করতে, এর প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে এবং এর কার্যক্রমকে নির্বিঘ্ন করতে পারে। প্রথমত, একটি দেশের অবকাঠামোগত দিক এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কারণ অবকাঠামোর মধ্য দিয়েই কোনো দেশের বা অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে একটা আপাত ধারণা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, পারস্পরিক আদান-প্রদানের বিষয়টিও বিমূর্তভাবে এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। দেশের পরিচালনা বিধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পণ্য ও সেবা আদান-প্রদানকারী পদ্ধতি বা কৌশলও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা পালন

করে। সবশেষে আসে জ্ঞানজ দিকের কথা। শিক্ষা, গণমাধ্যম, প্রকৌশল সেবা, ইন্টারনেট প্রযুক্তি ইত্যাদি যেগুলো একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষকে বা একটা দলকে অন্য দলের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে সেগুলোও এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

অনেকে মনে করেন, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ব্যবস্থার কারণে বোধগম্যভাবেই অনেকটা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। কোনো দেশের উপরিউক্ত তিনটি ব্যবস্থাপনাগত দিক পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের শক্তিশালী অস্তিত্বের ক্ষতিসাধন করে। কোনো ধরনের ব্যবস্থাপনাই শাশ্বত ও অবিনশ্বর নয়। এর বিকল্পের সৃষ্টি হয় এবং এটি ভেঙ্গে পড়ে। গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সমর্থনে যেসব ব্যবস্থাপনার কথা বলা যেতে পারে সেগুলোর সত্যিকার পক্ষাবলম্বনকারী বিকল্প যদি সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে এ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এবং উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হবে। যেসব ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সমর্থন করে, প্রথমে আমাদেরকে সেসব ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে, এসব ব্যবস্থা যেসব বাধার সম্মুখীন হয়, সেগুলো দূর করতে হবে এবং সম্ভাব্য বিকল্প অনুসন্ধান করতে হবে। গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের পথে যেসব ব্যবস্থা বাধার সৃষ্টি হতে পারে সেগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোর সুবিধাজনক উপাদানসমুহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা উন্নততর পথ সৃষ্টির আশা করা যেতে পারে।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপায়সমূহ ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করা হয়ে থাকে এবং ব্যক্তি নিজের জীবন-জীবিকার জন্য নিজেই দায়বদ্ধ। চাহিদা এবং যোগানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য উৎপাদন করে বাজারে সরবরাহ করে। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকার কোনো সম্প্রদায়ের বা কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর সরাসরি কর্তৃত্ব আরোপ করতে পারে না, প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো প্রকার চুক্তির ওপরও এসব সরকার বলপ্রয়োগ করতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূলগত বিষয় হলো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সর্বোৎকৃষ্ঠ উপায়। অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ[১৭] বলেন, অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীরা এক অদৃশ্য হাতের ইশারায় পরিচালিত হয় এবং মুনাফার জন্য এমন সব পদক্ষেপ নেয় যেগুলো তার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের কোনো অংশই নয়।

[১৭] দেখুন, Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Oxford Paperbacks, Oxford, UK, 2008.

গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো বাজার। বাজারই নির্ধারণ করে দেয় কি উৎপাদন করা হবে, কে উৎপাদন করবে, কখন উৎপাদন করবে এবং অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ কীভাবে বণ্টিত হবে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের তুলনায় বাজারের পৃথক দুই ধরনের সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বাজারের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অর্থাৎ বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বহুধাবিভক্ত এবং কোনো গোষ্ঠী বা দলের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে থাকে না। দ্বিতীয়ত, বাজারে দক্ষতার যথাযথ মূল্যায়ন হয়, অর্থাৎ দক্ষরা লাভবান হয় আর অদক্ষরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অর্থনীতিবিদেরা প্রায়ই অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রসঙ্গে পুঁজিবাদের কথা বলেন। কিন্তু এই আদর্শিক দৃষ্টিকোন থেকে পুঁজিবাদকে বিশ্বের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এখনকার পশ্চিমা বিশ্বের পরিচালনাকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবাধ প্রতিযোগিতা এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ এ দুইয়ের মিশেলে পরিচালিত হচ্ছে।

পুঁজিবাদের অনেক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান প্রাচীন আমলেও অস্তিত্বশীল ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, মহাজনী প্রথা, বীমা ইত্যাদি প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের কাছে বেশ পরিচিত ছিল। এগুলো ঘটেছিল রাজতন্ত্রের উত্থানের সাথে সাথে এবং তখন শহর গড়ে উঠেছিল ও সত্যিকার বণিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময়েই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিসরে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। ষোলো শতক থেকে আঠার শতক পর্যন্ত গ্রাম্য সমাজ থেকে শহুরে সমাজব্যবস্থায় গমন প্রচুর পরিমাণে পুঁজিবাদী শ্রম সৃষ্টি করেছিল। সংস্কার আন্দোলন মধ্যযুগের রোমান ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরিয়ে এনে মানুষকে ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন করে তোলে। বিজ্ঞানের অভাবিত উন্নয়ন সব ধরনের প্রাচীন প্রথার পতনে সহায়ক হয়েছিল। বুর্জোয়া নামে অভিহিত ব্যবসায়ী ও শিল্পসমাজের উত্থান অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুরূপ একটা নতুন রাজনৈতিক বিন্যাস গড়ে তুলতে চেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিস্বার্থের বিষয়টি হয়ে উঠেছিল একটি রাজনৈতিক ধারণা।

সতের শতকে ইংরেজ দার্শনিক থমাস হবস এবং জন লক এমন একটি সমাজের চিন্তা করেছিলেন যেখানে মানুষ পারস্পরিক কতগুলো চুক্তির ভিত্তিতে সন্নিবিষ্ট থাকবে। এ সমাজে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হবে নাগরিকদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা। স্বার্থের ধারণার কেন্দ্রীয় প্রত্যয় ছিল সম্পত্তির অধিকার। ব্যক্তিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ধারণাসমূহের চরম রূপ আমরা দেখতে পাই অ্যাডাম স্মিথের ব্যাখ্যায়। তিনি মনে করতেন, যদি ব্যবসায়ী শ্রেণির পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে, তাহলে তারা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ উন্নয়ন সাধন করতে পারে। স্মিথের যুক্তির মূল কথা হলো অর্থনৈতিক বিষয়াবলিকে যথাসম্ভব রাজনৈতিক বিষয়াবলি থেকে দূরে রাখতে হবে। স্মিথের *Wealth of*

Nations ছিল মূলত প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার (যাকে তিনি বাণিজ্যবাদ নামে অভিহিত করেছিলেন) সমালোচনামূলক গ্রন্থ। তিনি যুক্তি দেন যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করে না, অর্থনৈতিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে অকার্যকরও বটে। রাষ্ট্রের যথার্থ ভূমিকা হওয়া উচিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা প্রদান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ধরনের চুক্তি জোরদার করা। উৎপাদন এবং বন্টন যাতে বাজারের চাহিদা অনুযায়ীই পরিচালিত হয় সেদিকেও রাষ্ট্র খেয়াল রাখবে।

প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণাটি আজ আবার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ধারণার দ্বারা পুনরায় বলবৎ হয়েছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থাৎ সম্পত্তি অর্জন করা, নিজের কাছে রাখা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার মতো বিষয়গুলো আজ বিভিন্ন দেশের সংবিধানে সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও আমেরিকার অধিকার আইন (১৭৮৯), ফরাসী মানবাধিকার ঘোষণা (১৭৮৯) এবং জাতিসংঘ সনদের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৬) গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর জোর দেয়।

উনিশ শতক ছিল অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগ, বিশেষভাবে ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এটি ছিল অবাধ স্বাধীনতাপূর্ণ অর্থনৈতিক উদারনীতি এবং মুক্ত বাণিজ্যের যুগ, যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলিকে মানুষের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ভিন্নধর্মী ক্ষেত্র বলে মনে করা হয়। শিল্পবিপ্লব সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করেছিল, প্রথমে ব্রিটেনকে, তারপর ক্রমান্বয়ে ফ্রান্স, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পরবর্তীতে অবশিষ্ঠ বিশ্বকে। আধুনিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিভিন্ন ফার্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা শেয়ার ও বন্ড বিক্রি করে যা জনগণের সঞ্চয়কে বিনিয়োগের দিকে নিয়ে আসে। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন এসব বিনিয়োগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। বিদ্যমান বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও বাণিজ্যিক আইনের চোখেও এর কোনো বাধা নেই। স্টকহোল্ডাররা প্রাথমিকভাবে জনগণের এসব বিনিয়োগের যথাযথ প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগেই অধিকাংশ লোক কল-কারখানা এবং অফিস-আদালতে কাজ করতে থাকে। বড় বড় শিল্প-কারখানা সমৃদ্ধ শহরের উত্থান হয়, আর তার ফলে ট্রেড-ইউনিয়ন, শ্রমিক ইউনিয়ন, শ্রমজীবী শ্রেণির নামে রাজনৈতিক দলের সূত্রপাত হয়। তারা মালিকপক্ষ এবং পুঁজিপতিদেরকে নিজেদের শত্রুপক্ষ বলে মনে করতে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে নিজেদের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করে তারা এর সংস্কার সাধন বা এর বিলোপ সাধনের কথা বলেন। পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করেন কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। মূলত তাঁদের লেখালেখিই ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বৌদ্ধিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ের পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকেরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভজনক ও উর্দ্ধমুখী প্রবণতার ব্যাপারে কোনো পূর্বাভাস দিতে পারেননি। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বৃহদাংশই নিয়ন্ত্রিত হতো আনুপাতিকহারে খুব কম সংখ্যক অংশীদারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা। এ ধরনের অংশীদারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভব এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর তাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ পুঁজিবাদ সম্পর্কে নব নব ধারণা গঠনের দিকে চালিত করে। অনেক উদারতাবাদী এবং জনতুষ্টিবাদী এ ধরনের বৃহৎ অংশীদারি প্রতিষ্ঠানসমূহের বিলোপের পক্ষে মত দেন। তারা চাননি যে এসব প্রতিষ্ঠানগুলো একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধিকারী হোক এবং সার্বিকভাবে প্রতিযোগিতার মনোভাব ক্ষতিগ্রস্ত হোক। এজন্য তারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিশ্বাসযোগ্য আইনের কথা বলেন যা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বজায় রাখবে। অনেকে অবশ্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষেও যুক্তি দেন। তাদের মতে বৃহদাকার ফার্মগুলোই পুঁজিবাদী উন্নয়ন সাধন করে। কারণ তারাই নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে এবং সেগুলোর উন্নয়ন সাধন করে যা কোনো ছোট ব্যবসায়ীর একার পক্ষে সম্ভব নয়। এভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অর্থনৈতিক নৈরাশ্যবাদ খুব দ্রুত আশাবাদের বাণী শোনাতে সক্ষম হয়।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র হলো পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমন্বয়। কাজেই সঙ্কর এই ব্যবস্থার কিছু সুবিধা আবার কিছু অসুবিধা রয়েছে। এর সুবিধাগুলো হলো- ১) পুঁজিবাদী গণতন্ত্র একটি মূল্যব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে যা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সম্পদ উৎপাদনের নিশ্চয়তা দেয় এবং ভোক্তার চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেয়, ২) বাজারের চাহিদাই প্রয়োজনীয় দক্ষতার উন্নতি ঘটায় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিবর্গকে এসব দক্ষতা অর্জনের জন্য উৎসাহিত করে, ৩) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, পণ্যের মূল্য কমায় এবং সার্বজনীন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়, ৪) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই সাধারণ জনগণের সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থসমূহ সুরক্ষিত হয় ও ৫) নাগরিকস্বার্থের কথা মাথায় রেখেই রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহ প্রণীত হয়। এর অসুবিধাগুলো হলো- ১) কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিবেকবর্জিত ও নীতিজ্ঞানবর্জিত কাজ করতে পারে। যেমন, প্রতিযোগীর অভাবে এবং কাঁচামালের অপর্যাপ্ততার অজুহাতে ব্যাপক লাভের আশায় যথেচ্ছা মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে পারে, ২) চাহিদা এবং যোগানের মতো বিষয়গুলোর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার কারণে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে চরম শ্রেণিপার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ৩) সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ধীরগতিসম্পন্ন হতে পারে ও ৪) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানষ্ঠানসমূহের ওপর সরকারি পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় তাদের মধ্যে চরম পুঁজিবাদী চরিত্রের বিকাশ ঘটে।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র তিনটি প্রগতিশীল ও সমকেন্দ্রিক পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল ধারণা। ধারণাটির অর্থনৈতিক দিকটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পদ্ধতি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ধারণানির্ভর। আর এর রাজনৈতিক দিকটি জনগণের ইচ্ছা, নিয়ন্ত্রিত সরকারি ক্ষমতা, দমন ও নিয়ন্ত্রণে ভারসাম্যাবস্থা এবং বৈধ আদেশ ও বিধিবিধান যেগুলো ব্যক্তির অধিকার ও ঐচ্ছিক আদান-প্রদানকে সংরক্ষণ করে সেগুলোর ওপর নির্ভরশীল। গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাজার অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারণা একই ধরনের যুক্তি, একই নৈতিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, একই বিধান এবং একই ধরনের দায়িত্ববোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রই নৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। স্বাধীনতা, ন্যায়পরতা, উৎপাদনশীলতা এবং কঠোর পরিশ্রমের মতো আদর্শগুলোর মধ্য দিয়ে এ নৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল প্রতিফলিত হয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের একটি সমস্যা হলো আত্মস্বার্থকেন্দ্রিকতা, যার ফলে এ ব্যবস্থায় মানুষ লোভ, সুবিধাবাদ বা স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হয়। আত্মস্বার্থের কারণে বাজার পদ্ধতিতে ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং অস্তিত্বের চেয়ে ভোগের ওপরই বেশি জোর প্রদান করা হয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের একটি বড় সমস্যা হলো বাজারে অব্যাহত সরকারি হস্তক্ষেপ। এ কারণেই এ পদ্ধতিতে দেখা যায় ব্যবসায়ীরা নিজেদের সুবিধার জন্য রাজনীতিবিদদের ঘুষ প্রদানের প্রথা গড়ে তোলে এবং এভাবেই এ ব্যবস্থায় দুর্নীতির সূত্রপাত ঘটে।

১২. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এমন একটি ব্যবস্থা হিসেবে যেখানে সাম্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান, যে ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় সামাজিকভাবে এবং সমন্বিতভাবে, সম্পদ অর্জিত হয় সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে, আর এই সার্বিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনৈতিক দিক থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার দ্বারা।[১৮] অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হলো এমন একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ যা গণতান্ত্রিক রাজনীতির সমর্থনের সাথে সাথে উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানার কথা বলে। এটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে সকল প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়।

[১৮] Donald F. Busky, *Democratic Socialism: A Global Survey,* USA: Greenwood Publishing, July 20, 2000, p.7.

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলোকে অপসারণ করে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বুর্জোয়াদের শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে প্রোলেতারিয়েত সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস যে রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন তা সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণি শাসিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নয়, তা হলো এক শ্রেণিহীন, শোষণহীন সাম্যবাদী অবস্থা। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে এবং মার্কসের তত্ত্বকে প্রয়োগ করে লেনিন যে রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা পত্তন করেন তা হলো সাম্যবাদী সমাজ পত্তনের পথে এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সমাজের শাসন পদ্ধতি নির্ধারণ করে থাকে একটি মাত্র দল বা শ্রেণি, আর তা হলো সর্বহারা বা প্রোলেতারিয়েত শ্রেণি। কাজেই এই ব্যবস্থা মূলত একদলীয় শাসন ব্যবস্থা যা শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ ব্যবস্থায় সমাজের প্রত্যেককে সামাজিক গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত হতে হয়। একাধিক শ্রেণি না থাকায় এ ব্যবস্থায় শ্রেণিদ্বন্দ্ব বা শ্রেণিশোষণ থাকে না। সমাজের সব সম্পত্তির মালিক হয় সর্বহারা শাসিত রাষ্ট্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকায়, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটায়, সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে ভূমির অধিকারী ও ভূমিহীনদের মধ্যে, বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে দীর্ঘদিনের যে বিবাদ তারও অবসান ঘটে। সমাজের সমগ্র সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ব হওয়ায় এ ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের কোনো অনিশ্চয়তাবোধ থাকে না।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র শব্দটি মাঝে মাঝে সমাজতন্ত্রের সাথে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে যারা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেন তারা মূলত গণতান্ত্রিক বিশেষণটি ব্যবহার করেন লেনিনবাদী, স্ট্যালিনবাদী এবং মাওবাদী ধরনের সমাজতন্ত্র থেকে একে পৃথক করার জন্য। এ ধরনের মানসিকতাকে ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় বাস্তবে এগুলো অগণতান্ত্রিক প্রকৃতির। 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র' শব্দটি আবার মাঝে মাঝে 'সামাজিক গণতন্ত্র' বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন এ ধারণা বিভ্রান্তিকর, কেননা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানার কথা বলে, সামাজিক গণতন্ত্র যা বলে না।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সোভিয়েত মডেলের কেন্দ্রীভূত সমাজতন্ত্র এবং সামাজিক গণতন্ত্র থেকে পৃথক। সামাজিক গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাজনীতির সমর্থন করে, যে রাজনীতি রাষ্ট্রের জাতীয়করণ এবং রাষ্ট্রের প্রধান শিল্প-কারখানাসমূহের সর্বসাধারণের মালিকানার কথা বলে, কিন্তু আবার রক্ষণশীল এবং উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার কথা জোরের সাথে ঘোষণা করে। এ মতাদর্শ

মিশ্র অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নিয়ন্ত্রণের কথা বলে এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সমর্থন করে।[১৯] সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পার্থক্য করা হয় বিশ শতকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তার ভিত্তিতে।[২০] আবার সামাজিক গণতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পার্থক্য করা হয় কেননা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র একটি পদ্ধতিভিত্তিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু সামাজিক গণতন্ত্র তা নয়।[২১]

সামাজিক গণতন্ত্রপন্থীরা কেবল রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই পুঁজির মানবিকীকরণের কথা ভাবেন, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রপন্থীরা পুঁজিবাদকে দেখেন স্বাধীনতা, সমতা এবং সংহতির মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসমূহের সাথে সহজাতভাবেই বেমানান হিসেবে। তারা বিশ্বাস করেন যে, পুঁজিবাদের সহজাত সমস্যাগুলোর সমাধান করা যেতে পারে কেবল ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। চূড়ান্তভাবে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা বিশ্বাস করেন যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির যেকোনো ধরনের সংশোধনমূলক পদক্ষেপ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কেবল কতিপয় নতুন কিছু সমস্যার সৃষ্টি করবে। তারা মনে করেন, পুঁজিবাদ কখনোই যথার্থ অর্থে মানবিকীকরণ করতে পারে না। কাজেই চূড়ান্ত পর্যায়ে এর বিলোপ সাধন করতে হবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[২২]

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিশেষভাবে বিপ্লবাত্মক বা পুনর্গঠনমূলক নয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের একটি অপরটির সাথে মিশে যেতে পারে বা আংশিকভাবে সামাজিক গণতন্ত্রের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে। পুঁজিবাদী পুনর্গঠনের প্রস্তাবনাকে সমর্থনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এ মতবাদ।[২৩] সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কিছু আবার সামাজিক গণতন্ত্রের ঐসব পুনর্গঠনমূলক পদক্ষেপকে সমর্থন করে যেগুলো বিদ্যমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কিছু আবার রাজনৈতিক দিকের বিবেচনায় বিপ্লবাত্মক এবং তারা বুর্জোয়া শ্রেণির বিলোপের মাধ্যমে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পরিবর্তনের কথা বলে।

---

[১৯] Badie, Berg-Schlosser, Morlino, Bertrand, Dirk, Leonardo (September 7, 2011), *International Encyclopedia of Political Science*, Volume 1. SAGE. p. 2423.

[২০] Curian, Alt, Chambers, Garrett, Levi, McClain, George Thomas, James E., Simone, Geoffrey, Margaret, Paula D. (October 12, 2010). *The Encyclopedia of Political Science Set.* CQ Press. p. 401.

[২১] Eatwell & Wright, Roger & Anthony (March 1, 1999). *Contemporary Political Ideologies*, Second Edition. Bloomsbury Academic. p. 80.

[২২] Anderson and Herr, Gary L. and Kathryn G. (2007). *Encyclopedia of Activism and Social Justice.* SAGE Publications, inc. p. 447.

[২৩] Kendall, Diana (January 2011). *Sociology in Our Time: The Essentials.* Cengage Learning. pp. 125–127.

১৩. মাও সেতুং এর নয়া গণতন্ত্র

১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পর সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৯ সালে বিপ্লবের মাধ্যমে চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিভিন্ন স্তরে এই বিপ্লবের রণকৌশল রচনার প্রশ্নে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী মাও সেতুং। মার্কস-এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত মূল নীতিগুলোকে অনুসরণ করে লেনিন তাঁর 'ঔপনিবেশিক থিসিসে'[২৪] উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে যে কর্মসূচী ও কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করেছিলেন, চীন বিপ্লবের পটভূমিকায় মাও সেতুং তার একাধিক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন ও চীন বিপ্লবের নিজস্ব প্রয়োজনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গঠন প্রসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে মাও সেতুং এর তাত্ত্বিক সংযোজনগুলোর মধ্যে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

চীন বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশলের ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯৩৭ সালে মাও সেতুং এর উদ্যোগে ও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় প্রচেষ্টায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত নির্বাচনের মাধ্যমে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে যুক্তফ্রন্টীয় শাসনব্যবস্থা চালু হয় এবং এ নতুন ব্যবস্থাকে মাও সেতুং নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আখ্যা দেন। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি ১৯৪০ সালে তাঁর *On New Democracy*[২৫] রচনায় নয়া গণতন্ত্রের ধারণার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। সেখানে দেখা যায় মাও সেতুং যে নয়া গণতন্ত্রের চিন্তা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত, কুয়োমিন্টাং দলের ছত্রছায়ায় চীনে পুঁজিতন্ত্রের যে প্রসার ঘটেছিল, তার বিকল্প একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিকভাবে চীনে সে সময় প্রয়োজন ছিল একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের, কারণ অপসৃয়মান সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশীয় বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠা তখন শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে চীনের বেশ কয়েকটি শিল্পোন্নত অঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণির সংগঠিত উন্মেষও পরিলক্ষিত হয়েছিল। মাও সেতুং এর উদ্দেশ্য ছিল যুক্তফ্রন্টের পরিচালনায় এ বিপ্লবকে সম্পন্ন করা। কিন্তু এ বিপ্লবের লক্ষ্য হবে পুঁজিবাদকে সুসংহত করা নয়, বরং পুঁজিবাদের বিকল্প একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যেটি হবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন ধাপ। এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাও সেতুং নয়া গণতন্ত্রের কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি নয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি নতুন ধরনের রাষ্ট্রশক্তি গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। এটি ছিল নয়া গণতন্ত্রের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

---

[২৪] Lenin, Vladimir I., "Preliminary Draft Theses on the National and Colonial Questions," *Selected Work,* X (New York: International Publishers, 1938), p. 236.

[২৫] দেখুন, Mao Tse-tung, *Selected Works,* Peking: Foreign Language Press, 1940.

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে মাও সেতুং কর্তৃক সৃষ্ট একটি বৈপ্লবিক মতবাদ। লেনিন এ মতবাদের পূর্ব প্রতিনিধি যিনি এর গোড়াপত্তন করেন এবং এ বিষয়ক বিশ্লেষণ প্রদান করেন। যদিও তিনি নয়া গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেননি, তদুপরি তিনি বুর্জোয়াদের দ্বারা সম্পন্ন বিপ্লবের সাথে সাম্যবাদীদের দ্বারা বিপ্লবের পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন। লেনিন বুর্জোয়াদের দ্বারা সাধিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিশ্লেষণের সাথে সাথে সাম্যবাদী প্রলেতারিয়েতের দ্বারা সাধিত নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী হাজির করেন। তিনি প্রলেতারিয়েতের কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে অর্জিত গণতন্ত্রকে বলেছেন প্রলেতারীয় গণতন্ত্র। তার কাছে প্রলেতারীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল একে অপরের পরিপূরক। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' থেকে কোনো চীনের প্রাচীরে আলাদা হয়ে নেই।[২৬] তিনি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে লিখেছেন, বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সারবস্তুর অর্থ মধ্যযুগীয়তা থেকে, ভূমিদাসপ্রথা থেকে, সামন্তবাদ থেকে দেশের সামাজিক সম্পর্কের পরিশুদ্ধি।[২৭] সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে পড়ে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সম্পর্ক। লেনিন উল্লেখ করেন যে, রাশিয়ায় বিপ্লবের সরাসরি ও আশু কর্তব্যটি ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মধ্যযুগীয়তার অবশেষগুলোর উচ্ছেদ, সেগুলোকে শেষ পর্যন্ত চূর্ণ করা, রাশিয়া থেকে এই বর্বরতা, এই লজ্জা, আমাদের দেশের সমস্ত সংস্কৃতি ও সমস্ত প্রগতির এই প্রচন্ডতম বাধাটার বিলুপ্তি।[২৮]

লেনিনের কাছে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা প্রলেতারীয় বিপ্লবের অর্থই হচ্ছে মধ্যযুগীয়তার সমস্ত জেরগুলো, ভূমিদাস প্রথা ও সামন্তবাদ থেকে নিঃশর্ত পরিপূর্ণ উচ্ছেদ। তৎকালীন রাশিয়ার ভূমিদাসপ্রথার প্রধান অভিব্যক্তি, জের ও অবশেষ বিষয়ে তাঁর মত হলো- রাজতন্ত্র, সম্প্রদায় ব্যবস্থা, ভূমি অধিকার, ভূমি বন্দোবস্ত, নারীদের অবস্থা, ধর্ম, জাতিসত্তার পীড়ন হচ্ছে ভূমিদাসপ্রথার জের।[২৯] তিনি চেয়েছেন নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এ সমস্ত জেরকে সমূলে উৎখাত করতে। লেনিন *গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল* বইতে দেখান, সশস্ত্র অভ্যুত্থান হচ্ছে জারতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের নির্ধারক উপায়। প্রলেতারিয়েত ও কৃষক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা অর্থাৎ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম করতে হবে, আগের বিপ্লবগুলোতে যা হয়েছে সেভাবে বিজয়ী অভ্যুত্থান থেকে বুর্জোয়ার ক্ষমতা স্থাপন চলবে না। অথচ মেনশেভিকরা মনে করত ক্ষমতা নেবে

[২৬] লেনিন, অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে, ১৪ অক্টোবর, ১৯২১।
[২৭] *প্রাগুক্ত*।
[২৮] *প্রাগুক্ত*।
[২৯] *প্রাগুক্ত*।

বুর্জোয়ারা। শ্রমিক শ্রেণির কর্তব্য হলো তাদের সমর্থন করা।[৩০] গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে লেনিন তাঁর এই গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

> মার্কসবাদ প্রলেতারিয়েতকে এই শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে দূরে সরে না থাকে, এর প্রতি উদাসীন না হয়, বুর্জোয়াকে যেন বিপ্লবে নেতৃত্ব ছেড়ে না দেয়, বরং তারা যেন এতে খুব প্রবলভাবে অংশগ্রহণ করে, সংগতিপরায়ন প্রলেতারীয় গণতান্ত্রিকতার জন্য, বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য তারা যেন অতি দৃঢ়তাসহ সংগ্রাম চালায়।[৩১]

কাউতস্কির মতো যারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলে প্রচার করেছেন তাদেরকে লেনিন নির্লজ্জ বলে কটাক্ষ করেছেন। তিনি মনে করেন, সমস্ত কান্ডজ্ঞান ও ইতিহাসের বোধসম্পন্ন মানুষের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট যে যতক্ষণ বিভিন্ন শ্রেণি থাকছে ততক্ষণ বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের কথা আমরা বলতে পারি না, বলতে পারি শুধু শ্রেণি গণতন্ত্রের কথা। বিশুদ্ধ গণতন্ত্র হলো উদারনীতিকদের কপট বুলি যার মাধ্যমে তারা শ্রমিকদের বোকা বানাতে চায়। সামন্তবাদের স্থানাধিকারী বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থানাধিকারী প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের কথাই ইতিহাস জানে।[৩২] লেনিন বলেন, সুবিধাবাদীরা মনে করত যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতরা একা নামবে, সহযোগী ছাড়াই। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটতে পারবে কেবল তখনই যখন প্রলেতারিয়েতরা হবে দেশের অধিকাংশ।[৩৩] এই প্রতিপাদনের ভ্রান্তি ও ক্ষতিকর দিক দেখিয়ে দিয়েছিলেন লেনিন। লেনিনবাদী এ ধারণার বিকাশের উদ্দেশ্য হলো পশ্চাৎপদ, অনুন্নত পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী যে কোনো দেশেই প্রলেতারিয়েত ও অন্যান্য বিপ্লবী শ্রেণিগুলোর সহায়তায় নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। মাও সেতুং রাজনৈতিক ক্ষমতার শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে দুনিয়ার বিবিধ ধরনের রাষ্ট্রগুলোকে যে তিন ধরনের একনায়কত্ব বলে অভিহিত করেছিলেন তার শেষটি হচ্ছে 'কয়েকটি বিপ্লবী শ্রেণির একনায়কত্বাধীন প্রজাতন্ত্র' যা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে আবির্ভুত হয়।[৩৪]

লেনিনের কাছে উল্লেখযোগ্য প্রধান কাজটি ছিল বুর্জোয়াদের দ্বারা সাধিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাথে কমিউনিস্টদের দ্বারা সাধিত নয়া গণতন্ত্রের পার্থক্যরেখা নিরূপণ করা। লেনিন তাঁর *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* গ্রন্থে সেই নয়া গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন,

---

[৩০] লেনিন, *গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল*, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৪, পৃ. ৬।

[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

[৩২] লেনিন, 'প্রলেতারিয় বিপ্লব ও দলদ্রোহী কাউতস্কি', *বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয় গণতন্ত্র*, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

[৩৩] লেনিন, *গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল*, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৪, পৃ. ৬-৭।

[৩৪] মাও সেতুং কৃত ভাগটি হচ্ছে- ১. বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কত্বাধীন প্রজাতন্ত্র, ২. সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বাধীন প্রজাতন্ত্র, ৩. কয়েকটি বিপ্লবী শ্রেণির একনায়কত্বাধীন প্রজাতন্ত্র। দেখুন, *নয়াগণতন্ত্র প্রসঙ্গে*।

> পুঁজিবাদী সমাজে আমরা পাই কাটাছেঁড়া, হতচ্ছাড়া, জাল করা একটি গণতন্ত্র যা কেবল ধনীদের জন্য, অল্পাংশের জন্য। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, কমিউনিজমে উৎক্রমণের পর্বটাই প্রথমে দেবে শোষকদের ওপর সংখ্যাল্পদের আবশ্যকীয় দমনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের জন্য অধিকাংশের জন্য গণতন্ত্র। কেবল কমিউনিজমই দিতে পারে সত্যাসত্যই পরিপূর্ণ গণতন্ত্র...[৩৫]

লেনিনবাদী চিন্তা গণতন্ত্রকে বিকশিত করেছে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রণনীতিগতভাবে লেনিনবাদ শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও তার সহযোগী বিভিন্ন স্তরের জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছে। লেনিনবাদ বিপ্লবী শ্রেণিগুলো কর্তৃক শাসক-শোষক শ্রেণিগুলো ও তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে বলপ্রয়োগ, গৃহযুদ্ধ ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাতের কথা বলে। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব অবশ্যই প্রলেতারীয় গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠা করে যা বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে গুণগতভাবে উন্নততর এবং এ বিষয়টি লেনিন *রাষ্ট্র ও বিপ্লব* গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। মাও সেতুং পরবর্তীকালে বলেছেন যে,

> নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকেই। অবশ্য চীনে এটি শুরু হয়েছে ১৯১৯ সালের চতুর্থ মে বিপ্লবের পর থেকেই। তার মতে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হলো প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে বিপুল জনসমর্থনের প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লব।[৩৬]

মাও সেতুং সামন্তবাদী ও আধা সামন্তবাদী দেশে যে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব দিয়েছেন, সেরকমই লেনিন প্রলেতারীয় বিপ্লবের তত্ত্ব এনে বিপ্লবের অগ্রগামী শ্রেণি হিসেবে শ্রমিক ও তার সহযোগী শ্রেণিসমূহের হাতে কর্তৃত্ব তুলে দেন। লেনিনবাদের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখল, তার জন্য রণনীতি নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী কাজ করা, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা, বুর্জোয়া ও শোষক শ্রেণিকে দমন করা, প্রলেতারীয় বিপ্লব সম্পাদন করা, শ্রমিক ও প্রলেতারিয়েতকে মুক্ত করে বিশ্ববিপ্লবে এগিয়ে নেওয়া। প্রলেতারীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বদলে প্রলেতারীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে।

---

[৩৫] দেখুন, ভি. আই. লেনিন, *রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, প্রগতি প্রকাশন: মস্কো, ১৯৭৬, পঞ্চম অধ্যায়।

[৩৬] Mao Tse-tung, 'The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party', Chapter-5, *Selected Works*, Vol. 2, December 1939, p.327.

১৪. লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ধারণা

লেনিনীয় পার্টির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ। ফ্রিডরিক এঙ্গেলস তাঁর কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে লেখায় কর্তৃত্বকে কেন্দ্রিকতাবাদ অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। এ মতবাদের মূলকথা হল, আলোচনা হবে বহুমূখী, কিন্তু কাজ হবে ঐক্যবদ্ধ। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ বলতে লেনিনবাদী রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত নীতিসমূহকে নির্দেশ করা হয়। মাঝে মাঝে আবার যে কোনো রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গৃহীত কোনো লেলিনপন্থী নীতিকেও এ অর্থে বিবেচনা করা হয়। এ সাংগঠনিক পদ্ধতির 'গণতান্ত্রিক' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয় যে, কোনো নীতি নির্ধারণের পূর্বে দলীয় সকল সদস্যের সে বিষয়ে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক এবং মতবিনিময় করার অধিকার রয়েছে, আর 'কেন্দ্রিকতাবাদ' দ্বারা বোঝানো হয় যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তখন দলের প্রত্যেক সদস্যই সে সিদ্ধান্তটিকে মেনে নেবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ শব্দযুগলকে লেনিন ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে এটি হলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং কার্যক্ষেত্রে ঐক্য।[৩৭] এঙ্গেলস ও লেনিনের সূত্র ধরে মাও সেতুং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদের বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। ফলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে লেনিন বলেন,

> কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অবশ্যই হবে কেন্দ্রিকতা ও সর্বহারা গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ (ফিউশন)–উভয়ের মিলনের প্রকৃত নির্যাস। এই সংমিশ্রণ সমগ্র পার্টির মধ্যে সর্বদা একত্রে কাজ, সর্বদা একত্রে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবল অর্জন করা যায়। কমিউনিস্ট পর্টি সংগঠনে কেন্দ্রিকতা আনুষ্ঠানিক বা যান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নয়; এই কেন্দ্রিকতা হলো সাম্যবাদী কর্মকান্ডের কেন্দ্রিকতা, যার অর্থ হলো, এমন একটি সুদৃঢ় শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে তোলা যা বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত, আবার একই সাথে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলায় পারদর্শী। আনুষ্ঠানিক বা যান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হলো পুঁজিবাদী আমলা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা–সংগঠনের সজীব জীবনধারার বাইরে থেকে যা পার্টির অবশিষ্ট সদস্যের উপর বা বিপ্লবী সর্বহারা জনতার ওপর আধিপত্য চালায়।[৩৮]

---

[৩৭] Lenin, V. *Report on the Unity Congress of the R.S.D.L.P.*, 1906.

[৩৮] ভি. আই. লেনিন, *কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের মূলনীতি*, ভ্যানগার্ড প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ ২০১১, পৃ. ৮-৯।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে মাও সেতুং বলেছেন,

> জনগণের ভেতরে গণতন্ত্র কেন্দ্রিকতার সংগে সম্পর্কিত এবং স্বাধীনতা শৃঙ্খলার সংগে সম্পর্কিত। এ সবই হচ্ছে একটি একক বস্তুর দুটি বিপরীত দিক, তারা পরস্পর বিরোধী, আবার ঐক্যবদ্ধও; আমাদের একটার ওপর একতরফাভাবে জোর দিয়ে অন্যটাকে অস্বীকার করা উচিত নয়। জনগণের ভেতরে, স্বাধীনতা ছাড়া চলে না, শৃঙ্খলা ছাড়াও চলে না; গণতন্ত্র ছাড়া চলে না, কেন্দ্রিকতা ছাড়াও চলে না। এই ধরনের গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার একত্ব এবং স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার একত্বের অর্থ হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এই ব্যবস্থায় জনগণ ব্যাপক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভোগ করেন; একই সময়ে আবার সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলার মধ্যে অবশ্যই তাদের নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতে হয়।[৩৯]

সমাজতান্ত্রিক সমাজে গণতান্ত্রিক কেন্ত্রিকতাবাদের প্রকাশ ঘটে একক নীতি অনুসরণে, অধঃস্তন সংস্থাগুলোর দ্বারা উর্দ্ধতন সংস্থাগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ আবশ্যিকভাবে পালনে এবং সংখ্যালঘু কর্তৃক সংখ্যাগুরুর অধীন থাকার মাধ্যমে। এ সমাজে মেহনতি জনগণের সামাজিক আত্মশাসন চলে মেহনতিদের জন্য মেহনতিদের মাধ্যমে। সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যেক মেহনতি কর্মিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে যোগদানের সুযোগ দেয়। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তাদের যোগদান কোনো সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রমে আবদ্ধ নয়। মাও সেতুং লিখেছেন,

> পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক জীবন সম্পর্কে শিক্ষার কাজ অবশ্যই চালাতে হবে, যাতে করে পার্টি সদস্যরা বুঝতে পারেন, গণতান্ত্রিক জীবনের অর্থ কী, গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মধ্যেকার সম্পর্ক কী এবং কীভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে কাজে লাগানো যায়। শুধুমাত্র এই উপায়েই, একদিকে পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক জীবনকে সত্যি সত্যি প্রসারিত করা সম্ভব; অন্যদিকে উগ্র-গণতন্ত্র, শৃঙ্খলা লঙ্ঘনকারী উদারনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতাকে এড়ানো সম্ভব।[৪০]

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ বলতে বুঝতে হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাষ্ট্র, পার্টি, গণসংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর পরিচালনার নীতি। এ সমাজে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব গঠিত ও চালিত হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদের ভিত্তিতে। এই নীতির অর্থ হচ্ছে সমাজ-রাষ্ট্র-পার্টি-সংগঠনের উপর

---

[৩৯] মাও সেতুং, *জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে*, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭, পৃ. ৪-৫।

[৪০] দেখুন, মাও সেতুং, 'জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান' (অক্টোবর ১৯৩৮), *নির্বাচিত রচনাবলী*, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১।

থেকে নিচ পর্যন্ত সকল সংস্থায় নির্বাচন হয় সার্বজনীন, সমান ও গোপন ব্যালটে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। এই নীতি অনুসারে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত নির্বাচিত পরিচালকবর্গকে জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি, দায়িত্ববোধ, প্রতিবেদন প্রদানের প্রক্রিয়া নিয়মিত ও স্বচ্ছ এবং নির্বাচিতদের যে কোনো সময় প্রত্যাহারের নীতি কার্যকর থাকবে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদের নীতি অনুসারে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ সংস্থা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় রাষ্ট্রীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে।[৪১]

পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো কেমন হবে তা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদের কেন্দ্রীয় বিষয় নয়, বরং কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক ভূমিকা কী হবে সেটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলোর পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই কাজ করার দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং তারা মনে করেন, বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন নেই। সে কারণে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাও তাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হচ্ছে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা, বুর্জোয়া-জমিদার-সামন্ত শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো এবং শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এটা করতে গেলে এমন ধরনের পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে যা প্রবল পরাক্রমশালী রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণিগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক স্তরে সংগ্রাম পরিচালনায় সক্ষম। এটা এমন একটা পার্টি, যা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, তা সে যত সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘস্থায়ীই হোক না কেন, তা বুর্জোয়া একনায়কত্বের রাষ্ট্রে শুধু নির্বাচনী সাফল্যের জন্যই কাজ করবে না এবং শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহারের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না।

এখন মূল প্রশ্ন হলো শ্রমিক শ্রেণিকে সংগঠিত করতে ও নেতৃত্ব দিতে এবং বিপ্লবী গণআন্দোলন পরিচালনায় পার্টি নিজেকে তৈরি করতে পেরেছে কী না। পার্টি সম্পর্কে লেনিনীয় ধারণা হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য পার্টির নিজেকে প্রস্তুত ও উন্নত করতে হবে। সে কারণে তিনি শ্রমিক শ্রেণির অগ্রগামী অংশকে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াতে হবে পার্টিকেই। তাহলেই সে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে তৈরি হবে। শ্রেণি সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ সংগঠন দৃঢ় হবে এবং আইনি, আধা-আইনি ও বেআইনি যে কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারবে। শ্রেণি রাজনীতির জন্য এমন একটা পার্টি গড়ে তুলতে হবে যা চলতি পরিস্থিতি মোকাবিলায় এক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতিতে সংগ্রামের ধরন পরিবর্তনে সক্ষম হয়। লেনিন মনে করেন, এর জন্য চাই একটি কেন্দ্রীভূত পার্টি সংগঠন। মার্কসবাদ ও শ্রেণিসংগ্রামের ভিত্তিতে গঠিত পার্টির জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নীতি। শ্রেণিসংগ্রাম হচ্ছে একটি

[৪১] এম আর চৌধুরী, *সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রক্রিয়া*, ঢাকা: দি ডলফিন এন্টারপ্রাইজ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১০৪-১০৭।

সমবেত কার্যক্রম। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়নে যৌথ কার্যক্রমের অনুশীলন, যেখানে চিন্তার স্বাধীনতা ও কাজের মধ্যে ঐক্যের শিক্ষা ও সন্ধান পাওয়া যায়।

যৌথ কাজের ধারা কার্যকরী করতে গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সিদ্ধান্ত নয়, এ সিদ্ধান্ত রূপায়নে সমগ্র পার্টির যৌথ উদ্যোগ ও কার্যক্রমও অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এ শিক্ষা দেয় যে সংখ্যালঘিষ্ঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মেনে চলতে হবে এবং ব্যক্তিগত মতামত পার্টি সিদ্ধান্তের অধীন থাকবে। লেনিন ও বলশেভিকদের সাথে মেনশেভিকদের যে বিতর্ক রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে হয়েছিল, সেখানে লেনিন বিপ্লবী পার্টি ও সাংগঠনিক নীতি সহ কতগুলো প্রয়োজনীয় শর্তের কথা বলেছেন। লেনিন বলেন, পার্টি ও তার সংগঠন হচ্ছে বিপ্লবী গণআন্দোলনের পূর্বশর্ত ও তার ফসল-এ দুটোই। অর্থাৎ লেনিনীয় ধারণা হচ্ছে পার্টি যেমন বিপ্লবী গণসংগামের স্রষ্টা, তেমনি বিপ্লবী সংগ্রামের ফসলও বটে। লেনিন আরও বলেন, পার্টিকে হতে হবে এমন একটি সংগঠন যা বিপ্লবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে এবং রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে শ্রেণিশত্রুদের আক্রমণ মোকাবিলায় নিজেকে সক্ষম করে তুলতে সচেষ্ট থাকে। এ ধরনের একটা পার্টিকে কঠোরতম সাংগঠনিক শৃঙ্খলার ওপর ভিত্তি করে গঠন করতে হবে। এটা এমন এক ধরনের শৃঙ্খলা যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে এবং সংগ্রামের ধরনে নমনীয়তা অনুসরণে পার্টিকে সক্ষম করে তুলবে। মার্কসবাদ ও শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাসী কোনো পার্টির মতাদর্শ থেকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার পরিণামে পার্টি সংগঠনের মূল নীতিকে বর্জন করার বিপদ দেখা যায়।

১৫. প্রলেতারীয় গণতন্ত্র

ইতিহাসের গতিধারায় বুর্জোয়া ব্যবস্থা বিকাশের সাথে সাথে বুর্জোয়া শ্রেণির বিপরীতে প্রলেতারিয়েত[৪২] শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। বুর্জোয়া ব্যবস্থার যত বিকাশ ঘটে প্রলেতারিয়েত শ্রেণিরও ততই বিকাশ ঘটে। সামন্তবাদীদের হটিয়ে বুর্জোয়ারা যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে, অনিবার্যভাবেই তার বিপরীত ধারায় প্রলেতারীয় গণতন্ত্রও বিকশিত হয়। প্রলেতারীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কাজ হিসেবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করতে হবে, যাকে মার্কসীয় পরিভাষায় বলা হয় প্রলেতারিয়েত শ্রেণির একনায়কত্ব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেন, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সমগ্র সমাজব্যবস্থাটাই পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে

[৪২] দেখুন, হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১৯।

সকলের স্বার্থে সকলের প্রয়োজনে।[৪৩] কমিউনিস্ট ইশতেহারে বলা হয়েছে, সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের উচ্ছেদ; অর্থনৈতিক ও তার আইনী রূপ উভয় অর্থে।[৪৪] কমিউনিস্ট ইশতেহারের ব্যাখ্যা হচ্ছে, শ্রেণি বিরোধের ওপর, অল্পলোকের দ্বারা বহুজনের শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলোকে নিজেদের অধিকারভুক্ত করার ব্যবস্থার চূড়ান্ত ও পূর্ণতম প্রকাশ যে বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণায় নিহিত আছে, তার চূড়ান্ত অবসানের জন্য প্রয়োজন প্রলেতারীয় গণতন্ত্র তথা প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে উত্তরণ।

প্রলেতারিয়েত শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব যা তারা সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ ও দৃঢ়করণের জন্য ব্যবহার করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা থেকে অপসারিত শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে এটি ক্রিয়া করে। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রয়োজনীয় শর্ত হলো সৃজনশীলতা ও গণতান্ত্রিক মানসিকতা। অর্থাৎ, নিপীড়ক ও নিপীড়িত শ্রেণিসমূহের মধ্যে সমাজের বিভক্তির অবসান ঘটানো, মানুষের ওপর মানুষের শোষণ লোপ করার অবস্থা সৃষ্টি। প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং সামাজিক সংগঠনগুলো, যেমন শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, যুব সংগঠন ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নেতৃত্বের পর্যায়ে থাকে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির কমিউনিস্ট পার্টি।[৪৫] মার্কস বলেন,

> প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ ঘটাতে উত্তরণ পর্বে এক প্রয়োজনীয় জিনিস। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ নির্মাণের দিকে সমাজের রূপান্তর সাধন। পুঁজিবাদী সমাজ আর কমিউনিস্ট সমাজ, এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে একটি থেকে অপরটিতে বিপ্লবী রূপান্তরের এক পর্ব। তারই সহগামী থাকে একটি রাজনৈতিক উৎক্রমণ পর্ব যখন রাষ্ট্র প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।[৪৬]

---

[৪৩] মার্কস এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', ১৮৪৮, *মার্কস এঙ্গেলস রচনা সংকলন*, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৪৩।

[৪৪] *প্রাগুক্ত*।

[৪৫] সোফিয়া খোলদ, *সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৯০, পৃ. ১০০-১০১।

[৪৬] কার্ল মার্কস, 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা', *মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন*, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ২৬-২৭।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে কথা উঠলেই চলে আসে গণতান্ত্রিক সাম্যের কথা। গণতন্ত্র যে শ্রেণি নিরপেক্ষ হতে পারে সে কথা বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা কখনোই মেনে নেয় না। অর্থাৎ তথাকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণিদৃষ্টিতে এক ধরনের একনায়কতন্ত্র, এটা তারা বুঝতে চায় না। রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণায় তারা রাষ্ট্রের শোষণ প্রক্রিয়াটিকে আড়াল করেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা ও কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা বুঝতে চায় না যে, রাষ্ট্র একটি যন্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু নয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হচ্ছে শ্রেণি শত্রুকে দমন করা এবং একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির স্বার্থ হাসিল করার সব রকমের সুযোগ সুবিধার বৈধতা দেয়া। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ করে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন, শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক প্রভূত্ব বা প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রশ্নটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তত্ত্বের প্রধান কথা। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব ছাড়া কমিউনিজম নির্মাণ অসম্ভব। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রসঙ্গে লেনিন বলেন,

> বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপ অসাধারণ বিচিত্র, কিন্তু তাদের মূল কথাটা এক; এ সমস্ত রাষ্ট্রই কোনো না কোনোভাবে, এবং শেষ বিচারে অবধারিতভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্ব। পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণে অবশ্যই রাজনৈতিক রূপের বিপুল প্রাচুর্য ও বৈচিত্র না দেখা দিয়ে পারে না, কিন্তু তাদের মূলকথাটা থাকবে অনিবার্যভাবে একটা: প্রলেতারীয় একনায়কত্ব।[৪৭]

লেনিনের বক্তব্যকে যদি আমরা বিপরীতভাবে দেখি তাহলে বর্তমানে জারি থাকা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে দেখতে পাই যা মূলত শ্রমিকশ্রেণির ওপর বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কত্ব। এটি শুধু আইন-কানুন দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, বল প্রয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ শাসনের প্রতি আছে গুটিকয়েক বুর্জোয়ার সহানুভূতি আর সমর্থন। এক্ষেত্রে স্তালিনের বক্তব্য আরো পরিষ্কার। তাঁর মতে,

> রাষ্ট্র হলো শ্রেণিশত্রুকে দমন করার জন্য শাসকশ্রেণির হাতে যন্ত্রবিশেষ। এই হিসেবে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের সাথে অন্য কোনো শ্রেণির একনায়কত্বের তফাত নেই। কারণ শ্রমিকের রাষ্ট্র বুর্জোয়াদের দমন করার যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য হলো এই যে, ইতিহাসে এ পর্যন্ত যত শ্রেণি রাষ্ট্র হয়েছে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত জনগণের ওপর

[৪৭] লেনিন, *রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ২৬-২৭।

> সংখ্যালঘু শোষকের একনায়কত্ব; আর শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব হলো সংখ্যালঘু শোষকের ওপর শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব।[৪৮]

গোথা কর্মসূচির সমালোচনায় মার্কস বলেন, নৈরাজ্যবাদী[৪৯] অতি উৎসাহী ব্যক্তিগণ মনে করেন আমরা রাতারাতি যাদুমন্ত্রের মতো পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে ফেলব। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচুর্য ও স্বাধীনতার জন্য এবং সুখ-শান্তির এই নতুন যুগে প্রবেশের জন্য আমাদেরকে কী কী করতে হবে–সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। সাম্যবাদের বস্তুগত বিষয়াবলি সকলের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছে দিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আমরা প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত উন্নতি সাধন করতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন ও অভাব থেকে উল্লম্ফনের মাধ্যমে মুক্ত হয়ে, পূর্ণাঙ্গভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটাতে পারব না। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বিপ্লবী সময় অতিক্রম করতেই হবে। পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে এই অন্তর্বর্তীকালীন বিপ্লবী সময় অতিক্রম করতেই হবে। পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সাধন করে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কাজ হিসেবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রলেতারিয়েত শ্রেণির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করতে হবে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখলের পর প্রলেতারিয়েত শ্রেণি উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করবে এবং অংশগ্রহনমূলক পন্থায় কতিপয় ধনিক শ্রেণির মানুষের স্বার্থের পরিবর্তে সকলের স্বার্থে তা পরিচালনা করবে। তখনই অতি দ্রুত সমাজের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণের সাথে সাথে বেকারত্ব নির্মূল, বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, সার্বজনীন শিক্ষা, বাসস্থান ও দরকারি সব কিছু নিশ্চিত হবে। মানুষের সকল সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটবে, মানুষ হয়ে উঠবে সৃষ্টিশীল, বৃদ্ধি পাবে তাদের উৎপাদনশক্তি। এঙ্গেলস এরূপ রাষ্ট্রের ব্যাখ্যায় বলেন,

> ইহা সত্যিকার অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বশীল একটি সমাজ হবে, এই শব্দটি তার প্রচলিত অর্থের তাৎপর্যই হারিয়ে ফেলবে, রাষ্ট্র বিলীন হবে সমাজের মাঝে।

---

[৪৮] স্তালিন, *লেনিনবাদের ভিত্তি ও সমস্যা*, নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত, এনবিএ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ২৯।

[৪৯] নৈরাজ্যবাদ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনৈতিক চিন্তার শ্রুতধারা, যা তার অনুসারীদের মধ্যে এমন চেতনার জন্ম দেয় যে চেতনা অর্থনৈতিক একচেটিয়াবাদ, রাজনৈতিক এবং সামাজিক নিপীড়নমূলক প্রতিষ্ঠানের বিলয় ঘটিয়ে দিতে চায়, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি মুক্ত সমিতির ফেডারেশনের মাধ্যমে সকল প্রকার উৎপাদন পদ্ধতি পরিচালনা করতে চায়, যার লক্ষ্যই হবে সমাজের প্রতিটি সদস্যের চাহিদা মেটানো, তা কোনোভাবেই প্রচলিত সমাজের স্বল্প সংখ্যক মানুষের সুবিধা ভোগ ও নিয়ন্ত্রণে চলতে দেবে না। প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে প্রাণহীন যান্ত্রিক আমলাতন্ত্র চলছে তার পরিবর্তে স্বাধীন, মুক্ত ও প্রাণবন্ত মানুষের সংস্থা গড়ে তুলবে। তবে সকলে সকলের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এবং স্ব স্ব কর্ম সম্পাদনের জন্য তারা স্বাধীন ও স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির আওতায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

> পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সমাজের খুবই স্বল্প মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। আর সে জন্যই তারা বেশিরভাগ মানুষের ওপর প্রভূত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্মম পন্থার আশ্রয় নিয়ে থাকে। তবে যদি একবার সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সকলের স্বার্থে শুরু হয়ে যায় তবে দ্রুত পুলিশ ও সেনাবাহিনী বিলোপ হতে থাকবে এবং এর সাথে সাথে পুঁজিবাদী সমাজে চলমান শোষণ, নিপীড়ন ও বৈষম্য ক্রমান্বয়ে তিরোহিত হয়ে যাবে। এ ছাড়া পুঁজিবাদী সমাজের প্রচলিত ভয়ভীতি প্রদর্শন, শক্তি প্রয়োগ থাকবে না, সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাটাই পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সকলের স্বার্থে সকলের প্রয়োজনে।[৫০]

লেনিন তাঁর *রাষ্ট্র ও বিপ্লব*[৫১] গ্রন্থে বলেন, সাম্যবাদী সমাজে যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ঘটবে, যখন সমাজে আর্থিক কারণে সামাজিক শ্রেণিভেদ থাকবে না, তখন রাষ্ট্র নামক যন্ত্রটির বিলুপ্তি ঘটবে এবং মানুষ বাক স্বাধীনতা লাভ করবে, আর কেবল তখনই সত্যিকার পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের স্বাদ পাবে নাগরিক সমাজ। লেনিনের মতে, কমিউনিজমের দিকে বিকাশ এগোয় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মধ্য দিয়ে, অন্যভাবে এগুনো যায় না। কেননা, শোষক পুঁজিবাদীদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার মতো আর কেউ নেই এবং অন্য পথ অসম্ভব। লেনিন বলেন, মার্কসের রাষ্ট্র বিষয়ক মতবাদের মর্মার্থ কেবল সেই আয়ত্ব করেছে যে বোঝে যে, একটি শ্রেণির একনায়কত্ব কেবল সাধারণভাবে সমস্ত শ্রেণি-সমাজের জন্য, কেবল বুর্জোয়া উৎখাতকারী প্রলেতারিয়েতের জন্য দরকার তা নয়, পুঁজিবাদ এবং শ্রেণিহীন সমাজ কমিউনিজমের অন্তর্বর্তী সমগ্র ঐতিহাসিক পর্বটার জন্য তা দরকার। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রসঙ্গে লেনিন আরও বলেন, এর অর্থ কেবল শোষকদের ওপর বলপ্রয়োগ মাত্র নয়, এমনকি প্রধানত বলপ্রয়োগও নয়। এই বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগের অর্থনৈতিক ভিত্তি, তার প্রাণশক্তি ও সাফল্যের গ্যারান্টি হল এই যে প্রলেতারিয়েত পুঁজিবাদের তুলনায় একটা উচ্চতর ধরনের সামাজিক শ্রমব্যবস্থার মুখপাত্র ও তা গণতান্ত্রিক উপায়ে কার্যকর করে। কমিউনিজমের অনিবার্য পূর্ণ বিজয়ের উৎস, শক্তি ও গ্যারান্টি এখানেই।

---

[৫০] Engels F., *Anti-Duhring*, Progress Publishers, Moscow, 1975, P.321-322.

[৫১] দেখুন, লেনিন, *রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২।

১৬. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ইতিহাস

ব্রিটেনে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছে মূলত উইলিয়াম মরিসের সমাজতান্ত্রিক লীগ এবং ১৮৮০ এর দশকে ফোবিয়ান সমাজ। পরবর্তীতে জর্জ অরওয়েলের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি ১৮৯০ এর দশক এই প্রতিনিধিত্ব চালিয়ে যায়। ১৯২০ এর দশকের শুরুতে জি. ডি. এইচ. কোল এর গিল্ড সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হয়ে ওঠে সোভিয়েত মডেলের কর্তৃত্ববাদী ধরনের এক বিকল্প সমাজতান্ত্রিক সমাজের কল্পনা। ১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দশকে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী মিচেল ফুট এবং টনি বেন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নতুন ধারণা প্রদান করেন। সিংহভাগ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীই এই ঘোষণাকে সমর্থন করেন এবং তারা ১৯৮৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে গতানুগতিক সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা পোষণকারীদের বিরোধী ছিলেন। ব্রিটেনের আধুনিক লেবার পার্টি বিশ শতক পর্যন্ত নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী পার্টি হিসেবেই মনে করত।

ইউরোপের অন্যান্য অংশে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও অনেক সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী পার্টিই ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক দলসমূহের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর সংঘবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক দলসমূহের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সামাজিক গণতন্ত্রী এবং অপূর্ণ সমাজতন্ত্রী বলে বিবেচিতদের পরিচালিত হবার পথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্র-বিরোধী বলে বিবেচিতদের জন্যও একপ্রকার নির্দেশনা দেওয়া হয় তাদের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মেলনের মাঝামাঝি সময়ে স্পেনে লেবার পার্টি এবং ওয়ার্কার্স পার্টি মার্কসবাদী আদর্শের সমর্থনে সমন্বিত হয়। ১৯৪৮ সালের চূড়ান্ত সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতালিতে ১৯৪৭ সালে ইতালিয়ান সমাজতান্ত্রিক দল যখন সোভিয়েত অর্থায়নে পরিচালিত ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগ দেয়, তখন ইতালিয়ান সমাজতান্ত্রিক দল ভেঙ্গে ইতালিয়ান সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালিয়ান পার্লামেন্টে পাঁচ দশক ছোট দল বলে অস্তিত্বশীল থাকলেও, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দলের নেতা জিসুপি সারাগাট ১৯৬৪ সালে ইতালির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

ফেনার ব্রুকওয়ে নামক একজন নের্তৃস্থানীয় স্বাধীন লেবার পার্টির সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী তাঁর *Britain's First Socialists*[৫২] গ্রন্থে প্রাথমিক পর্যায়ের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের তিনটি ধারা চিহ্নিত করেছেন। ১. সাম্যবাদী ধারা, যারা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অগ্রপথিক ছিলেন এবং জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলতেন। ২. আন্দোলনকারী ধারা, যারা কর্মস্থলে পদমর্যাদা অনুযায়ী অংশগ্রহণমূলক নিয়ন্ত্রণক্ষমতার কথা প্রচার করতেন। ৩. শ্রমজীবি ধারা, যারা সামাজিক মালিকানা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমানাধিকারের কথা বলতেন। গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়পরতা সম্পর্কে তাদের সচেতনতার কারণেই তাদেরকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অগ্রপথিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সমাজতন্ত্রী শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ১৮২৭ সালে ব্রিটেনের একটি সাময়িকীতে।[৫৩] ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী রবার্ট ওয়েন এই মতটিকে এর অনুসারীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, যাদের মূল লক্ষ্য ছিল সাম্যবাদী আন্দোলন। ওয়েনের অনুসারীরা ভোক্তা-সমবায়, আমানতদারী সংঘ এবং পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সমাজের আকারে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সাম্যবাদ উভয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন। অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনীতির সাথে বৃহদার্থে বিবেচিত গণতন্ত্রের সমন্বয় ঘটানোর পক্ষে সায় দিয়েছিল। অনেক দেশেই এই ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

উনিশ শতকের শেষার্ধে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র একটি প্রভাবশালী আন্দোলনে পরিণত হয়। জার্মানিতে ১৮৭৫ সালে লাসালীয় সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, আইজেনীয় সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সাথে একীভূত হয়ে যায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মান সামাজিক গণতন্ত্রবাদী পার্টি প্রতিষ্ঠা করা।[৫৪] অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন জনগণকে আকৃষ্ট করেছিল এবং ১৮৯১ সালে ভূমিশ্রমিকদের জন্য বার্কান্ডিন ও কুইন্সল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি গঠিত হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে কুইন্সল্যান্ডে এই পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীনে সংখ্যালঘুর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকার এক সপ্তাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী পার্টি কর্তৃক সরকার পরিচালনার প্রথম দৃষ্টান্ত ছিল এটিই। অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিক অধিকারের পক্ষে প্রধান চালিকাশক্তি ছিল অস্ট্রেলিয়ান লেবার

---

[৫২] Donald F. Busky, *Democratic Socialism: A Global Survey,* Greenwood Publishing, July 20, 2000, Quoted in Peter Hain *Ayes to the Left,* Lawrence and Wishart, p.12.
[৫৩] Hain, *op cit,* p.13.
[৫৪] Eduard Bernstein, (1961). *Evolutionary Socialism* (from Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie). Schocken Books. p. xi.

পার্টি, যাদেরকে অস্ট্রেলিয়ান শ্রমিক ইউনিয়ন এবং অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন উৎসাহিত করেছে এবং সাহায্য করেছে। হুইটম্যান সরকারের আমল থেকে অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি সামাজিক গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির যেসব সদস্য এই ধারায় উৎসাহী ছিলেন এবং এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান তারা ডানপন্থী বলে বিবেচিত হন। এ সময়ে অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টিতে বামপন্থী ধারার উদ্ভব হয়। এ ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মৌলিক সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রপন্থী, খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী সমাজতন্ত্রী, উদারতাবাদী মার্কসবাদী এবং ভূস্বামী প্রথা থেকে বেরিয়ে আসা সমাজতন্ত্রীরা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ইউজিন ভি. দেবস্ গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে পরিচালিত করেন এবং পাঁচবার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯০০ সালে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থি হিসেবে এবং পরবর্তী চারবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন সমাজবাদী পার্টি হতে।[৫৫] এই সময়কালে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রাক্কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ড্যানিয়েল ডিলিয়ন এর নেতৃত্বে সমাজবাদী শিল্প ইউনিয়নের একটি নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। এই ধারাটি এমন এক ধরনের সরকার ব্যবস্থার সমর্থন করে, যে সরকার শিল্পশ্রমিকদের ইউনিয়ননির্ভর। তারা অবশ্য চান, এই সরকার যেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসে।[৫৬] রাজনীতির এই ধারাটি আমেরিকার সমাজবাদী পার্টির ক্রমিক উন্নতি ঘটাতে থাকে, বিশেষ করে নরম্যান থমাসের নেতৃত্বে। পরবর্তীতে অবশ্য আমেরিকার গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা এই ধারাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। ১৯৮৩ সালে আমেরিকায় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সংঘ প্রতিষ্ঠার পর মিচেল হেরিংটন এবং নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক লেখক বারবারা অ্যারেনরিক যৌথভাবে এ সংঘের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। বর্তমানে দার্শনিক এবং সক্রিয় কর্মী কর্নেল ওয়েস্ট এ সংঘটির চেয়ারপার্সনদের একজন। এই সংঘটি কোনো নির্বাচনেই নিজেদের ব্যানারে প্রার্থী প্রদান করে না, কিন্তু তাদের আদর্শের আলোকে সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম করে। তাদের এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য হলো সরকারসহ যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাকে হ্রাস করে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অতি সাম্প্রতিককালে, মার্কিন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স নিজেকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান, সাধুবাদ এবং

[৫৫] Donald F. Busky, '*Democratic Socialism in North America*', *Democratic Socialism: A Global Survey*, Greenwood Publishing, 2000, pp.153-177.
[৫৬] *Ibid*, pp.150-154.

স্ক্যান্ডিনেভিয় অঞ্চলের পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার প্রশংসার মাধ্যমে যে মানসিকতা প্রকাশ পায় তা সামাজিক গণতন্ত্রের ধারণার সাথে মিলে যায়।

১৭. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কিছু ধারা বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করে, তারা সমাজতন্ত্রে রুপান্তরের পক্ষে। সামাজিক গণতন্ত্রের অন্যান্য ধারা থেকে এগুলো পৃথক। যেমন, পিটার হেইন[৫৭] সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে উদারতাবাদী সমাজতন্ত্রের শ্রেণিভুক্ত করেন যা কর্তৃত্ববাদের বিপরীত। স্ট্যালিনবাদের বিপরীতে এটি কর্তৃত্ববাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি বিকল্প। হেইনের মতানুসারে, এই দৃষ্টিভঙ্গি বিপ্লবাত্মক এবং পুনর্গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এই ধারণায় জনসাধারণ, বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিকভাবে ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই ধারণা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে বিশিষ্টতা দান করে, কারণ জাতীয়ভাবে রাষ্ট্রীয়করণ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণীত ও নিয়ন্ত্রিত হয় সরকারের দ্বারা তা সে সরকার নির্বাচিত হোক আর নাই হোক। এটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যও বটে। প্রায় একই ধরনের কিন্তু অধিকতর জটিল প্রকৃতির যুক্তি উপস্থাপন করেন নিকোস পোলানজাস।[৫৮] ড্রেপার[৫৯] সমাজতন্ত্রের একটি ধারা হিসেবে 'বিপ্লবাত্মক গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' শব্দমালা ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করেন, বিপ্লবাত্মক গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মুখপাত্রদের অন্যতম হলেন রোজা লুক্সেমবার্গ। লুক্সেমবার্গ[৬০] জোরালোভাবেই স্বাধীন শ্রমজীবী শ্রেণির ধারাবাহিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য মিথ তৈরিকারকরা তার জন্য স্বতঃস্ফূর্ততা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন।

অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অন্যান্য ধারাগুলো চূড়ান্তভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে বিপ্লবাত্মক পথে নয়, বরং ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়িক পদ্ধতিতে, সংস্কারমূলকভাবে এবং ক্রমবিকাশের মাধ্যমে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এই ধারা প্রায়ই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র থেকে পৃথক বলে বিবেচিত হয়। এই ধারার অনুসারীরা মনে করেন শ্রমিকদের

---

[৫৭] Peter Hain, *Back To The Future Of Socialism*, Policy Press, University of Bristol, UK. 2015, pp. 133-172.
[৫৮] Nicos Poulantzas, *State, Power, Socialism*, Verso, London, 2014, pp. 251-266.
[৫৯] Hal Draper, *The Two Souls Of Socialism*, Published by the Independent Socialist Committee (A Center for Socialist Education), Woolsey Street, Berkeley, Calif, 1966, pp. 8-10.
[৬০] Rosa Luxemburg, *Reform or Revolution*, Militant Publications, London, 1986, pp. 31-67.

আত্মব্যবস্থাপনা, শিল্পায়িত গণতন্ত্র এবং নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভবের ফলে উদারনৈতিক গণতন্ত্র উদারনৈতিক পুঁজিবাদী ধারা থেকে বিবর্তিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে পর্যবসিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা নিজেদেরকে সমাজতন্ত্রী ভাবেন, কারণ তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভ-লোকসাননির্ভর অর্থনীতি, বিচ্ছিন্ন শ্রম, সম্পদ ও ক্ষমতার সার্বজনীন অসমতা, বর্ণ ও লিঙ্গবৈষম্য, সামাজিক মর্যাদার অজুহাতে নিষ্ঠুরতা ও জুলুম প্রভৃতিকে বাতিল করার কথা বলেন। তারা সমাজতন্ত্রী কারণ তারা সম্পদ অর্জন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। সমতা বিধানকারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, ন্যায়সঙ্গত বন্টনব্যবস্থা, নারীবাদী চিন্তা, বর্ণভিত্তিক সমতা, অ-নিপীড়নমূলক সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতির কথাও তারা বলেন। তাদেরকে সমাজতন্ত্রী ভাবা যেতে পারে, কারণ তারা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কৌশলের কথা বলেন তা বাস্তব। সর্বাধিক সংখ্যক নাগরিকের জন্য যে আন্দোলনের কথা তারা বলেন, তা তাদেরকে একটি বাস্তবসম্মত পৃথিবীর দিকে নিয়ে যায়। তাদের সমাজতাত্ত্বিক কৌশল সমাজে শ্রেণিবৈষম্যের ধারণার স্পষ্টতা তুলে ধরে। তারা যে শ্রেণিবৈষম্যের কথা তুলে ধরেন তা সমাজের অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং বৃহদাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দেয়। সমতার একটা অর্থপূর্ণ আকার আমরা তাদের ধারণা থেকে পেতে পারি। তাদের মত অনুসরণ করার মাধ্যমে আমরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটা ফলপ্রসূ দিকনির্দেশনা পেতে পারি, যে অর্থনীতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণকারী হবে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বিষয়াদি জনকল্যাণমুখী হবে। বাজার সমাজতন্ত্রের কতিপয় প্রবক্তা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে মূলত একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেন যা রাজনৈতিক ভাবাদর্শনির্ভর।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি চার্লস টেইলর[৬১] এবং অ্যাক্সেল হনেথ[৬২] এর মতো রাষ্ট্রদার্শনিকদের চিন্তাধারার মধ্যে। হনেথ মনে করেন, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভাবাদর্শের সামাজিক ভিত্তি রয়েছে, অর্থাৎ এগুলোর উৎপত্তি হয় সমাজের সদস্যবর্গের আত্মগত সম্পর্কের আন্তঃযোগাযোগের মাধ্যমে। হনেথ উদারনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনা করেন, কেননা এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় মনে করা হয় যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত

[৬১] Charles Taylor, *A Secular Age*, The Belknap Press of Harvard University Press, London, 2007, pp. 159-211.
[৬২] Axel Honneth, The Idea of Socialism, translated by Joseph Ganahl, Polity Press, Cambridge, UK, 2017, pp. 76-108.

সম্পত্তির ধারণাগুলো হলো দেবত্বমূলক এবং বিমূর্ত। প্রকৃতপক্ষে, এগুলোর উৎপত্তি হয় মানুষের কার্যকলাপের কতগুলো সুনির্দিষ্ট সামাজিক ক্রিয়াপরতা হতে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে হনেথ জোর দেন উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি যা মনে করে আমাদের ভাল থাকা নির্ভর করে অন্যদেরকে বোঝার ওপর এবং অন্যরা আমাদেরকে কীভাবে বুঝছে তার ওপর। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র জোর দেয় সামাজিক সমষ্টিবদ্ধতার ওপর যার ফলে সমাজে দেখতে পাওয়া যায় নির্ভরশীলতার নিশ্চয়তা।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয় তাতে মনে করা হয়, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের একটি রূপ যেখানে গণতান্ত্রিক সরকারপদ্ধতি বিদ্যমান। এখানে উৎপাদনের উপায়, পুঁজি, ভূমি, সম্পদ ইত্যাদির সমষ্টিগত মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ থাকে গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে। অর্থাৎ সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হলো এমন একটি রাজনৈতিক ভাবাদর্শ যা রাজনৈতিকভাবে গণতন্ত্রের সমর্থন করে, সাথে সাথে উৎপাদনের উপায় এবং সম্পদের মালিকানার ব্যাপারে সামাজিক মালিকানার কথা বলে। এই মতবাদ জোর দেয় রাষ্ট্রসহ যেকোনো প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতির ওপর।

১৮. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথপরিক্রমা

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে, গণতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি অক্ষুন্ন থাকে এবং সাথে সাথে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসমূহ প্রসারিত হয়। বিশ শতকে প্রভাবশালী অবস্থানে দেখা গেছে একদিকে স্বৈরাচারী বা নিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্র, অন্যদিকে কল্যাণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই জনগণের চাহিদার অনুপাতে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারেনি। ঐতিহাসিকভাবে পুঁজিবাদ সামাজিক গণতন্ত্র নামে পরিচিত এক ব্যাপক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র চূড়ান্তভাবে পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার বিপক্ষে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা কেবল আপাত সমতা এবং উদার সামাজিক বন্টন ও ব্যয়নির্বাহের কথা বলেন না, বরং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক, গণতান্ত্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক বিন্যাসের কথা বলেন।

বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার যে তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয়েছে তা স্ক্যান্ডেনেভিয়া অঞ্চলভিত্তিক নয়, বরং লাতিন আমেরিকাভিত্তিক। সেখানে অনেক দেশই বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের সরকার দ্বারা চালিত হচ্ছে। পর্যবেক্ষকরা এ অঞ্চলের বামপন্থী সরকারগুলোকে সামাজিক গণতন্ত্রী এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী এ দুই ভাগে বিভক্ত

করেছেন। সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারার দেশসমূহ হলো ব্রাজিল, চিলি, উরুগুয়ে ইত্যাদি, আর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী ধারার দেশ হলো ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া এবং কোনো কোনো সরকারের মেয়াদে আর্জেন্টিনা। এসব দেশের কোনো কোনোটি আবার অন্যগুলোর তুলনায় অধিক গণতন্ত্রমনা। দুর্বল অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং ধীরগতির উন্নয়ন এ অঞ্চলে সব ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের অগ্রগতি ও বিস্তারকে অসম্ভব করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পক্ষের অধিকাংশ চিন্তাবিদ অবশ্য লাতিন আমেরিকার দৃষ্টান্তের প্রতি সংশয় প্রকাশ করেন। তারা মনে করেন, এই ধারার রাজনীতিকে সমাজতান্ত্রিক না বলে বরং জনতুষ্টিবাদী বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

যারা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে পছন্দ করেন না তারা এবং জনতুষ্টিবাদী সরকারগুলো একই ধরনের মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করেন। যেমন ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট রাফায়েল কোরেয়া বাজারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রিত সমাজের বিপক্ষেই বলেন। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মতো একুশ শতকের লাতিন আমেরিকার বামপন্থীরা বা সমাজতন্ত্রীরাও প্রগতি, গণতন্ত্র এবং অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা জনসমর্থনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠাননির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধান করেন। প্রগতিবাদী রাজনীতিকে অবশ্যই জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগী হতে হবে। লাতিন আমেরিকার বামপন্থী প্রগতিশীল সরকারগুলো এ ধরনের পুনর্গঠনের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। সেখানে বারংবার সংবিধান পুনর্লিখিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহীদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে। আবশ্যিকভাবেই এটি বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া, কেননা পুরনো পদ্ধতির সুবিধাভোগীরা নাগরিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিবর্তনশীল ও নতুন বিষয়গুলোর বিপক্ষে অবস্থান করেন। তাদের কাছে এটি মোকাবিলার প্রাথমিক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় জনতুষ্টিবাদী সংস্কৃতির সমাবেশ।

অবশ্য প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহেও নাগরিকদের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরস্পরবিরোধী নীতির মুখোমুখি হতে হয়। এখানেও প্রতিবাদকারীদের পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কিন্তু জনতুষ্টিবাদী নেতাদের এবং জনতুষ্টিবাদী আন্দোলনকে চরম ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয়। তাদের যে ঝুঁকি তা হলো তাদের স্বপ্নের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং এর অধিবাসী নির্বাচন। কারণ তারা চান না কোনো ভূখন্ডের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী সব শ্রেণির, সব ধর্মের এবং সংস্কৃতির মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিকের মর্যাদা পাক এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করুক। এই ধরনের জনতুষ্টিবাদী সংস্কৃতির বিস্তার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের

অস্তিত্বকে হুমকির মধ্যে ফেলে দেয়। কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকেরা যেমন সবক্ষেত্রে সমানভাবে বিবেচিত হয় জনতুষ্টিবাদে তা হয় না। জনতুষ্টিবাদী ধ্যান-ধারণাকে এই ধরনের যেসব সমস্যার মধ্যে দিতে যেতে হয়, সেগুলো এর জনপ্রিয়তায় ভাটার সৃষ্টি করে এবং গণতন্ত্রই বিশেষভাবে অংশগ্রহণমূলক সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রই জনগণের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে এতে ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন ব্রাজিলের ওয়ার্কার্স পার্টির মধ্যে একসময় বামপন্থী মনোভাব চরম অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগে খুব শিগগিরই তাদের স্খলন ঘটে, ফলে জনগণ একটি আধুনিক ও প্রগতিশীল মত পছন্দ করতে শুরু করে।

জনতুষ্টিবাদী রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে অধিকাংশ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ এক ধরনের রাজনৈতিক বিপ্লব বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এর বিরোধীরা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন যে তারা কোনো নাগরিকদেরকে 'আমরা' এবং 'তারা' এভাবে বিভাজন করতে চান না। তারা সবাইকে সমভাবে বিবেচনা করে একসাথে কাজ করার কথা বলেন। কিন্তু এ উভয় ধারায় রাজনৈতিক পরিবর্তনকামীদেরই কিছু না কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। লাতিন আমেরিকার বামপন্থী সরকারগুলো সাম্প্রতিককালে যেসব অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছে তাতে তারা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের যে কাঠামোর মধ্য দিয়ে আমরা যাবার স্বপ্ন দেখি বা যেসব মূল্যবোধের কথা এখানে ঘোষণা করা হয় তাতে অনেকাংশেই অপূর্ণতা রয়েছে। যদি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রই রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের মধ্যে যারা গতানুগতিক বিষয়াবলিকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণের কথা বলেন, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা অতীতে কী ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে এবং কাঙ্খিত এ রাজনৈতিক ধারণাটি কীভাবে অর্জিত হতে পারে সে বিষয়গুলো সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। অন্যথায়, আমরা পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার জটিল পরম্পরার মধ্যে অনেকটাই আটকে থাকব। আর সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের স্বপ্ন নিয়ে যারা এগুচ্ছেন তাদের স্বপ্ন হবে উনিশ শতকের ইউটোপিয়ান সমাজতাত্ত্বিকদের মতের ন্যায় কোনোপ্রকার ভিত্তি ছাড়াই একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন মডেলের ও বিভিন্নতার সমর্থন করেন। কিছু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী বাজার সমাজতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেন, যেখানে সামাজিক মালিকানাধীন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদিকে, কিছু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী আবার

বিকেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কথা বলেন।[৬৩] ঐতিহাসিকভাবেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিকেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ, যেখানে উৎপাদনের এককসমূহের প্রতিটি একেকটি সংস্থা এবং আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে এসব সংস্থাগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করে। তারা স্ট্যালিনপন্থী আজ্ঞাবাহী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিপক্ষে।[৬৪] বাজার সমাজতন্ত্রের সমকালীন প্রবক্তারা মনে করেন, সোভিয়েত মডেলের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার প্রধান কারণ হলো এটি ছিল সর্বগ্রাসী প্রকৃতির রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে সমন্বয়যুক্ত, গণতান্ত্রিক মানসিকতার অভাব এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার পর্যাপ্ত নিয়ম প্রণয়নে তাদের ব্যর্থতা।[৬৫]

১৯. সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সামঞ্জস্যতা

কিছু রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং ধর্মতাত্ত্বিক মনে করেন সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন, অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রায়েডম্যান[৬৬] মনে করতেন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কথা বিবেচনা করলে একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ একইসাথে গণতান্ত্রিক হতে পারে না। সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট নিসবেটের[৬৭] মতে, পৃথিবীর কোথাওই শুধু সমাজতন্ত্র বলে কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইরভিং ক্রিস্টলের[৬৮] মতানুসারে, সহজাতভাবেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ধারণাটি একটি অস্থায়ী ও অধ্রুব যৌগ, একটি স্ববিরোধী ধারণাসমূহের সমাহার। সকল সামাজিক গণতন্ত্রী পার্টিই ক্ষমতায় যাওয়ার পর সমাজতান্ত্রিক সমাজের কাম্য বিষয়সমূহ এবং উদারনৈতিক সমাজের ধারণাসমূহের মধ্যে একের পর এক নিজেদের পছন্দ জাহির করতে শুরু করে। যে সমাজে স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে বিবেচিত হয় এবং অন্যান্য আকস্মিক স্বার্থের সাথে আনুপাতিক হারে বন্টিত হয়, সেখানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মিচেল ম্যাকোভির মতানুসারে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, যদি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কারও কোনো অসৎ উদ্দেশ্য না থাকে এবং তাদের কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার নাও করে তথাপি, সমাজতান্ত্রিক

---

[৬৩] Anderson and Herr, Gary L. and Kathryn G. (2007). *Encyclopedia of Activism and Social Justice.* SAGE Publications, inc. p. 448.

[৬৪] Prychito, David L. (July 31, 2002). *Markets, Planning, and Democracy: Essays After the Collapse of Communism.* UK: Edward Elgar Publishing. p. 72.

[৬৫] Gregory and Stuart, Paul and Robert (2003). *Comparing Economic Systems in the Twenty-First.* South-Western College Pub. p. 152.

[৬৬] Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2002, pp. 7-21.

[৬৭] Robert A. Nisbet, The Sociological Tradition, Transsction Publishers, London, 2004, pp. 18-20.

[৬৮] Kristol Irving, *Neoconservatism: The Autobiography of an Idea*, New York, The free press, 1995, pp. 3-4.

গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় রাজনৈতিক কারণেই, অর্থনৈতিক কারণে নয়। রিচার্ড পাইপস[৬৯] মনে করেন, সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার সমন্বয়ের যে ধারণা অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা চরমভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে এবং জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আমলাদেরকে সফল করে।

অস্ট্রীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান অর্থনীতিবিদ জোসেফ এ. শুম্পিটার মনে করেন যে, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি তার *Capitalism, Socialism and Democracy* নামক গ্রন্থে জোর দিয়ে ঘোষণা করেন, পূর্ণাঙ্গ অর্থে সমাজতন্ত্রের ধারণার সাথে রাজনৈতিক গণতন্ত্র পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৭০] ১৯৬৩ সালে সর্বভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস কমিটির সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু[৭১] বলেছিলেন যে, "রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কোনো অর্থই হয় না, যদি এতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সংশ্লেষ না থাকে। আর অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।" ঐতিহাসিক রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ থিওডর ড্রেপার[৭২] বলেছেন, "সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ছাড়া এমন কোনো রাজনৈতিক ধারণার কথা আমার জানা নেই, যা অবিচলিতভাবে সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক মনোভাবের বিরোধিতা করে।"

রবার্ট হেলব্রোনার[৭৩] মনে করেন, মানবিক স্বাধীনতার ধারণার সাথে সমাজতন্ত্রের কোনো বিরোধ নেই। আসলে, সমাজতন্ত্রের ধারণা হলো মানবিক স্বাধীনতার সংক্ষিপ্তসার। এই মতবাদ ব্যক্তির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে। প্রতিটি মানুষের কাজের গণতান্ত্রিকীকরণ ও মানবিকীকরণ এখানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এখানে ব্যক্তিগত দক্ষতা ও সৃজনশীলতার মূল্যায়নের দিকটিও গুরুত্ব পেয়েছে।

বেয়ার্ড রাসটিন[৭৪] মনে করেন, সমাজতন্ত্র অর্থপূর্ণ হয় কেবল তখনই, যখন এটি গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হয়। সমাজতন্ত্রের দাবিদারদের সব কথার মূলকথা হলো, সমাজতন্ত্র অপরিহার্যভাবে গণতন্ত্রকে মূল্যবান বলে মনে করে। এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং গণতান্ত্রিক

---

[৬৯] Richard Pipes, *Communism: A History*, A Modern Library, Chronicles Book, USA, 2003, pp. 1-21.

[৭০] দেখুন, Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Routledge, London and New York, 2003, pp. 296-302.

[৭১] S. Jafar Raza Bilgrami, *'Problems of Democratic Socialism'*, *Indian Journal of political Science*, 26(4), 1965, pp. 26-31.

[৭২] Theodore Draper, *A Struggle for Power: The American Revolution*, Vintage Books, A division of Random House, inc., New York, 1997, pp. 3-25.

[৭৩] Robert L. Heilbroner, *An Inquiry into the Human Prospect: Looked at Again for the 1990s*, W. W. Norton & Company, New york, London, 1991, pp. 153-169.

[৭৪] *'Feminism and Equality'*, *Time on Two Crosses: The Collected Writings of Bayard Rustin*, (ed.) Devon W. Carbado and Donald Weise, Cleis Press Inc., San Francisco, California, 2003, pp. 237-238.

অভিজ্ঞতার আলোকেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও কর্মসূচিসমূহ পরিবর্তিত ও প্রণালীবদ্ধ হয়। সমাজতন্ত্রই হলো সেই মতবাদ যা শ্রমিকের মতবাদ, যা সামাজিক গণতন্ত্রীর মতবাদ এবং যা পশ্চিম ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দলসমূহের মতবাদ। অবশ্য আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা টেকসই এমন একটি সমাজ দেখব যেখানে এই উভয় মতবাদের আদর্শসমূহই অনুসৃত হয়। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য এমন কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই যার ভিত্তিতে দাবি করা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন সহজাতরূপেই পরস্পরবিরোধী।

আবার এমন যুক্তি দেয়া হতে পারে যে, সমাজতন্ত্র অনিবার্যভাবে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের জন্ম দেয়, যা পরবর্তীতে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর এর নিজস্ব সীমাবদ্ধতাসমূহ চাপিয়ে দেয়। এটি মূলত স্ক্যান্ডিনেভিয় অঞ্চলের জনগণের অভিযোগ। কিন্তু দেখা যায়, সমাজতন্ত্রের কাছে ইতালির রক্ষণশীল আমলাতন্ত্রের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। আবার আমেরিকার মতো অনেক দেশেই আমলাতন্ত্র অন্যদের তুলনায় সমৃদ্ধভাবে গড়ে উঠেছে এবং এজন্যই এগুলো নিয়ন্ত্রণমূলক ও উপযাচকমূলক আচরণ করে।

২০. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রত্যাশা

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা বিশ্বাস করেন যে, জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য এবং সংখ্যালঘুর স্বার্থ যাতে প্রাধান্য না পায়, সেজন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা উভয়ই গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। একটি অধিকতর ন্যায্য সমাজব্যবস্থার স্বার্থে, বিদ্যমান বৈশ্বিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে সাধারণ জনগণ তাদের জীবনমানে প্রভাব ফেলে, এমন বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেরা অংশগ্রহণ করতে পারে। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র হাতে হাত রেখে চলে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আমলাতান্ত্রিক কোনো সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান না। তারা বরং চান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ তারাই গ্রহণ করবে যারা এগুলো দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং স্টিল প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কোনো না কোনোভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানা অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন ভোক্তা চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সমবায়ের মাধ্যমেই সবচেয়ে ভালোভাবে পরিচালিত হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত সামগ্রিক অর্থনৈতিক

ব্যবস্থার ধারণার তীব্র বিরোধিতা করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাই কেবল পারে সামগ্রিক গণপরিবহনব্যবস্থা, গৃহায়ন, শক্তি উৎপাদন, বাজার ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা পুঁজিবাদীদের এ ধারণার সাথে একমত নন যে, মানুষ শুধু ক্ষুধা নিবারণ ও ব্যক্তিগত আকাঙ্খা চরিচার্থ করার জন্যই কাজ করে থাকে। মানুষ তার কাজকে উপভোগ করে, যদি সে কাজ তার জীবনকে অর্থবহ করে এবং জীবনমানের উন্নয়ন ঘটায়। নিজের সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতা থেকেই মানুষের কাজ করা উচিত। শ্রমিকদের জন্য উপভোগ্য সব ধরনের কাজ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য। বর্তমান সমাজে শ্রমিকদের পক্ষে আবেদনপূর্ণ নয়, এমন ধরনের কাজই দিনের পর দিন টিকে রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা চান, এখন থেকেই কাজকে শ্রমিকদের জন্য বোঝার ধারণার পরিবর্তে আকাঙ্খিত করে তুলতে হবে। আর এজন্য যা করতে হবে তা হলো, মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে, সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব দিতে হবে এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা মনে করেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক প্রণোদনাসমূহকে সমন্বিতভাবে প্রদান করেই মানুষকে কাজের প্রতি উজ্জীবিত করা যায়, অনুপ্রাণিত করা যায়।

যদিও এখন পর্যন্ত কোনো দেশেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটেনি, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দলগুলো এবং বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনগুলো তাদের অনুসারীদের জন্য অনেক ধরনের বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। সুইডেনের ব্যাপক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা, কানাডার জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি, ফ্রান্সের জাতীয় শিশু সুরক্ষা নীতি এবং নিকারাগুয়ার স্বাক্ষরতা কর্মসূচী থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি। আবার ১৯৬০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিটি হেলথ্ সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্বজনীন জনকল্যাণমুখি যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তা থেকেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। কারণ তারা পারিবারিক সুরক্ষার উচ্চমানের নিশ্চয়তা দিয়েছিল এবং সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে দক্ষিণ ইউরোপের অনেক দেশ বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছে এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক সমতা অর্জন করেছে। এই জাতিগুলো তাদের সম্পদের পারস্পরিক বিনিময় এবং ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকদের উন্নত জীবনমান, শ্রমিকদের উচ্চ বেতন, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, ভর্তুকিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পেরেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী পার্টিসমূহ শ্রমিক আন্দোলনকে সমর্থন করেছে, যা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন, গতানুগতিক রাজনৈতিক দলসমূহের মতো বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দলগুলো পৃথক কোনো রাজনৈতিক দল নয়। নারীবাদী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, নাগরিক অধিকার, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক অধিকারের পক্ষে নিয়োজিত আন্দোলনের মতোই সমাজতন্ত্র একটি সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠাভিত্তিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সমর্থনকারী অনেক ব্যক্তিবর্গই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সক্রিয়। তারা সেই দলের মধ্যকার বামপন্থী ধারাকে শক্তিশালী করতে কাজ করেন।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা বিদ্যমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বাতিলের পক্ষে। কেননা, তারা মনে করেন এটি ব্যক্তিগত মুনাফাভিত্তিক এবং শ্রমিক থেকে বিচ্ছিন্ন। এটি লিঙ্গ ও বর্ণবৈষম্যও বাড়িয়ে তোলে। পরিবেশের কথা বিবেচনা না করে কেবল অধিকতর মুনাফার আশায় নিষ্ঠুরভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহারের মাধ্যমে তা পরিবেশকে ক্রমেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা এমন একটি মতাদর্শের কথা বলেন যা মানবিকীকৃত, এমন একটি আন্তর্জাতিক সামাজিক বিন্যাসের কথা বলেন যা হবে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাভিত্তিক। এর বাজার ব্যবস্থাপনা এমন হবে যাতে সব ধরনের সম্পদের সুষম বন্টন হবে এবং কাজের যথাযথ মূল্যায়ন হবে। স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, স্থিতিশীল উন্নয়ন, লিঙ্গ ও বর্ণভিত্তিক সমতা এবং অ-নিপীড়নমূলক সামাজিক সম্পর্কের প্রতিও এ মতাদর্শ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এককথায়, অর্থনৈতিক ন্যায়পরতা বলতে আমরা যা বুঝি, তার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথে গণতান্ত্রিক আদর্শকে ধারণ তাদের অন্যতম মূলমন্ত্র।

মার্কসবাদ যেমন উৎপাদিত দ্রব্যসমূহে শ্রমিকদের মালিকানার কথা বলে এবং উৎপাদনের উপায়সমূহে শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তির কথা বলে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র তা বলে না। মার্কসবাদ সম্পদের মালিকানায় পরিবর্তনের কথা বলে। এটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুরোপুরি বিলোপের কথা বলে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র তা বলে না। আমরা আজ যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আছি, তার পরিবর্তে সত্যিকার সমাজতন্ত্র চায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে। যদিও এটা মার্কসবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সকলেরই স্বপ্ন, কিন্তু এটি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের কোনো পরিকল্পনা নয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এর পরিবর্তে অর্থনীতিকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং এর মালিকদের ওপর অধিকতর সীমাবদ্ধতা আরোপের কথা বলে। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত থাকবে, একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী এবং একজন শ্রমিকের প্রাপ্যতার মধ্যে কেমন ব্যবধান থাকবে। এখানে শ্রমিকদের সার্বিক অধিকারের সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা এবং ন্যূনতম মজুরি যেন সর্বোচ্চ পরিমাণে দেয়া হয় সে বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা হয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত হতে হবে, এই গতানুগতিক সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা প্রত্যাখ্যান করেন। কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রের অন্যতম প্রধান মৌলিক বিষয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা মনে করেন, একটি রাষ্ট্রের গণ-পরিবহনব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা এবং বেতনকাঠামোর মতো অনেক বিষয় যদি গণতান্ত্রিকভাবে পরিকল্পিত হয় তবে সমাজের এক অংশ অন্য অংশের তুলনায় সমৃদ্ধ হতে পারে, সম্পদশালী হতে পারে; এককথায়, সার্বিকভাবে ভাল করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা জনগণের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো প্রত্যক্ষ কতগুলো বিষয়ের উন্নতি বিধানের মাধ্যমে নিজেদের মতবাদকে শক্তিশালী করার আশা করেন। তারা মনে করেন, এভাবেই সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা গণমাধ্যম, পেশা-বৃত্তি, এবং উপযোগিতামূলক শক্তিসমূহে বিশ্বাস করেন এবং বলেন, এগুলোর জাতীয়করণ করা উচিত। তাদের মতানুসারে, সম্পদসমূহ এমনভাবে বন্টিত হওয়া উচিত যাতে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ একটি সভ্য ও উন্নত সমাজের সুফলগুলো ভোগ করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সামাজিক গণতন্ত্র এবং বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র থেকে পৃথক। সামাজিক গণতন্ত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পুঁজি এবং উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে। অন্যকথায়, এ ব্যবস্থায় অধিকাংশ সম্পদ উৎপাদিত হয় ব্যক্তিগতভাবে ও গোপনে। সামাজিক গণতন্ত্রে করারোপ, সরকারী ব্যয় নির্বাহ এবং ব্যক্তিগত খাতের পরিচালনা বিধিগুলো বিশুদ্ধ পুঁজিবাদের চেয়ে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র কোনোপ্রকার বিপ্লব বা মার্কসীয় ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং এটি পুঁজিবাদের বিলোপের কথাও বলে না। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা মনে করেন না যে, উৎপাদনের উপায়ের সাথে সরকারের যুক্ত হওয়া উচিত বা সরকারি নিয়ন্ত্রণেই উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়া উচিত, কিন্তু তারা মনে করেন, সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং শ্রমজীবী শ্রেণি যারা সম্পদ উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তারা যা পায়, তার চেয়ে তারা বেশি কিছু পাওয়ার যোগ্য। কাজেই রাষ্ট্রের কাজ হবে পুঁজিবাদী বন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তে তাদের প্রস্তাবিত বন্টনব্যবস্থা চালু করা।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ব্যাপক সংশোধনের কথা বলেন। তারা মনে করেন, পাবলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অবৈতনিকভাবে শিক্ষা প্রদান করা উচিত, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রচারণা চালানো উচিত এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা উচিত। তারা শুধু প্রান্তিক পর্যায়ের লোকদের জন্য পরিমিত পরিবর্তনের কথা বলেন না। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা এমন এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পক্ষে যা সমাজের সকলের জন্য কাজ করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থা

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের স্বরূপ, উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাই তাদের অন্তর্নিহিত কিছু দুর্বলতার দোষে দুষ্ট। পুঁজিবাদের লক্ষ্য মুনাফা। সব কিছুকে তা বিচার করতে চায় মুনাফা পাওয়া না পাওয়ার বিচারে। অপরদিকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য মানবতা। প্রশ্নটা তাই দাঁড়ায় যে, মুনাফা ও মানবতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাতে জয় হবে কার, মুনাফার নাকি মানবতার? মুনাফা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, মানবতা মানুষে মানুষে মৈত্রী এনে দেয়। এখানেও একই জিজ্ঞাসা। কার জয় হবে, বিচ্ছিন্নতার নাকি মৈত্রীর? মুনাফা ও বিচ্ছিন্নতার পক্ষে যারা তারা একদিকে, তার বিপরীতে মানবতা এবং মৈত্রীর পক্ষে যারা তারা আরেকদিকে। দ্বন্দ্ব এই দুইয়ের ভেতর। অবশ্য এ দ্বন্দ্বের প্রকাশটা আমাদের সামনে সব সময় উন্মোচিত নয়।

অবিরাম মুনাফা অর্জনই পুঁজিপতির একমাত্র কাম্য। ধনের জন্য পুঁজিপতির অপরিসীম লোভ। পুঁজিপতি মুনাফালোভী হলেও সে কিন্তু যথেষ্ট যুক্তিবাদী। সে শুধু নিজের ধন আগলিয়ে বসে থাকে না, যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে গচ্ছিত অর্থ খাটিয়ে তা বাড়াতে সে সচেষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে সে মনে করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সে মূলত শ্রমিকশ্রেণির জন্য উপকারই বয়ে আনছে। কিন্তু এখানে সমস্যাটি দেখা দেয় উদ্বৃত্ত মূল্য[১] নিয়ে। উদ্বৃত্ত মূল্য একটি বাস্তব ঘটনা। শ্রমিকশ্রেণির অভিযোগ হলো, পুঁজিপতি এই উদ্বৃত্ত মূল্যের পুরোটাই আত্মসাৎ করে। অন্যদিকে পুঁজিপতি মনে করে যে সে শ্রমিককে তার শ্রমের যথার্থ পূর্বনির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে। আর এখানেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নৈতিকতার প্রসঙ্গটি চলে আছে। পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ ন্যায় না অন্যায় তা নিয়ে ব্যাপক

[১] মার্কসীয় অর্থনৈতিক মতবাদের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব। *Capital* গ্রন্থে তিনি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেন উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব। তিনি পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ শুরু করেন পণ্য থেকে এবং উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব আবিষ্কার করেন পণ্য বিনিময়ের ধারণা থেকে। পুঁজিপতি যখন শ্রমশক্তি ক্রয় করে তখন তার ব্যবহারিক মূল্যটা চলে যায় পুঁজিপতির হাতে। ক্রয়কৃত শ্রমশক্তি ব্যবহার করে বা শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে সে করিয়ে নেয় উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন। শ্রমশক্তির একটা বিশেষ দিক হলো শ্রমশক্তি ব্যতীত অন্য কোনো পণ্য উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করে না। শ্রমশক্তির ব্যবহার সংঘটিত হয় বাজারের সীমানার বাইরে উৎপাদনের পর্যায়ে। তাই উদ্বৃত্ত মূল্যটা সৃষ্টি হয় বাজারের বাইরে উৎপাদনের স্তরেই।

বিতর্ক[২] আছে। কার্ল মার্কস অবশ্য পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতকে ন্যায় বা অন্যায় কোনোটিই বলেননি। তিনি এটাকে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত ত্রুটি বলে অভিহিত করেছেন। পুঁজিতন্ত্রের প্রধান অন্তর্বিরোধ হলো এই যে, একদিকে মিলিত সংঘবদ্ধ পরিশ্রমে উৎপাদন বেড়ে চলে, অন্যদিকে উৎপাদিত দ্রব্য হয়ে পড়ে মুষ্টিমেয় লোকের সম্পত্তি। শ্রমিক দ্রব্য উৎপাদন করলেও সে উৎপাদিত সামগ্রী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুঁজিপতি তার স্বার্থের জন্য শ্রমিককে শোষণ করে। বিষয়টি মার্কস তাঁর *পুঁজি*[৩] গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। পুঁজিবাদের প্রধান ত্রুটি হলো শোষণ ও বিচ্ছিন্নতা। *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*তে কার্ল মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের কারণেই এর পতন অবশ্যম্ভাবী।[৪]

পুঁজিবাদীরা একথা স্বীকার করবে না যে, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের জন্য উপকার বয়ে এনেছে। সমাজতন্ত্রের কাছে পুঁজিবাদের ঋণ দুদিক থেকে। সমাজতন্ত্রের ভীতিতে সন্ত্রস্ত পুঁজিবাদ শ্রমজীবি মানুষকে কিছুটা হলেও ছাড় দিয়েছে, তার বেতন বাড়িয়েছে, কিছুটা হলেও দায়িত্ব নিয়েছে সামাজিক নিরাপত্তার এবং ভান করে হলেও ভাব করছে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। এভাবে ছাড় দিয়ে পুঁজিবাদ টিকে আছে। পুঁজিবাদের জন্য আরেকটি কাজেরও সুযোগ করে দিয়েছে সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বকে ভয়াবহ শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে পুঁজিবাদী বিশ্ব সমরসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, অস্ত্র তৈরি করেছে, অস্ত্রের ব্যবসা করেছে, আর সে ব্যবসা অর্থনৈতিক দিক থেকে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। সমাজতন্ত্র একটি স্বপ্ন কেবল বঞ্চিতের নয়, বিবেকবানেরও। কিন্তু কেবল স্বপ্ন নয়, সমাজতন্ত্র একটি সংগ্রামও বটে। মানুষের সমষ্টিগত সংগ্রাম মনুষ্যত্ব সংরক্ষণের, স্বপ্ন বাস্তবায়নের। এখানেই সে ছাড়িয়ে যায় তার লোভ-লালসা ও বিচ্ছিন্নতাকে।

---

[২] উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের প্রশ্নটি মূলত সাম্প্রতিককালে বন্টন ন্যায়পরতা বিষয়ক বিতর্ক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক তথা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোনো নৈতিক আদর্শের মাধ্যমে তিনি সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলেননি। সাম্প্রতিককালে মার্কসীয় দর্শনে ন্যায়ের ধারণা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মার্কস নিজে ন্যায় সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করেছেন কিনা তা নিয়ে মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে, বিশেষ করে চিরায়ত (classical) এবং পশ্চিমা (western) মার্কসবাদীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। পুঁজিবাদী বন্টন ব্যবস্থাকে মার্কস কোনো নৈতিক অবস্থান থেকে সমালোচনা করেছেন কিনা সেটাও এক বড় প্রশ্ন। চিরায়ত মার্কসবাদীরা মার্কস এর তত্ত্বগুলোকে হুবহু মেনে নিয়ে সেগুলোকে সামনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি। তাঁরা সমাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন বস্তুগত ধারণার ভিত্তিতে। তাঁদের মতে মার্কস নিজে ন্যায় সম্পর্কে কিছু বলেননি। তিনি নীতি-নৈতিকতা প্রচার বা পুঁজিবাদী সমাজের সংস্কারের কথা বলেননি। এমনকি, পুঁজিবাদী সমাজকে অন্যায়ও বলেননি। তিনি তা ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার কথা বলেছেন। মার্কসীয় চিন্তার মধ্যে বন্টন নৈতিকতার কোনো অবস্থান নেই-এই চিন্তাধারার প্রবক্তা হলেন Robert C. Tucker। এছাড়া Allen W. Wood, George G. Brenkert, Derek P. H. Allen, Alan Ryan, G. A. Cohen, Steven Lukes, Kai Nielson প্রমূখ এই ধারার সমর্থক। অন্যদিকে পশ্চিমা মার্কসবাদীদের একটি আধুনিক ধারা যারা আদর্শবাদী তারা মনে করেন যে, মার্কসবাদের মধ্যে বন্টনমূলক ন্যায়ের তত্ত্ব রয়েছে এবং মার্কস নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে পুঁজিবাদী বন্টন-ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা মার্কসবাদকে নৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। Ziyad I. Husami, Jon Elster, Gray Young, Allen Buchanan, Tomas W. Keyes, Donald Van De Veer, Jeffrey H. Reiman R. G. Peffer প্রমূখ এই ধারার অনুসারী। উল্লেখ্য যে, কোহেন মার্কসবাদের মধ্যে বন্টন-ন্যায়পরতা আছে-এই ধারণার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, মার্কস পুঁজিবাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাকে নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে সমালোচনা করেন। আবার ব্রেনকার্ট বন্টন-ন্যায়পরতার বিরোধিতা করলেও তিনি বলেন, মার্কস স্বাধীনতার নৈতিকতা থেকে পুঁজিবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন।

[৩] দেখুন, কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)।

[৪] দেখুন, Marx, K. & Engels, F., *The Communist Menifesto*, (Penguin, Hammondsworth, 1967).

যুগে যুগে সমাজতন্ত্র তার রূপটাই শুধু বদলায়, মর্মবস্তু থাকে একই। আর সেটি হচ্ছে, একটি বৈষম্যহীন সমাজ। সমাজে বৈষম্যই স্বাভাবিক, তবে মানুষ বৈষম্যের অবসানও চায়। বঞ্চিত মানুষ তো সেটা চায়ই, বিবেকবান মানুষও চায়। মানুষ সামাজিক প্রাণী। একা কেউ বাঁচতে পারে না, বাঁচে না। তাই সে মৈত্রী চায়, চায় সঙ্গ, কামনা করে ভালবাসা। বৈষম্যের প্রাচীর খাড়া করে রাখলে এর কোনোটাই সম্ভব নয়। সেজন্যই দরকার হয় প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে ফেলার, আবশ্যক হয় বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টার। পুঁজিবাদ মানুষ ও মনুষ্যত্বের কেমন দুর্দশা ঘটাতে পারে তার দৃষ্টান্ত আজ পাওয়া যাবে পতন পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নে। আমেরিকা ও ইউরোপে পুঁজিবাদ যে কিছুটা প্রচ্ছন্ন, সেখানে অন্য দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে এনে শ্রমজীবী মানুষকে কিছুটা সুবিধা দেয়, ভাগ দেয় অল্পস্বল্প এবং উগ্র জাতীয় অভিমান সৃষ্টি করে এই ধারণা দেয় যে, সকলেই খুব ভাল আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন সমাজতন্ত্রীদের জন্য যে হতাশার কারণ সৃষ্টি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পতনের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গলো তার ভেতরের শ্রেণি দ্বন্দ্বে। আসলে সেখানে আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। এই আমলাতন্ত্র চলত পার্টির নামে, সে জন্য তা অনেক বেশি শক্তিশালী ও প্রচ্ছন্ন ছিল সাধারণ আমলাতন্ত্রের তুলনায়। সেখানে আমলারা বিত্তবান হয়ে উঠেছিল। তারা এই সম্পদ আরো বাড়াতে চেয়েছিল, বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল নিজেদের ভোগ-বিলাসের পরিমাণ। অন্যরা যারা এই সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল তাদেরও লোভ ছিল ঐ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি। তারা চাইছিল এমন একটি ব্যবস্থা যাতে স্বল্প পরিমাণে হলেও এগুলো ক্রয় করা যায়, ঘরে বসেই সুখ ভোগ করা যায়। সেজন্য তারা সমাজতন্ত্র ভাঙ্গল এবং পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করল।

প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ধারণা হল রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী পুঁজিবাদ মূলগতভাবে আলাদা এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদই হচ্ছে সমাজতন্ত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি ধরনই শেষ বিচারে এক। আর তা হলো পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে সমাজতন্ত্রের চিরায়ত লক্ষ্য হলো সমতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরো এগিয়ে যাওয়া। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক অরাজকতা প্রকট এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে আছে যা মানুষের সব ধরনের দুর্দশার কারণ। এ দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন এই পরিবর্তনোন্মুখ সমকালের জীবনে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে বলেছিলেন পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়। তারপর সাম্রাজ্যবাদ প্রায় একশ বছর দোর্দন্ড প্রতাপে পৃথিবীব্যাপী তার নিয়ন্ত্রণ রাখার পর এখন তার নিয়ন্ত্রণ দ্রুত শিথিল হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মার্কিনসহ অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে হলেও তাদের এ শক্তির স্থায়িত্ব যে আর বেশিদিন নেই, এটা তাদের তৎপরতা, সংকট ও নানা ধরনের বেসামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হচ্ছে। ২০১১ সালের শেষ দিক থেকে নিউইয়র্কে 'ওয়াল স্ট্রিট দখল কর' আন্দোলনে যেভাবে হাজার হাজার শ্রমিক, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ নেমে এসেছে, তার ব্যাপকতা অনেক বেশি। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার সিয়াটলে যে শ্রমিক ও গণবিক্ষোভের সূচনা হয়েছিল ১৯৯৯ সালে, তার ধারাবাহিকতাই বর্তমানে 'ওয়াল স্ট্রিট দখল কর' এবং পুঁজিবাদ খতম কর আন্দোলনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পুঁজিবাদীরা ঘোষণা করেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র শেষ হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী এখন শুধু বিশ্বায়নের নতুন বিশ্বব্যবস্থা। কিন্তু এই নতুন বিশ্বব্যবস্থা আসলে পুঁজিবাদের চরম রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত মূল দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত মালিকানা ও সামাজিক উৎপাদনের দ্বন্দ্বের সমাধান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরা মনে করেন, এই দ্বন্দ্বের সমাধান যে ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব সেটি হলো সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র হলো সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পরবর্তী ব্যবস্থা। বিদ্যমান সামাজিক ধ্যান-ধারণা থেকে আপাতদৃষ্টিতে তাদের মনে হয়, সমাজতন্ত্রই হচ্ছে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সব দেশের অবধারিত ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের মানবিকতাবিরোধী ভূমিকা আর সমাজতন্ত্রের স্বপ্নের অকালমৃত্যুর কারণে এখন আর মানুষ এগুলোতে বিশ্বাস রাখতে পারছে না। মানুষ চাইছে এমন একটি রাজনৈতিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে ব্যক্তির মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

সম্পদের আয়, বন্টন, ভোগ, মালিকানা ইত্যাদি ধারণাসমূহের প্রেক্ষিতে সমকালীন রাষ্ট্রদর্শনে বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এখানে নৈতিকতার উৎস অনুসন্ধান করে যথার্থ ন্যায়পরতার ধারণার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। রাষ্টদার্শনিক ও নীতিদার্শনিকরা সমাজকাঠামোর বিশ্লেষণের মাধমে সামাজিক দ্বন্দ্বের মীমাংসার চিন্তা করেছেন। এক্ষেত্রে কার্ল মার্কস ও জন রলসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মার্কস তাঁর *Critique of the Gotha Programme*[৫] এ সমাজতান্ত্রিক সমাজের যে রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন তার মধ্যে বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণা নিহিত রয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক। এর মূল কারণ হলো সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা। তিনি মনে করতেন, এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাঁর মতে, সমাজ পরিচালিত হতে হবে বন্টনের এমন নীতি অনুযায়ী যা আয় ও সমবন্টনকে নিশ্চিত করবে। রলসের বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণা স্বাধীনতা ও সমতার ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করেন মূখ্য দ্রব্যসামগ্রী যেহেতু সীমিত, সেহেতু যোগ্যতা অনুযায়ী সেগুলো বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক সংকট নিরসনে তিনি সম্পদের সমতাভিত্তিক বন্টনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এই দুই চিন্তাবিদ সামাজিক বৈষম্য ও অসমতাকে সামাজিক সংকটের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এ সংকট নিরসনে আয় ও সম্পদের সমতাভিত্তিক বন্টনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাদের চিন্তার মধ্যে এমন একটি সমাজের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যেখানে স্বাধীনতা, মানবিকতা ও মানবিক মুক্তির নৈতিকতার ধারণা নিহিত।

আমাদের বর্তমান গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র হলেও এখানে এদের মধ্যে কোনো তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কোনো একটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়নি। কারণ প্রকৃত অর্থে এগুলোর একটি অন্যটির বিকল্প হতে পারে না। পুঁজিবাদ কেবলমাত্র একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর সমাজতন্ত্র একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদের তুলনা করা যায় বা একটিকে অন্যটির বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কাজেই সামগ্রিকভাবে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের বিকল্প হতে পারে না। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এদের যে ব্যর্থতা ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে, তাতে খুব সহজেই ধরে নেয়া যেতে পারে যে এগুলো হয়তো আর কখনই তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না। অর্থাৎ একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। তাই এখানে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের স্বরূপ, উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনার সাথে সাথে এগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত বিষয় গণতন্ত্রের স্বরূপ, উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসও পর্যালোচনা করা হয়েছে। আর এভাবেই ভবিষ্যতের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি দিকনির্দেশনা পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। ভবিষ্যতের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য সাম্প্রতিক বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রবণতার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা দরকার।

[৫] দেখুন, Marx, Karl, *Collected Works*, Vol. 14, Moscow: Progress Publishers, 1972.

১. বৈশ্বিক রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ

বৈশ্বিক রাজনীতির সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে আমরা এ সময়টাকে বিভক্তি ও অনিশ্চয়তার সময় বলে চিহ্নিত করতে পারি। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিভক্তি ও বৈষম্য নতুন নয়। সব দেশে ও সব সমাজে সব সময়েই বিভক্তি থেকেছে, কিন্তু এতটা প্রকট রূপে আগে কখনও দেখা যায় নি। এখন আমরা যেসব ঘটনাপ্রবাহ দেখছি, যেসব রাজনীতিবিদ প্রভাবশালী হয়ে উঠছেন, যেসব প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, সেগুলো আশু ভবিষ্যতে পৃথিবীজুড়ে এক অনিশ্চিত সময়েরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। স্থিতাবস্থা সব সময়ই ইতিবাচক নয়, অনেক ক্ষেত্রেই স্থিতাবস্থার অবসানই কাম্য। তেমনি পরিবর্তন মানেই অগ্রগতি নয়, পরিবর্তন মাত্রই ইতিবাচক নয়, সেটাও আমাদের মনে রাখা দরকার। পশ্চাদ্‌গামী যাত্রাও পরিবর্তন, কিন্তু তা অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্খিত।

সাম্প্রতিক সময়ের বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাগুলোর মধ্যে ব্রেক্সিট[৬], যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন, ফিলিপাইনে প্রেসিডেন্ট দুতার্তের উত্থান, কলম্বিয়ার গণভোটে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে শান্তিচুক্তি প্রত্যাখ্যান, তুরস্কে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান, কিউবার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কোন্নয়ন, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে বাশার সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য, ব্রাজিলের রাষ্ট্রপ্রধান দিলমা রুসেফ ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক গুন হির অভিশংসন, ভেনিজুয়েলার অব্যাহত রাজনৈতিক সংকট–এসবের মধ্যেই আছে পরিবর্তনের লক্ষণ এবং অধিকতর পরিবর্তনের ইঙ্গিত। বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়া ও প্রেসিডেন্ট পুতিনের অবস্থা ও অবস্থান যে আগের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্রিমিয়া দখলের মধ্য দিয়ে পুতিন জানিয়েছিলেন যে সামরিক শক্তি ব্যবহারে তিনি অনীহ নন। সিরিয়ায় বাশার আল আসাদের সরকারকে রক্ষায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে তিনি রাশিয়ার আগ্রাসী নতুন ভূমিকার জানান দিয়েছেন। রাশিয়া যে তার প্রভাব ও শক্তির প্রয়োগ কেবল মধ্যপ্রাচ্যেই সীমিত রাখবে না, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টায় তাই প্রমাণিত হয়। রাশিয়ার এই চেষ্টার কারণে রুশ-মার্কিন ক্রমাবনতিশীল সম্পর্ক তিক্ততার পর্যায়ে নেমেছে, যা রাশিয়ার ওপর আরও অবরোধ এবং ৩৫ জন রুশ কূটনীতিককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণার মধ্যে স্পষ্ট। অর্থনীতি ও জনসংখ্যার অনুপাতে রাশিয়ায় হয়তো ভাটার টান দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কৌশলগত দিক থেকে তার পুনর্জাগরণ ঘটছে। এই মুহূর্তে তারা সামরিক বাহিনীকে আবারও ব্যাপক অস্ত্রে সজ্জিত

[৬] ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ইইউ এর অন্য ২৭ (সাতাশ) টি সদস্যরাষ্ট্রের সাথে অবাধ আর্থিক লেনদেন, পণ্য বিনিময় ও সার্বিকভাবে পারস্পরিক সহযোগিতাবিষয়ক চুক্তি থেকে ব্রিটেনের সরে আসা। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একই সীমারেখার অধীনে থাকার যে চুক্তি হয়েছিল তা থেকে সরে এসে বৃটেন আবার নিজস্ব সীমারেখার অধীনে থাকা এবং জনগণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও লেনদেনের ওপর পুনঃনিয়ন্ত্রণ আরোপ করাই ব্রেক্সিটের মূলকথা।

করছে, যার মাধ্যমে তাদের বৈশ্বিক প্রভাব বাড়বে। ক্রেমলিনের সর্বশেষ ভূকৌশলগত লক্ষ্য হচ্ছে ভূরাজনৈতিক দাবার বোর্ড আরও বড় করা। বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব যে হ্রাস পেয়েছে তা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন সবচেয়ে বেশি সহজে অনুধাবন করা গেছে।

বর্তমানে আঞ্চলিক শক্তিগুলোর মধ্যে নতুন বিন্যাসও দেখা যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-সিরিয়া, রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্টতা নতুন নয়, কিন্তু তার সঙ্গে তুরস্কের সংযুক্তির যে আভাস পাওয়া যায়, তাতে ওই অঞ্চলে নতুন মেরুকরণের এবং সহযোগিতা কাঠামো গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বা আশঙ্কার ইঙ্গিত আছে। এর বিপরীতে সৌদি আরবের যুদ্ধংদেহি মনোভাব ও ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি অবজ্ঞা বিবেচনায় নিলে আরও বেশি অস্থিতিশীল মধ্যপ্রাচ্যের ছবিই ভেসে ওঠে। এই অঞ্চলে পরিবর্তনের আরেক ইঙ্গিত হচ্ছে ইসরায়েলের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গির বদল। কয়েক দশক ধরে অধিকৃত ফিলিস্তিনি এলাকায় ইসরায়েলের বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কোনো রকম নিন্দা প্রস্তাব পাশ করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে। কিন্তু ২০১৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকলে নিন্দা প্রস্তাব পাশ হয় এবং এই নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন ইসরায়েলের পক্ষেই তার প্রশাসন অবস্থান নেবে। রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের অবস্থানও অনেকটা এই পক্ষেই। এই প্রস্তাবের আশু কার্যকারিতা না থাকলেও এর প্রভাব যে ভবিষ্যতে থাকবে, সেটা প্রায় নিশ্চিত।

পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রভাব বিস্তার রোধে মার্কিন প্রশাসন যে 'এশিয়া পিভট বা ভরকেন্দ্র নীতি'[৭] এর উদ্যোগ নিয়েছিল, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য ক্রমশ বাড়ানো। কিন্তু ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ চুক্তি[৮] বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণার ফলে সেই প্রচেষ্টা এখন বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এতে অনুমান করা যায় যে, অর্থনৈতিকভাবে চীনের প্রভাববলয়

[৭] ভবিষ্যৎ অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণে ওবামা প্রশাসনের একটি নীতি হলো এশিয়া পিভট। ট্রাম্পের আগের দুই প্রেসিডেন্টের টার্মে মোট ষোল বছরে সবসময় আমেরিকার বাণিজ্য স্বার্থের ওপর রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বিদেশনীতি সাজানো ছিল। একথা সত্য যে চীনের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব ঠেকানোর সক্ষমতা পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোনো দেশেরই নেই। চীন ঠেকানো বৈদেশিক যে নীতি আমেরিকা গ্রহণ করেছিল তাতে সায় থাকলেও এ অঞ্চলের দেশগুলো তাই চীনের সাথে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না গিয়ে বরং তার সুনজরে থাকার চেষ্টাই করে গেছে।

[৮] ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) চুক্তি হলো চীনকে বাদ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১২ টি দেশকে একটি বহুপক্ষীয় অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক বন্ধনে আনার চুক্তি প্রস্তাবনা। ক্ষমতা ছাড়ার আগমূহুর্ত পর্যন্ত ওবামা প্রশাসন চুক্তিটি স্বাক্ষর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। কারণ ওবামা প্রশাসন মনে করেছিল যে টুকরো টুকরো বিশ্বে টিপিপি হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি যা ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধ এবং বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার অঞ্চলটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের নিশ্চয়তা দেবে। কিন্তু বহুজাতিকের চেয়ে দ্বিপক্ষীয় বানিজ্যিক ব্যবস্থাপনার সমর্থক ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহনের পর টিপিপি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে যাওয়া তথা চুক্তিটি অনুস্বাক্ষর না করার ঘোষণা দেওয়াতে চুক্তিটি কার্যত বাতিল হয়ে যায়।

বিস্তৃতির পথ উন্মুক্ত হবে। চীন ও ফিলিপাইনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন সেই দিকেই অঙ্গুলিসংকেত করে। এর একটি অনিবার্য পরিণতি হবে দক্ষিন চীন সাগরে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি। সাম্প্রতিককালে আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ এশিয়ায়, যার প্রভাব ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেই অনুমান করা যায়। কাশ্মীরকেন্দ্রিক ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা ও বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সার্কের শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত করার ঘটনা ভবিষ্যতে এই উত্তেজনা প্রশমনের বদলে আরও বেশি টানাপোড়েনের আশঙ্কাই তৈরি করেছে।

২. বিগত বছরগুলোর কয়েকটি প্রবণতা

পৃথিবীজুড়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান, পপুলিজম[৯] বা জনতুষ্টিবাদের বিকাশ, জেনোফোবিয়া[১০], রাজনীতির মূলধারায় ইসলামোফোবিয়ার[১১] স্থান লাভ ও তার বিপরীতে ইসলামপন্থী উগ্র চরমপন্থার বিস্তার। এই প্রবণতাগুলোরই কিছু কিছু ব্রেক্সিট সম্ভবপর করে তুলেছে। ইউরোপে উগ্র দক্ষিণপন্থী দল যেমন অস্ট্রিয়ায় ফ্রিডম পার্টি, ব্রিটেনে ইনডিপেনডেন্স পার্টি, ফ্রান্সে ন্যাশনাল ফ্রন্ট, ডেনমার্কে ড্যানিশ পিপলস পার্টি, হাঙ্গেরিতে কেডিএনপির মতো দলকে মূলধারার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের পেছনেও একই প্রবণতার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। কিন্তু এটা শুধু ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রের বিষয় নয়, এশিয়া এবং আফ্রিকায়ও এর উপস্থিতি সুস্পষ্ট। এই প্রবণতাগুলোর উপস্থিতি এবং শক্তিশালী প্রভাব নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। কিন্তু এটি আরও বেশি উদ্বেগজনক এই কারণে, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কর্তৃত্বপরায়ণ নেতাদের উত্থান। উগ্র জাতীয়তাবাদ, জনতুষ্টিবাদ ও জেনোফোবিয়া যে কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির অনুকূল, তা ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ১৯৩০ এর দশক তার প্রমাণ। একসময় ভাবা হয়েছিল, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে পৃথিবী আর সেই পথে এগোবে না, কিন্তু গত দুই-এক বছরে যেসব রাজনীতিক সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছেন এবং প্রভাব বিস্তার করেছেন–পুতিন, দুতার্তে, ট্রাম্প, ফারাগে, এরদোগান, মাদুরো, সু চি–তাদের আচরণ ও বক্তব্যই

[৯] জনসাধারণের আবেগ, অনুভূতি ও ভয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের ধারণা হলো পপুলিজম বা জনতুষ্টিবাদ। এ মতবাদে সাধারণ জনগণের অভিন্ন স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। রাজনীতির এই ধারাটি সাধারণ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর নিশ্চয়তার ঘোষণা দেয়। এর পাশাপাশি এ মতবাদ সাধারণ জনগণকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বা অজনপ্রিয় জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিয়ে যায়। কখনও কখনও ক্ষমতাশালী বা ধণী শ্রেণির বিরুদ্ধেও এ মতবাদ জনসমর্থন আদায়ের কাজ করে থাকে।

[১০] জেনোফোবিয়া বলতে বোঝায় বিদেশিদের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাবের বিস্তার। অনুন্নত বিশ্বের লোকজন সাধারণত কর্মসূত্রে উন্নত বিশ্বে পাড়ি জমায়, অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্রে আসে। কর্মসূত্রে বা ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্রে আসা এসব লোকজনের অনেকেই দীর্ঘকাল অবস্থান করার কারণে নাগরিকত্ব পেয়ে যায় অর্থাৎ স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ লাভ করে। উন্নত বিশ্বের কিছু কিছু দেশে আবার অভিবাসন নীতির কারণে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের লোকেরা নাগরিকত্ব লাভ করে থাকার সুযোগ পায়। যেসব দেশে এ ধরনের লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে সেসব দেশের প্রকৃত নাগরিকগণ আস্তে আস্তে মনে করতে শুরু করেছে যে, তাদেরকে সাহায্য করতে আসা লোকজন তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করেছে বা ভবিষ্যতে করবে এবং তাদের অধিকার ক্ষুন্ন হবে এই আশংকাই জেনোফোবিয়া।

[১১] ইসলামোফোবিয়া কথাটির আভিধানিক অর্থ হলো ইসলামভীতি (ধর্ম)। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদী ধারণার উত্থানের সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের প্রতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী এ মনোভাবের সূত্রপাত বিশ শতকের শুরুতে হলেও তা লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে ১৯৮০ এর দশকে। ইসলামোফোবিয়ার কারণ ও বৈশিষ্ট্যগত দিক নিয়ে বরাবরই বিতর্ক রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ এ ধারণাটির বিকাশে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রমাণ করে যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাই তাদের লক্ষ্য। নিয়ন্ত্রণহীন বৈষম্যমূলক বিশ্বায়নের বিপরীতে সংরক্ষণবাদী অর্থনৈতিক নীতি ও জাতীয়তাবাদের নামে নিজস্ব জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেবে, তাতে বিশ্বের নিরাপত্তা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য মোচন বা স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা বাড়বে না। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়।

বিশ্বপরিস্থিতি বর্তমানে জটিল। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে। তিনি যদি সত্যিই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে চান, তাহলে পৃথিবীর সর্বত্রই সমস্যা দেখা দেবে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যদি ব্যাহত হয়, তাহলে দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশগুলো যেভাবে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করেছে এবং বিদেশিদের বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট ও সুবিধা পাচ্ছে তা শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারবে কিনা সেই প্রশ্ন উঠবে।

বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের রূপ, প্রকৃতি ও ব্যাপ্তিতে পরিবর্তন এসেছে। আইএস যতই তার ইরাক ও সিরিয়ার ঘাঁটি থেকে বিতারিত হচ্ছে, ততই তার অনুসারীরা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের আনাচে-কানাচে। ইউরোপে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি তার প্রমাণ। প্রমাণ তুরস্ক, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ–এমন আরও অনেক দেশ। আইএস তার উত্থানের সময়কালে যে শক্তি সঞ্চয় করেছে, সাম্প্রতিক সময়কে একাদিক্রমে তার পতনের সূচনা ও ভৌগলিকভাবে তার আদর্শের বিস্তারের সময় বলেই ভাবতে হবে। মনে রাখা দরকার, আইএসই একমাত্র আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী নয়। আল কায়দার পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াও বর্তমানে বেশ জোরেশোরেই চলছে। তদুপরি আছে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে জঙ্গীগোষ্ঠী, যারা নিজ নিজ দেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। এর সঙ্গে আমরা দেখছি স্বতঃপ্রণোদিত সন্ত্রাসীদের উত্থান, যারা সাংগঠনিকভাবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীদের সাথে যুক্ত না হলেও আদর্শিকভাবে প্রণোদিত হয়েছে। এই আদর্শিক প্রণোদনার কারণ ভিন্ন ভিন্ন, তার পটভূমিতেও পার্থক্য আছে। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ, জনতুষ্টিবাদ, জেনোফোবিয়া, অসহিষ্ণুতা ও কর্তৃত্ববাদী শাসন সন্ত্রাসবাদীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। আগামির দিনগুলোতে কী ঘটবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তাই স্বাভাবিক। সাম্প্রতিককালের এসব পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতের সেই অনিশ্চয়তা যে কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, সেটাই সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

৩. বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক ভূরাজনীতি

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সামনে এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হচ্ছে জনতুষ্টিবাদের অভাবিত উন্নতি এবং ব্রেক্সিট (যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থকে বেরিয়ে যাওয়া)। এ থেকে গণতান্ত্রিক দেশগুলো যে শিক্ষা নেবে তা হলো: ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন। বিশ্বায়নের কারণে মানুষের অবস্থার উন্নতি হলেও কারখানা ও শ্রমিকেরা স্থানচ্যুত হয়েছে, আয়ের অসমতা বেড়েছে। অর্থনৈতিক অসমতা বাড়ার পেছনে বিশ্বায়নের চেয়ে প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতাকে বেশি দায়ী করা হয়, যার কারণে উন্নত দেশগুলোতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। এসবের প্রেক্ষিতে উদীয়মান গণতান্ত্রিক দেশের নীতিপ্রণেতারা অসমতাকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তারা সমাজে মানুষের সচলতা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন, যাতে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির কারণে মধ্য ও শ্রমিক শ্রেণি উৎখাত না হয়, এসব দেশে যেন জনতুষ্টিবাদের উত্থান বা ব্রেক্সিট হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক দেশগুলোর এমন নীতি গ্রহণ করা উচিত যাতে করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দিকে নজর দেওয়া যায় এবং স্থানচ্যুত শ্রমিকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।

তবে গণতান্ত্রিক দেশগুলো যদি অভ্যন্তরীণ আয় ও সম্পদ বৈষম্য কমিয়েও আনে মানুষের মনে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকেই যাবে। যুক্তরাজ্যের ব্রেক্সিট ভোটের সময়ও একই ব্যাপার ঘটেছে। সেখানে ইউরোপীয় জোট ত্যাগের সমর্থকেরা জোর দিয়ে বলেছিলেন, ইউনিয়নের অনুমানসিদ্ধ জটিল বিধিবিধান ও মাত্রাতিরিক্ত সদস্য ফির কারণে ব্রিটিশ অর্থনীতি মার খাচ্ছে। ফলে এটা অসমতার শিকার ও বাদ পড়া মানুষদের জন্য বড় এজেন্ডা হতে পারে না। এখন জানা যাচ্ছে, ধনী ব্যবসায়ীরাই ইউনিয়ন ত্যাগের সমর্থকদের পালে দমকা হাওয়া লাগিয়েছিলেন।

জনতুষ্টিবাদী ও ব্রেক্সিটবাদীদের এক জায়গায় মিল রয়েছে। বিশ্বায়নের জন্য বাদ পড়ে যাওয়ার কারণে নয়, বরং তারা নিজেদের ভবিষ্যতের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার কারণে এক অভিন্ন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছে। ক্রমবর্ধমান আয় অসমতার কারণে তাদের দুর্ভোগ বাড়তে পারে, সে জন্যই সব শ্রেণির মানুষই এক ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভুগছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে যে সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, তাতে সেখানকার মানুষের মনে একই অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন হয়েছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আমলে চীনাদের মনে। অবশ্য এসব দেশে আয়বৈষম্য ছিল খুবই নগণ্য। জনতুষ্টিবাদীরা ও ব্রেক্সিটবাদীরা হয়তো বিশ্বায়নের প্রভাব অনুমান করছেন, কারণ সামগ্রিকভাবে অসমতা কিন্তু কমছে–ব্যাপারটা আপাতভাবে স্ববিরোধী মনে

হলেও এতে সত্যের উপাদান আছে। বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় প্রভাব হচ্ছে, এর মাধ্যমে উদীয়মান দেশগুলোর কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করে আনা গেছে।

ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ আয়বৈষম্য নয়, বরং আন্তর্জাতিক পরিসরে নিম্ন হারের অসমতার কারণেই বৈশ্বিক ব্যবস্থার ওপর চাপ পড়েছে, মেলবন্ধন হচ্ছে না। পশ্চিমা দেশগুলো যা দিতে পারে তার সঙ্গে উদীয়মান গণতান্ত্রিক দেশগুলোর চাহিদা মিলছে না। ট্রান্স আটলান্টিক যে অক্ষটি এতকাল পৃথিবী চালাত, তারা ক্ষমতা হারাচ্ছে, আর তার প্রভাব টের পাচ্ছে সে দেশগুলোর অভিজাত মানুষসহ আমজনতা। জনতুষ্টিবাদী ও ত্যাগবাদীরা মনে করেন যে, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে এই অক্ষ আবারও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ক্রমিক উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনতে হবে, তা না হলে অস্থিতিশীলতা দীর্ঘস্থায়ী হবে। আয়বৈষম্য কমানো হলে দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি হবে, উন্নত দেশগুলোতে মানুষের উৎকণ্ঠা কমবে।

২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অনেক ইউরোপীয় দেশ নানা অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন যতটা অস্থিতিশীল অবস্থায় আছে, জন্মের পর কখনই এতটা অস্থিতিশীল ছিল না। কিছু অভিন্ন কারণে তারা এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোর উচিত, সম্মিলিতভাবে এই সমস্যা মোকাবিলা করা, যে প্রয়োজনীয়তা এখন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এর বিপরীত ব্যাপারটা ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে যখন বোঝাপড়াটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কারণে সেই ঐক্যের সম্ভাবনা ভেঙ্গে পড়েছে।

ইউরোপ এখন তিনটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এর প্রথমটিই হচ্ছে ব্রেক্সিট, যেটা গত কয়েক প্রজন্মের মধ্যে ব্রিটিশ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা। কেউ হয়তো বলতে পারেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়া ভুল ছিল। কিন্তু যারা বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিল, তাদের বেশিরভাগই মনে করে, এখন অতি দ্রুত এটা বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্বাচনের রায়কে নীতিতে পরিণত করার ব্যাপারটা অনেক ভাবনা-চিন্তা করে নির্ধারণ করতে হবে। এখন ব্রিটিশ সরকার যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় কোন ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তাতে নজর দেয়, তাহলে আমরা সতর্কতার সাথে আশাবাদী হতে পারি। এখান থেকে বিশ্ববাসীর জন্য ভাল কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।

ইউরোপের দ্বিতীয় বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দুর্বল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্র ও অধিকাংশ এশীয় দেশের তুলনায় কম। একই সঙ্গে তার জ্বালানি ও শ্রমের খরচ এশিয়ার তুলনায় দ্বিগুণ। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর উচিত হবে বাজারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা এবং শিল্পকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করা, যেটা যুক্তরাজ্য বহুদিন ধরে বলে আসছিল। ইউরোপের তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সামাজিক অসমতা। স্পেন, পর্তুগাল ও গ্রিসের এক চতুর্থাংশ তরুণ বেকার।[১২] অনেক মানুষই বুঝতে পারে, সমৃদ্ধির ফসলের বিতরণ সঠিকভাবে হয়নি। বিশ্বায়ন সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর জন্য ভালো হলেও, এর কারণে অনেক মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বাদ পড়ে গেছে। তারা এখন ভোটের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তারা বলতে চাইছে, তাদের কথা শুনতে হবে, তাদের উদ্বেগের জবাব দিতে হবে।

এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র এখন কী করে তা দেখার বিষয়। ইউরোপীয় দেশগুলোর এখন সক্রিয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন হতে পারে, যারা যুক্তরাজ্যের মতো দেশের সঙ্গে নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা সহযোগিতা বজায় রাখবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আটলান্টিকের উভয় পারের মধ্যে যে সমঝোতা গড়ে উঠেছিল তা এতকাল পৃথিবীকে বাঁচিয়েছে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে সংকটের দোলাচলে পৃথিবীর মানুষ দোদুল্যমান, তা মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন হতে পারে। রাশিয়ার ইউক্রেনে ঢোকা ও ক্রিমিয়া অধিগ্রহণ আন্তর্জাতিক আইনের শাসনের লঙ্ঘন, তা সত্ত্বেও ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে, বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা রক্ষার স্বার্থে রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য সহায়তা করতে পারে।

৪. জনতুষ্টিবাদের উত্থান

গত কয়েক বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতির গতিধারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'পপুলিজম' বা জনতুষ্টিবাদ শব্দটির বেশ ব্যবহার হয়েছে।[১৩] ২০১৬ সালকে অনেকে নতুন জনতুষ্টিবাদের উত্থানের বছর হিসেবেও বিবেচনা করছেন। জনতুষ্টিবাদের আদিরূপ কেমন ছিল, বর্তমানে তা কোথায় দাঁড়িয়েছে বা সামনে কী হতে পারে–এসব নিয়ে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে।

---

[১২] সূত্র: *প্রথম আলো*, ২৩ জানুয়ারি ২০১৭।

[১৩] উনিশ শতকের শেষ দিকে আমেরিকান ব্যাংক ও রেলপথগুলোর ওপর একচেটিয়াতন্ত্রের বিরুদ্ধে সে দেশের কৃষকদের প্রতিবাদ আন্দোলন বোঝাতে জনতুষ্টিবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। এখন এই শব্দ দিয়ে বোঝানো হয় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সুবিধাভোগী ও ক্ষমতাধর অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে একটি ধারা হিসেবে জনতুষ্টিবাদের উত্থানপর্ব আসলে বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে। কিন্তু যুক্তরাজ্যে গণভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়া (ব্রেক্সিট) ও যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের বিজয় তাত্ত্বিক আলোচনার একটি বিষয় হিসেবে জনতুষ্টিবাদকে সামনে নিয়ে এসেছে। ব্রেক্সিটের গণভোট ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রচারণায় জনতুষ্টিবাদী কৌশলকে বেছে নেওয়া ও সফল হওয়ায় এ নিয়ে এখন আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই।

কিন্তু জনতুষ্টিবাদ বা এই ধারার রাজনীতি বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে বিশ্বব্যাপী দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রাজনীতির খুব অমিল আছে বলে মনে হয় না। জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির মূল কৌশলই বিশ্ববাসী তাদের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের সরকার বা বিরোধী দল কাউকেই রাজনীতির এই ধারার বাইরে ফেলা যাচ্ছে না। একটি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যায়। এসব বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনীতিতে যে ধারার সূচনা ঘটে, তার সঙ্গে জনতুষ্টিবাদী ধারার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অথবা বিরোধী দলে থেকেছে, কিন্তু উভয় পক্ষই রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে জনতুষ্টিবাদী পথ বেছে নিয়েছে। ফলে রাজনীতির এই ধারা শাসন ব্যবস্থাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোনো বিষয়েই নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব থাকছে না।

পপুলিজমের আভিধানিক অর্থ হলো সাধারণ জনগণের স্বার্থকে সমর্থন করা। পপুলিজম, পপুলিস্ট রাজনীতি বা রাজনীতিক ও এর কৌশল–এসবের কিছু সাধারণ দিক ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাধারণভাবে পপুলিজম জনগণের আবেগ, বঞ্চনা বা হতাশাকে কাজে লাগায়। এসব বিবেচনায় নিয়ে তারা জনগণকে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখায়।[১৪] বাস্তবায়ন করা যাবে কি যাবে না, সেসব বিচার-বিবেচনা না করেই তারা ঢালাওভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়, কৌশল হিসেবে প্রতিপক্ষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ায়।[১৫] তারা যা বলে, তার পক্ষে তথ্য-প্রমাণ হাজির করার কোনো ব্যাপার থাকে না। কিছু শত্রুকে তারা নির্দিষ্ট করে দেয় এবং দেশ বা জনগণের সব সমস্যা, ক্ষতি বা বিপদের জন্য তাদেরই দায়ী করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এজন্য নির্দিষ্ট কোনো বিদেশি শাসক বা শক্তিকে এবং তাদের দেশীয় অনুচরদের দেশটির সব অঘটনের জন্য দায়ী করা হয়। তারা ধর্মকে ব্যবহার করে, জাতীয়তাবাদকে উসকে

[১৪] Paul Taggart, *Populism*, Open University Press, Buckinghum, 2000, p-12.
[১৫] Jan-Werner Muller, *What is Populism?* University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2016, p-42.

দেয়।[১৬] সাধারণভাবে ডানপন্থী ও জাতীয়তাবাদী ধারাকে পপুলিজমের সাথে যুক্ত করা হলেও এর বামপন্থী ধারাও রয়েছে।[১৭] বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এই জনতুষ্টিবাদী ধারাকে গণতন্ত্রের পেছন যাত্রা ও কর্তৃত্ববাদী শাসনের জোয়ার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এসব নীতির ওপর ভর করে যখন কোনো দেশে জনতুষ্টিবাদী শাসন কার্যকর হয়, তখন সেই শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম জরুরী কাজ হয়ে দাঁড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রভাব সীমিত করা। জনতুষ্টিবাদীরা শাসনক্ষমতার সব স্বাধীন ভিত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। তাদের শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে যেসব প্রতিষ্ঠান যেমন- আদালত, গণমাধ্যম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও ইত্যাদি সেগুলোর ওপর খড়্গ নেমে আসে।

জনতুষ্টিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে দেশের কোনো জটিল ইস্যুর সহজ সমাধানের পথ ধরা, সমস্যার গভীরতা বা ফলাফল শেষ পর্যন্ত কী হতে পারে, তা বিবেচনায় না নেওয়া। তারা রাজনৈতিক মিত্র হিসেবে ডান ও বাম দুই ধারার লোককেই নিজের সাথে যুক্ত করে বা নিজেদের পক্ষে নিয়ে এসে এক ধরনের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করে। ডান-বাম সব রাজনৈতিক ফসলই তারা ঘরে তুলতে চায়। এই শাসন জনগণকে দুই ভাগে ভাগ করে নিজেদের বাইরের অংশকে কার্যত সবকিছু থেকে বাদ দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত জনতুষ্টিবাদী সরকার যে রাজনৈতিক আদর্শ ধারণ করে, তা মূলত নির্বাচিত সরকারের কর্তৃত্ববাদ বা একক শাসন।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সামরিক শাসকগণ রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য যে কৌশল নেন, তার সঙ্গে রাজনীতির জনতুষ্টিবাদী ধারার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[১৮] অস্থির ও সহিংস রাজনীতির বিস্তার, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, রাজনীতির মেরুকরণ, সমসাময়িককালের আন্তর্জাতিক রাজনীতির সরাসরি প্রভাব–এসব বিষয়কে ও এগুলোর প্রতিক্রিয়াগুলোকে তারা বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগান। কোথাও কোথাও রাজনীতিতে ধর্মকে নিয়ে আসা, বিশেষ কোনো দেশের বিরোধিতার রাজনীতি শুরু করা, সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতায় থেকে দল গঠন করা, বিশেষ কোনো ধর্মপন্থী, স্বাধীনতাবিরোধী এবং চরম ডান ও বামপন্থীদের দলে শরীক করার কাজও তারা সাফল্যের সাথেই এগিয়ে নেন। মানুষকে অবাস্তব ও অসম্ভব উন্নয়নের স্বপ্ন দেখানোর কাজ তারা ক্রমাগত চালিয়েইে যান। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করার কাজ অত্যন্ত সাফল্যের সাথেই তারা সম্পন্ন করেন।

---

[১৬] *Ibid*, p-49.
[১৭] *Ibid*, p-2.
[১৮] Michael Kazin, *The Populist Persuation: An American History*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1995, p-195.

পরবর্তীকালে কোনো দেশ এরূপ সরকারকে হটাতে সমর্থ হলেও রাজনীতির এই জনতুষ্টিবাদী ধাঁচ থেকে তারা আর বেরোতে পারে না।

রাজনীতির এই জনতুষ্টিবাদী ধারার আরও জোরালো একটি রূপ হচ্ছে জনতাতন্ত্র। রাজনীতির এই ধারা একপর্যায়ে নির্বাচিত দলের একক শাসনে পরিণত হয় এবং নিজেদের বাইরের জনগোষ্ঠীকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কৌশল নেয়। পৃথিবীর রাজনীতি সেদিকেই এগুচ্ছে বলে রাজনৈতিক বোদ্ধারা শংকা প্রকাশ করে চলেছেন। বিশ্বব্যাপী আমরা দেখছি, এখন কেউ সরকারের কোনো কাজ বা উদ্যোগের সমালোচনা করলে তারা উন্নয়নবিরোধী বলে আখ্যায়িত হয়। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে আসছে, ক্ষমতার স্বাধীন ভিত্তিগুলো দুর্বল হয়ে আসছে, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও এনজিওগুলো শক্তি হারাচ্ছে, নির্বাচনব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জটিল সমস্যাগুলোর সহজ সমাধানের পথ ধরা হচ্ছে। এর সামাজিক ও রাজনৈতিক দিককে কার্যত বিবেচনার বাইরেই রাখা হচ্ছে। জনতুষ্টিবাদী ধারার শাসন অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের নিশ্চয়তা দেয় না। সবচেয়ে বিপদের কথা হলো, প্রতিটি দেশেই যারা সরকারে বা যারা বিরোধী দলে থাকে, দুই পক্ষের কৌশলের সঙ্গেই জনতুষ্টিবাদী রাজনৈতিক ধারার মিল রয়েছে। পপুলিজম নিজেদের সমর্থকদের বাইরের জনগণকে কার্যত 'জনগণের' খাতা থেকে বাদ দেয়।[১৯] ফলে কোনোকিছুই যে রাজনীতির এই ধারা থেকে বিশ্ববাসীকে মুক্তি দেবে, সে আশাও করা যাচ্ছে না।

৫. জনতুষ্টিবাদী শাসনের বিস্তার

জনতুষ্টিবাদ সাধারণত নিয়ন্ত্রণকামী, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা বিরোধী। জনতুষ্টিবাদীরা মনে করেন, উদার গণতন্ত্র থেকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। গণমাধ্যমের সংখ্যা বেড়ে গেলে তথ্যবিভ্রাট ঘটে। একইভাবে বিচার বিভাগ স্বাধীন হলে আইনি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, আর জনপ্রশাসন স্বাধীন থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। জনতুষ্টিবাদীরা বিশ্বাস করেন, এ ধরনের বিশৃংখলা আপনাআপনি সৃষ্টি হয় না। দুরাচারী বিদেশী শাসক ও তাদের দেশীয় অনুচরদের কারণে এমনটা হয়। কোনো একটা দেশকে মহান বানাতে সে জাতির নেতাদেরকে অবশ্যই দেশের উন্নয়ন পরিপন্থীদের পরাজিত করতে হবে, যারা ক্ষমতার সমপ্রতিযোগী নয়। জনতুষ্টিবাদী নেতারা তাই প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতা সীমিত করতে বাধ্য হন। বস্তুত, তাদের রাজনৈতিক আদর্শ কিন্তু শৃঙ্খলা নয়, বরং ক্ষমতার সব স্বাধীন

[১৯] Jan-Werner Muller, *What is Populism?* University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2016, p-3.

ভিত্তিকে পদানত করা, যারা তাদের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। যেমন, আদালত, গণমাধ্যম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও ইত্যাদি।

নির্বাচনে কীভাবে জিততে হয় তা জনতুষ্টিবাদীরা ভালভাবেই জানেন। তারা বিশ্বাস করেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার, সরকারের ক্ষমতার ভাগাভাগি ও স্বাধীন গণমাধ্যমে। এসবই সংখ্যাগুরুদের শাসনের জন্য হুমকি, সে কারণে গণতন্ত্রের জন্যও। জনতুষ্টিবাদী সরকার যে রাজনৈতিক আদর্শ ধারণ করে, তা মূলত নির্বাচিত সরকারের একনায়কত্ব। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা আমাদের ইঙ্গিত দেয়, এটা টেকসই মডেল হতে পারে। সর্বোপরি, যারা ক্ষমতায় আছেন, তারা কীভাবে নির্বাচন আয়োজন করবে, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে, যার মধ্যে আছে নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাস, প্রচারণার অর্থায়ন ও রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত নিয়মকানুন পরিবর্তন। মোদ্দাকথা হলো, এখানে নির্বাচনব্যবস্থাকে জাল করে ফেলা যায়।

পপুলিস্টরা একই সঙ্গে প্রভূত্বকামী ও অশোভন। এর সমর্থকেরা সস্তা আচরণকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। পৃথিবীর কোথাওই জাতীয়তাবাদের মৃত্যু হয়নি। আদর্শবাদ উত্তর যুগে একমাত্র যে আদর্শটি টিকে আছে তা হলো, জাতীয়তাবাদ। এই আবেগকে উসকে দিয়ে জনতুষ্টিবাদীরা সর্বত্রই সমর্থন পেয়েছে, তা সেখানকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাই হোক না কেন। বাহ্যিক কারণে এই আবেগ ক্রমাগত সঞ্চারিত হচ্ছে।

৬. সাম্প্রতিককালে জনতুষ্টিবাদের বিস্তার

সাম্প্রতিক সময়ে সমাজ ও রাজনীতিতে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে জনতুষ্টিবাদ। জনতুষ্টিবাদী রাজনৈতিক নেতারা দাবি করেন যে তারা যা কিছু বলেন, সবই জনগণের স্বার্থে বলেন, তারা ইউরোপ ও এশিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় অর্জন করেছেন। ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আমেরিকায়ও তাদের জয় হয়েছে। ফ্রান্সসহ বেশকিছু দেশে সে ধরনের সম্ভাবনার কথাই শোনা গেছে।

এই নতুন জনতুষ্টিবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো ছড়ানো-ছিটানো ও অনির্দিষ্ট। এর প্রতিশ্রুতিগুলো উচ্চারিত হয় পাইকারি হারে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনতুষ্টিবাদী নেতারা টাকাপয়সা বা সম্পদ ব্যয় করতে অনিচ্ছুক। তারা প্রায় একই সঙ্গে ডান ও বাম উভয়

রাজনীতির ফল ঘরে তুলতে চান। জনতুষ্টিবাদে রাজনৈতিক বিদ্যা-বুদ্ধির কোনো গুরুত্ব নেই। জনতুষ্টিবাদী নেতারা তথ্য-প্রমাণ হাজির করার কোনো ধার ধারেন না। তারা যেসব পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখান, সেগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করবেন, সে সম্পর্কে বিশদ প্রস্তাবও পেশ করেন না।

নতুন জনতুষ্টিবাদের নৈতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ন্যায়নিষ্ঠ 'জনগণ' 'এলিট' শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু কে যে কোন শিবিরের অন্তর্ভুক্ত তা পরিষ্কার নয়। কারণ, জনতুষ্টিবাদের ভাষা আবেগসঞ্চারি এবং অনির্দিষ্ট। 'জনগণ' বোঝাতে সাধারণত যেসব আবেগি ভাষায় সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করা যায় তাতে, জনগণ হলো নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা।

বাম ও ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদীদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো তাদের পছন্দ বা বাছাইয়ের মধ্যে, অর্থাৎ কোন বিকল্পটিকে বাদ দেবে এবং কাকে আক্রমণ করবে। বামেরা লক্ষ্যবস্তু করবে বড় বড় করপোরেশন ও ধনকুবেরদের, আর ডানেরা লক্ষ্যবস্তু করবে জাতিগোষ্ঠীগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে। একবার শত্রুরা চিহ্নিত হয়ে গেলে যখনই জনগণের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে, তখনই ঐ শত্রুদের দোষ দেয়া যাবে। পপুলিজমীদের আবেদনের প্রধান উপাদান হলো তীব্র জাতীয়তাবাদ এবং সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার নিয়ে কথাবার্তা। আরেকটি উপাদান হলো ইতিহাস বা আরও সঠিকভাবে বললে, অতীতের যেসব বিষয় সুন্দর ও ভালো মনে হয়, সেগুলোর জন্য নস্টালজিয়া (আবেগপ্রবণ ও নিবেদিতপ্রাণ, আকাঙ্খা/স্মৃতিবেদনা)।

এটা নিশ্চিত যে পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্য অনেক ক্ষতিকর কাজ করা হয়েছে। বিশ্বায়ন ও অটোমেশনের ফলে উন্নত দেশগুলোতে চাকরি-বাকরি হারাচ্ছে অনেক মানুষ। বহুসংখ্যক দেশে সম্পদের বৃহত্তর অংশ ভোগ করছে শক্তিশালী করপোরেশনগুলো ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা, কিন্তু তারা কর দিচ্ছে কম। যুক্তরাষ্ট্রের রাস্ট বেল্ট, উত্তরপূর্ব ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে মানুষের জীবনযাত্রার মান অব্যাহতভাবে খারাপ হচ্ছে। কিন্তু জনতুষ্টিবাদী নেতারা এসব সমস্যা সমাধানের সুবিবেচিত পথ বাতলাচ্ছেন না, শুধু স্বপ্ন-কল্পনার প্রচার চালাচ্ছেন। ট্রাম্প যে মেক্সিকোর সীমান্ত বরাবর বিশাল ও সুন্দর প্রাচীর গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছেন, মুসলমান অভিবাসীদের নিষিদ্ধ করা, কয়লাখনিগুলো নতুন করে খুলে দেওয়া ও চীনের ওপর শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব দিয়েছেন, সেগুলো বাস্তবায়নযোগ্য নয়। ইতিমধ্যে এসব বিষয়ে তার নমনীয় মনোভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এসব কারণে বাণিজ্য যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। আর সেটা ঘটলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্থ তার সমর্থকদের অবস্থা আরও খারাপই হবে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো যখন ব্যর্থ হচ্ছে বলে মনে হয়, তখন জনতুষ্টিবাদের আবেদন বাড়ে। ফরাসি বিপ্লবের শুরুর পর্যায়ে জ্যাকোবিন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি আমেরিকায় 'নো-নাথিং', মুসোলিনির ইতালিতে ফ্যাসিস্ট ও হিটলারের জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থানের ব্যাপারগুলো এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। এই গোষ্ঠীগুলোর সবাই দাবি করত যে তারা নৈতিকভাবে বিশুদ্ধ এবং তারা 'জনগণের' নামে দূষিত পুরোনো ব্যবস্থা ঝেটিয়ে দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আজকের জনতুষ্টিবাদী রাজনীতি দাবি করে যে একমাত্র সেই সত্য, এ রাজনীতি গভীরভাবে অগণতান্ত্রিক। হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও তুরস্কে আমরা ইতোমধ্যে দেখতে পাচ্ছি, এসব দেখে জনতুষ্টিবাদীরা ক্ষমতা অর্জন করবে, তখন তারা রাষ্ট্রসহ যা কিছু হাতের কাছে পাবে, তা-ই ব্যবহার করবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করার লক্ষ্যে। এ ধরনের জনতুষ্টিবাদ থেকে আশু ভবিষ্যতে দেশে দেশে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে একটা গুরুতর ঝুঁকি সৃষ্টি হবে।

৭. বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ

একটা সময়ে বিশ্বায়নের কথা বেশ জোরেশোরে বলা হলেও সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর মনোভাব ও ভূমিকা বিশ্বায়নের ভবিষ্যতকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলছে, যুক্তরাষ্ট্রই সবদিক দিয়ে প্রথম। ওদিকে ব্রেক্সিটপন্থিরা দাবি করছে, ব্রিটেন প্রথম। মারি লো পেন ও তার ন্যাশনাল ফ্রন্ট বলছে, ফ্রান্সই সেরা। আবার, ভ্লাদিমির পুতিনের ক্রেমলিন দাবি করছে, রাশিয়াই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ আজ যেভাবে জাতীয় সার্বভৌমত্বের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, তাতে মনে হয় বিশ্বায়নের দিন শেষ। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আজকের সংগ্রামটা বিশ্বায়নের সঙ্গে বিশ্বায়ন-বিরোধিতার নয়, বরং আমাদের পৃথিবী একীভূত হওয়ার দুটো মডেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একটি হচ্ছে বহুপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিকতাবাদী, আরেকটি দ্বিপক্ষীয় ও সাম্রাজ্যবাদী। আজকের যুগে আমাদের পৃথিবী এই দুটি অবস্থানের মধ্যে পেন্ডুলামের মতো ঝুলছে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদীরাই অগ্রগণ্য অবস্থানে। তারা সহযোগিতা ও বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তি, নিরাপত্তা, আর্থিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই পরিবেশের মতো বৈশ্বিক সেবা সবার দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের মডেলটা এ রকম: জাতিরাষ্ট্রগুলোকে এক সূত্রে বেঁধে অভিন্ন মানদন্ড, রীতি ও চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালনা করা।

উনিশ শতকের বেশিরভাগ সময়েই অন্তর্ভুক্তি ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সমন্বয়। এ সময়ে মুক্ত বাণিজ্যের ধারণা নতুন বাইবেল হয়ে যায়। গণ-অভিবাসনকে স্বাগত জানানো হয় এবং দেশগুলো নতুন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড গ্রহণ করে। যেমন, প্রথম জেনেভা কনভেনশন[২০]। ১৮৬৪ সালে সম্পাদিত এই কনভেনশন অনুসারে যুদ্ধক্ষেত্রের অসুস্থ ও আহত মানুষদের চিকিৎসা দিতে হবে। বিশ্বায়নবাদীরা আবার নিপীড়কও হতে পারে। যেমন, ১৮৪২ সালে ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত নানকিং চুক্তি অনুসারে মিডল কিংডম পশ্চিমের করতলগত হয়। একইভাবে দ্বিপক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদীদের কদর্য রূপটি আরও একবার বেরিয়ে আসে তখন, যখন ইউরোপীয়রা আফ্রিকাকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিজেদের সম্পদে পরিণত করে নেয়।

তবে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াল সময়ে দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থা প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ১৯১৪ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে বড় বড় দেশ জাতীয় মহিমা খুঁজতে গিয়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও ব্যাপক সহিংসতার জন্ম দেয়। ১৯২৯ সালে ওয়াল স্ট্রিটের পতন হলে অনেক দেশই মুমূর্ষু আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। দেশের পর দেশ সে সময় নিজেদের গুটিয়ে নেয়। ফলে দেখা গেল যে, এক দশকের মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমে যায়। শক্তিশালী দেশগুলো প্রতিবেশিদের ওপর অসম বাণিজ্য চুক্তি চাপিয়ে দেয় অথবা তাদের স্রেফ পাশ কাটিয়ে যায়। জাপান মাঞ্চুরিয়াকে পুতুলরাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যে ১৯৩৭ সালে চীন দখল করে, যদিও মাঞ্চুরিয়ার ওপর তার নজর ছিল সেই ১৯৩১ সাল থেকেই। রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশগুলোর সাথেও সোভিয়েত ইউনিয়নের আচরণ একই রকম ছিল। নাৎসিরা দুর্বল প্রতিবেশিদের ওপর চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছে, অন্যদের দখল করে নিয়েছে। এরপর টিউটনিক বসতি স্থাপনকারীদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য স্লাভদের ভূমি থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে।

এই দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থার নৃশংশতার কারণে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল ১৯৪১ সালে আটলান্টিক সনদ[২১] স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে এতে ঘোষণা করা হয়, শান্তির ভিত্তি হচ্ছে স্বাধীনতা। তাই

---

[২০] প্রথম জেনেভো কনভেনশন হলো একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যার লক্ষ্য ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের সার্বিক অবস্থার উন্নতি সাধন। যুদ্ধ উপদ্রুত ও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাথে জনহিতকর আচরণের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের একটি মানদন্ড নির্ধারণ করেছিল প্রথম জেনেভা কনভেনশন। যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাতের সময় সেইসব রাষ্ট্রের জন্যই এ আইন প্রযোজ্য হবে যারা এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। এই আইন কোনো দেশের সংবিধান বা তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথে পুরোপুরি সুসংগত নাও হতে পারে। আন্তর্জাতিক সংঘাতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই আইনের প্রয়োগ হবে, তবে যুদ্ধরত দেশ বা জাতিগুলোর মধ্যে অন্তত একটিকে এমন হতে হবে যে সে দেশ এ কনভেনশনের অনুমতি দিয়েছে।

[২১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় আটলান্টিক সনদ।

দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থা সংকুচিত করতে হবে। আর কোনো ভূমি দখল নয়, নতুন করে জোরপূর্বক শুল্ক আরোপ নয়; অন্যদিকে সমুদ্র হবে স্বাধীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় ও আটলান্টিক সনদ থেকে উদ্ভব হলো এক নতুন বৈশ্বিক চুক্তির। অর্থাৎ তখন থেকে আন্তর্জাতিক নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানকে মেনে চলে সব দেশই বৈশ্বিক খেলায় অংশ নিতে পারবে। এই বহুপক্ষীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্রে ছিল বহুপক্ষীয় বিশ্ববাদ।[২২] ফ্রান্স-জার্মানি পুনঃসমঝোতার মধ্য দিয়ে ইউরোপের মতো দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-বিবাদে জর্জরিত অঞ্চল সহযোগিতার অসাধারণ নজিরে পরিণত হয়। অর্থাৎ, জাতীয় সার্বভৌমত্ব সংকুচিত করার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সমৃদ্ধির চাকা অনেক দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করল। কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে এল। আপেক্ষিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, নতুন বৈশ্বিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। বহু মানুষের জন্যই এই পৃথিবী ঝুঁকিপূর্ণ ও হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠছে। অথচ আটলান্টিক সনদে এই চিন্তা করা হয়নি। ব্যাপারটা যা হয়েছে তা হলো, ১৯৮০ এর দশক থেকে সারা পৃথিবীর একীভূতকরণের সাথে সাথে বৈষম্যও বেড়েছে। বড় শহরে শিক্ষিত বিশ্বজনীনদের দিগন্ত আরও প্রসারিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জাতিসমূহের সামাজিক চুক্তির বন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়ায় নাগরিকদের মধ্যেকার বন্ধনও দুর্বল হয়েছে। ফলে বৈশ্বিক বিভাজন দূর হওয়ার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বিভাজন বেড়েছে। এই সুযোগে দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থার সমর্থকরা আবারও মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোতে অন্যদের তুলনায় তাদের অনেক বেশি কোম্পানি আছে। এখন সব আলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর। ব্রেক্সিটের পর ফ্রান্সের পরিস্থিতিও এতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। ফ্রান্সেও যদি ব্রিটেনের ন্যায় পরিণতি ঘটে তাহলে, ফ্রান্স-জার্মানি ঐক্যও হুমকির মুখে পড়বে। অথচ এই ঐক্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের বহুপক্ষীয় ব্যবস্থার ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করেছে। ব্রিটেনের ন্যায়, ফ্রান্স এবং আরও কিছু দেশ যদি বৈশ্বিক অঙ্গীকারের জায়গা থেকে সরে আসে, তাহলে বিশ্বায়নের মৃত্যুঘন্টা বাজার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

[২২] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে নতুন বৈশ্বিক চুক্তির উদ্ভব হয়েছিল তার অন্তরালেও কাজ করত বিশ্বের অঞ্চলভিত্তিক বা অর্থনীতিকেন্দ্রীক সংগঠনসমূহ ও তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ। বিভিন্ন সময়ে জাতিসংঘে আনীত বিভিন্ন প্রস্তাবে ভেটো প্রদানে কাজ করেছে এসব সংগঠন বা চুক্তিসমূহ। কাজেই সার্বজনীন বৈশ্বিক চুক্তি হিসেবে জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কখনো এসব আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আজ্ঞার বাইরে তেমন একটা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে নি।

৮. ফ্যাসিবাদের আগাম বিপদসংকেত

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটনের হলোকাস্ট মিউজিয়ামের 'আর্লি ওয়ার্নিং সাইন অব ফ্যাসিজম' শীর্ষক একটি পোস্টার বিশেষভাবে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। সারাহ রোজ নামক এক মার্কিন নারী কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে পোস্টারটির ছবি পোস্ট করার মাধ্যমে বিষয়টি সবার নজরে এসেছে। কোনো দেশে ফ্যাসিবাদ চেপে বসার আগে যে পরিস্থিতিগুলো বিরাজ করে সে ধরনের ১৪ টি পরিবেশ ও পরিস্থিতির কথা সেখানে বলা হয়েছে।[২৩] পোস্টারটিতে উল্লেখ করা ফ্যাসিবাদের ১৪ টি লক্ষণ ধারাবাহিকভাবে হচ্ছে: ১. শক্তিশালী ও ধারাবাহিক জাতীয়তাবাদ, ২. মানবাধিকারের প্রতি ঘৃণা, ৩. নিজেদের একতার জন্য শত্রু চিহ্নিত করা, ৪. সামরিক বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব, ৫. লিঙ্গবৈষম্য বৃদ্ধি, ৬. নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম, ৭. জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে ঘোরগ্রস্ততা, ৮. সরকার ও ধর্ম মিলেমিশে যাওয়া, ৯. করপোরেট শক্তির জন্য নিশ্চিত সুরক্ষা, ১০. শ্রমজীবী শক্তির প্রতি দমনমূলক অবস্থান, ১১. বুদ্ধিজীবী ও শিল্প সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা, ১২. অপরাধ ও শাস্তি নিয়ে আচ্ছন্নতা, ১৩. অবাধ দলবাজি ও দুর্নীতি এবং ১৪. প্রতারণামূলক নির্বাচন।

সারাহ রোজের পোস্ট করা এই টুইট খুব দ্রুতই ভাইরাল হয়েছে। লাখ লাখ লোক তা শেয়ার করেছেন। ফ্যাসিবাদের আগাম লক্ষণগুলোর সাথে যখন কোনো দেশের বর্তমান পরিস্থিতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তখন শুধু সে দেশের নাগরিকেরা কেন, সমগ্র দুনিয়ার মানুষই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এ লক্ষণগুলোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম এবং প্রতারণামূলক নির্বাচন এ দুটি অবশ্য উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহে দেখা যায় না। কিন্তু বাকি বিষয়গুলো প্রায় সব দেশেই বেশ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। ফ্যাসিবাদের যে দুটি লক্ষণ উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহে এখনও দেখা যায়নি, সেটাই আসলে সবচেয়ে বড় ভরসা। সম্ভাব্য কোনো ফ্যাসিবাদ ঠেকানোর জন্য এই দুটিই আসলে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। গণমাধ্যম বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আঘাত পড়েনি বলেই অনেক দেশের নাগরিকেরা এখনও সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলতে পারে বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় নিজেদের কথা ব্যক্ত করতে পারে। দুনিয়ায় এখন এমন অসংখ্য দেশ পাওয়া যাবে, যেখানে এই ১৪ টি লক্ষণই মিলে যাবে, যেখানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত আর নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতারণামূলক। এসব দেশের ভবিষ্যৎ কী? ফ্যাসিবাদ রুখতে যেখানে জনগণের সংগঠিত হওয়ার আপাত কোনো সুযোগ নেই বা ভোটের মাধ্যমে জবাব দেওয়ারও আশা-ভরসা নেই, সেসব দেশ ফ্যাসিবাদ জেঁকে বসার ঝুঁকির মধ্যে আছে।

---

[২৩] ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে সারাহ রোজ যে পোস্টারটি সর্বসাধারণের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হলোকাস্ট স্মৃতি জাদুঘরের সামনে রেখেছিলেন তা মুহূর্তের মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।

দেশে দেশে জাতীয়তাবাদ ও জনতুষ্টিবাদের উত্থানের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদের পূর্বলক্ষণগুলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বের অনেক দেশেই জনতুষ্টিবাদী শাসন কায়েম হয়েছে এবং অনেক দেশেই হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। ফ্যাসিবাদের আগাম লক্ষণগুলো যদি সত্যিই ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার ইঙ্গিত দেয়, তার অর্থ দাঁড়ায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু ইতিহাসের কি হুবহু পুনরাবৃত্তি সম্ভব? এ নিয়ে কার্ল মার্কসের বহুল আলোচিত মন্তব্যটি আমরা স্মরণ করতে পারি: ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়, প্রথমে যা ট্রাজেডি, পরে তা আসে পরিহাস হিসেবে।[২৪] ফলে আমরা সামনে যার মধ্যে ঢুকে যাওয়ার ভয় করছি, কার্ল মার্কসের মন্তব্যকে বিবেচনায় নিলে, সেটা আসলে পুরোনো ফ্যাসিবাদ নয়, এর বিকৃতি বা পরিহাস। আমরা আসলে এক বিকৃত ফ্যাসিবাদের ঝুঁকির মুখে আছি। জর্জ বার্নার্ড শ বলেছিলেন, যদি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এবং সব সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে অভিজ্ঞতা থেকে শেখার ক্ষেত্রে মানুষ কতটা অসমর্থ।[২৫] অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্ববাসী কতটা শিখছে, তা বোঝার জন্য আমাদেরকে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

৯. বিশ্ব মানবতার বিপর্যয়

জাতিসংঘসহ বিশ্বব্যাপী বড় বড় অনেক দেশ এবং বহু নেতার মধ্যে সর্বজনীন মানবিকতার আবেদনের চেয়ে জাতিগত ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা দিন দিন প্রবলতর হচ্ছে। মানবতা, নীতি-নৈতিকতা ও বিচারবোধ তিরোহিত হতে চলেছে। ইসরায়েলের বর্ণবাদী আচরণের প্রতিবেদন জাতিসংঘ প্রকাশ করে না। রোহিঙ্গা গণহত্যা বিষয়ক জাতিসংঘের একটি বিবৃতি চীন ও রাশিয়া যৌথভাবে আটকে দিল। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রকাশ্যে মুসলিম ও ইসলামবিরোধী রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার, অপরদিকে সৌদি যুবরাজ সালমান কর্তৃক ট্রাম্পের মুসলিমবান্ধব নীতির প্রশংসা। অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলমানের দোহাই দিয়ে মুসলিম শাসক বা তথাকথিত ইসলামের রক্ষকদের হাতেই প্রতিদিন নিরীহ মুসলিম নারী-শিশু-আবালবৃদ্ধবনিতা গৃহহীনতা ও খুন-জখমের শিকার। এটি বিশ্ব মানবতার চরম বিপর্যয় ও এক অন্ধকার যুগের সূচনা।

---

[২৪] Joshua Crowther, 'History Repeats Itself in the Chaos of the War on Terror', *What Difference Does Writing Make?: Leading Writers on Writing*, Published in 2007, Canberra Grammer School, Red Hil, Australian Capital Territory, P-65. আরও দেখুন, Quotes About Karl Marx in Brainy Quotes (BrainyQuote.com).

[২৫] *Ibid*, p-66.

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বর্তমান ২০১৭ সালের ১৭ মার্চ মিয়ানমার সরকারের নিন্দা এবং রাখাইন রাজ্যে ত্রাণ ও মানবিক সাহায্যের আবেদন সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করে।[২৬] এটি মূলত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি মাত্র। এখানে চীন ও রাশিয়া এক হয়ে বাধা দিয়ে এ বিবৃতি বন্ধ করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক তদন্তকারী দল মিয়ানমারের এ আচরণকে গণহত্যা ও জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছে। অন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে জাতিসংঘ পশ্চিম এশীয় কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে প্যালেস্টাইনিদের প্রতি ইসরায়েল রাষ্ট্রের আচরণকে বর্ণবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইসরায়েল এ প্রতিবেদনকে 'নাৎসি প্রচারণা' অভিহিত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসলায়েলের চাপে জাতিসংঘ মহাসচিব এই প্রতিবেদন ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। অবশ্য প্রতিবেদনের পক্ষে অবস্থান নিয়ে ওই কমিশনের প্রধান জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল রিমা খালাফ পদত্যাগ করেছেন। অন্যায্য পৃথিবীর অন্যায্যতার পরাকাষ্ঠা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে সৌদি যুবরাজের মন্তব্য 'তিনি মুসলমানদের বন্ধু',[২৭] একটি মুসলিম রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের কান্ডজ্ঞান ও নৈতিক দেউলিয়াপনারই প্রকাশ।

ইতোমধ্যে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী হয়েছে পৃথিবীর মানুষ। তারা পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহ পরিণতিও দেখেছে এবং এখনও উপলব্ধি করছে। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের নানান দেশের মধ্যে নানান ধরনের দ্বিপাক্ষিক ও সমন্বিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও সাম্প্রতিককালের নানা পারিপার্শ্বিক আলামত দেখে মনে হচ্ছে, পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশগুলো হয়তো এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের তরিকা বদলাতে যাচ্ছে। পারমাণবিক মহাশক্তিধর দেশগুলো নিজেদের সুরক্ষার নামে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্র মজুদের অজুহাতে ইরাকে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে সে ইতিহাস সবারই জানা আছে। কোরীয় উপদ্বীপেও সে ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টির আভাস বারবারই পাওয়া গেছে। কিন্তু উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়ে আবহ অনেকটা পাল্টে ফেলেছে। সবাই বুঝে গেছে, আক্রান্ত হলে তারা কী করতে পারে।

আবার, দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্রের ভারসাম্য এমনিতেই দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। যেহেতু ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক বহুদিন ধরেই গরম, সেহেতু এখানে যেকোনো সময়ে বড় ধরনের যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। আর যুদ্ধ বেধে গেলে তারা প্রতিপক্ষের অস্ত্রভান্ডারে নিবৃত্তিমূলক পারমাণবিক

[২৬] সূত্র: দৈনিক *প্রথম আলো*, ০২ এপ্রিল, ২০১৭।
[২৭] *প্রাগুক্ত*।

হামলা চালাতে পারে। যুদ্ধ না হলেও এই অঞ্চলে তাদের মনোভাবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুভূত হবে। এই পরিস্থিতিতে তারা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি জোরদার করার কথা ভাবতে পারে। এর পরিণতিতে যা ঘটবে তা অস্ত্র প্রতিযোগিতার চেয়েও বেশি কিছু। দেশ দুটির উচ্চ পর্যায়ে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। ওদিকে রাশিয়া আবার নতুন করে তার শক্তির জানান দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ে পুতিন সরকার মাথা ঘামাচ্ছে। এ বিষয়গুলো সারা পৃথিবীর জন্যই উদ্বেগজনক। পারমাণবিক শক্তিধর যেকোনো দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে পরিবেশ কালো ও গরম ধোঁয়ায় ভরে যাবে। সারা পৃথিবীতে এমনিতেই শষ্যের উৎপাদন কমছে। কাজেই যুদ্ধ হলে যে দুর্ভিক্ষ শুরু হবে, তাতে শত কোটি মানুষ মারা পড়বে, চরম মানবিক বিপর্যয় ঘটবে।

১০. সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থা

ব্যক্তি নিজে ন্যায়পরায়ন হোক আর না-ই হোক, সে চায় তার প্রতি সবসময় ন্যায় হোক, অর্থাৎ সে চায় একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের অংশ হতে। সে চায় এমন একটি সমাজ যেখানে মানবিক বোধ ও নৈতিক বোধ ক্রিয়াশীল থাকবে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এদের যে ব্যর্থতা ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে, তাতে সহজেই ধরে নেয়া যেতে পারে যে এগুলো হয়তো আর কখনই তার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হতে পারবে না এবং আমাদেরকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ উপহার দিতে পারবে না। সামজিক বৈষম্য ও অসমতাই সামাজিক সংকটের মূল কারণ। মানুষ চায় স্বাধীনতা, মানবিকতা ও মানবিক মুক্তির নৈতিকতার ধারণা নিয়ে এগিয়ে যেতে। আর এজন্যই মনে হয় একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শই হলো যথার্থ আদর্শ যার ভিত্তিতে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যেখানে ব্যক্তির মানবিক স্বাধীনতা থাকবে। কাজেই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজই হয়তো হবে বিশ্ববাসীর ভবিষ্যৎ। কিন্তু উদারনৈতিক গণতন্ত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির রাজনৈতিক রূপ। তাই সংকট থেকেই যাবে। এ সংকট থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে কাংখিত ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাবে গণতন্ত্রকে বরাবরই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে দেখা যাচ্ছে। এজন্য গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূরণ করার মাধ্যমে আমরা পেতে পারি একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

১১. যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য রূপরেখা

গণতন্ত্র কোনো একটি দেশের জন্য আদর্শ ব্যবস্থা কিনা তা নিয়ে বিশ্বব্যাপী আজও বিতর্কের অবসান হয়নি। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সরকারের যে অঙ্গীকার থাকে, তার কতটুকু বাস্তবায়িত হয়, তা দেখার পাশাপাশি সংবিধানে মানুষের জন্য যে মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়, তা দেখা দরকার। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির যুগে গণতন্ত্রের ধারণা কীভাবে এগিয়ে যাবে, তা-ও বিবেচনায় আনা উচিত। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উন্নয়নের নামে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। নাগরিক অধিকার, বিশেষত বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর গণতন্ত্র যে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, সেদিকেও নজর দেয়া দরকার। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে কর্মপরিবেশের সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হলেও জন-নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকারের প্রশ্নে আরও সংস্কার প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এসব ক্ষেত্রে এখনও যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। মানুষ একটি গণতান্ত্রিক, উদারপন্থী ও সহনশীল পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে, যে পৃথিবী হবে রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার একটি সেতুবন্ধন। গণতান্ত্রিক দেশসমূহে রাজনৈতিক দলগুলো স্বাধীনভাবে বিকশিত হলে, সকলের মত প্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত হলে যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাজনীতিতে মতদ্বৈততা, বিরোধ ও দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ব্যাপকভাবে বিরাজমান এবং অনেক দেশে এ দ্বন্দ্ব সহিংসতায় রূপ নেয় (সাম্প্রতিককালে মায়ানমারে যেমনটা দেখা গেছে)। এমনকি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও রাজনৈতিক ঐক্য অনুপস্থিত। আবার বারবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি। তাদের আচার-আচরণ ও কর্মকান্ডে অনেক মিল রয়েছে, যার কারণে দলগুলোর মধ্যে আন্তদলীয় সহিংসতা বিরাজমান। শুধু এক দলের সঙ্গে অন্য দলের নয়, দ্বন্দ্ব-হানাহানি রয়েছে দলগুলোর নিজেদের মধ্যেও, বিশেষ করে যেসব দল ক্ষমতায় থাকে তাদের অভ্যন্তরে। আর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-হানাহানি এসব দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে। তাই রাজনৈতিক সহিংসতার অবসান ঘটানো প্রতিটি দেশের জন্য জরুরী। এসব সহিংসতার অবসান ঘটাতে হলে এর স্বরূপ, ধরন ও কারণ উদঘাটন করা আবশ্যক।

১২. গণতান্ত্রিক শাসনের বৈশিষ্ট্য

গণতান্ত্রিক শাসনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রথমত, গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হয় একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে। কোথাও একতরফা নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ, নির্বাচন মানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন, যেখানে ভোটারদের সামনে সত্যিকারের বিকল্প প্রার্থী থাকেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো এই যে, বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই বলতে গেলে আজ আর কার্যত সে ধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থা বিদ্যমান নেই। এসব দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের কতগুলো অধিকারের নিশ্চয়তা থাকে, যেগুলো তারা উপভোগ করতে পারে। প্রতিটি দেশের সংবিধানে নাগরিকদের জন্য কতগুলো মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। যেমন, বাক্-স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও গোপনীয়তার অধিকার ইত্যাদি। প্রায় প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে এই সব স্বাধীনতা ক্রমাগতভাবে সংকুচিত হচ্ছে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক শাসনে ক্ষমতার বিভাজন থাকে, বিরুদ্ধ মতের চর্চা থাকে। বস্তুত, বিরোধী দল ও প্রতিবাদী নাগরিক সমাজের অস্তিত্ব ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। বাংলাদেশসহ অনেক দেশের রাজনীতিতেই বর্তমানে কোনো কার্যকর বিরোধী দল নেই। তাছাড়া সরকারের নানামুখী দমনপীড়ন ও নিজেদের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এসব বিরোধী দল সবসময় থাকে অনেকটা ভঙ্গুর অবস্থায়। তা ছাড়া নানা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে প্রতিবাদী নাগরিক সমাজও থাকে অস্তিত্বের সংকটে।

চতুর্থত, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো দায়বদ্ধতা। দায়বদ্ধতা আবার দুই ধরনের, নির্বাচনী দায়বদ্ধতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেয়াদ শেষে ভোটারদের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে নির্বাচনী দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর কতগুলো ক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং বিশেষ করে কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান হতে পারে সাংবিধানিক, বিধিবদ্ধ বা রাষ্ট্রবহির্ভূত। বিভিন্ন দেশে এসব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আজ অত্যন্ত দুর্বল অবস্থানে এবং তারা রাজনৈতিক মতদ্বৈততা নিরসনে প্রয়েজনীয় ভূমিকা রাখতে পারছে না।

পঞ্চমত, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, বিশেষ করে যেখানে ওয়েস্টমিনস্টার[২৮] পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, সেখানে বিরোধী দলও সরকারের অংশ। কিন্তু বাংলাদেশসহ অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশে, একটি রাষ্ট্রের সবকিছুই জয়ীদের করায়ত্ব–এমন এক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। এ ধরনের ব্যবস্থা 'পার্টিয়ার্কি' বা দলীয় আনুগত্যের প্রতি সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রাধান্যের সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে শুধু বঞ্চিতই হন না, এমনকি দমনপীড়নের কারণে তারা চরম নিরাপত্তার ঝুঁকিতেও থাকেন। এমন পরিস্থিতিও দেশগুলোর বিরোধী দলসমূহের দুর্বল অবস্থানের অন্যতম কারণ।

দলের অভ্যন্তরে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-বিরোধও গণতান্ত্রিক দেশে ব্যাপক, দিন দিন যা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এর একটি কারণ হলো ক্ষমতাধরদের অনাকাঙ্খিত উপরি আয়ের বিকেন্দ্রীকরণ। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত বা তাদের অনুগতদের মধ্যে বৈধ-অবৈধ সুযোগ-সুবিধা বিতরণের চর্চা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এ ধরনের ব্যবস্থায় দলের পদ-পদবি কিংবা দলের মনোনয়নে নির্বাচিত পদ পাওয়ার এক অশুভ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় এবং সহিংসতার জন্ম দেয়, যা বর্তমানে বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছেছে।

প্রসঙ্গত, সুযোগ-সুবিধা প্রদানের এ সংস্কৃতি বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিতে ভয়াবহ নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি করেছে। গত কয়েক দশকে ব্যাপক সুবিধাপ্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশসহ অনেক দেশে বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি অঢেল অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছেন। তাদের অনেকেই এখন জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচিত পদ হয় দখল করে নিচ্ছেন কিংবা টাকার বিনিময়ে কিনে নিচ্ছেন। এভাবে এসব দেশে রাজনীতির ব্যবসায়ীকরণ বা ব্যবসায়ের রাজনৈতিকীকরণ হয়ে গেছে। এসব দেশের প্রায় সব নির্বাচিত পদ এখন ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে আজ রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হয় জনস্বার্থের পরিবর্তে বহুলাংশে ব্যবসায়িক স্বার্থে এবং তাদের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে।

১৩. শাসনব্যবস্থার সংস্কার

পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা গেছে, দেশটির সংসদ মেয়াদ পূর্ণ করলে সে দেশের লোকেরা যেমন অভিনন্দন জানায়, তেমনি কোনোভাবে আগত সেনা-সরকার মেয়াদ শেষে অবসর নিলে তাকেও অভিনন্দন জানায়। পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক দেশেই সেনাবাহিনী একাধিকবার সরাসরি সেনাশাসন

[২৮] ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতি হলো যুক্তরাজ্যের এক ধরনের পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা বা সরকারব্যবস্থা। এটি হলো ধারাবাহিক পদ্ধতিতে আইনসভা পরিচালনার কতগুলো কর্মপন্থা।

জারি করেছে, সেসব রাষ্ট্রের নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে বহুবার ষড়যন্ত্র করেছে, যাতে তার ক্ষমতা হ্রাস করে শাসনব্যবস্থার ওপর সামরিক বাহিনীর প্রভাব বজায় রাখা যায়। এ ছাড়া বেসামরিক সরকারকে বেকায়দায় ফেলে সেনাপ্রধানের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। অনেক দেশে আবার সেনাবাহিনীর স্বার্থ কেবল সরকারি নীতি ও দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থার মধ্যে সীমিত নেই। সম্ভবত, সেনাশাসকদের মধ্যে স্রেফ নেতৃত্বের পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে, মূলগত নয়। তাদের এই পদ্ধতি যুগে যুগে অপরিবর্তিত থাকে। ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন সেনা আমলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ছোটখাটো পরিবর্তন ছাড়া সামরিক বাহিনী প্রণীত জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতিতে বড় পরিবর্তন আসেনি।

পৃথিবীর অনেক দেশ অবশ্য তাদের সংবিধানে কিছু ধারাকে এমনভাবে শক্তিশালী করেছে যে, সামরিক বাহিনী এখন আর আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, সাংবিধানিকভাবে ব্যাপারটা আর আগের মতো সহজ-সরল নয়। পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্র ও সমাজ বিকশিত হয়েছে। এসব দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কারের জন্য দেশগুলোর রাজনৈতিক দলসমূহকে গণতন্ত্রের নতুন সনদ নিয়ে হাজির হতে হবে। এটা শুরু হতে হবে রাজনৈতিক দল ও শাসনব্যবস্থা দিয়ে, যাতে রাষ্ট্রের ভেতরের রাষ্ট্রটির রাশ টেনে ধরার জন্য যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করা যায়। এসব দেশের বিরাজমান কাঠামো অক্ষত থাকলে দেশগুলো যেমন আন্তর্জাতিকভাবে কোনঠাসা হয়ে পড়বে, তেমনি ভেতরে ভেতরে ধসে পড়বে।

১৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠা

কতগুলো প্রশ্নকে ঘিরেই বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সুশাসনের বিষয়টি ঘুরপাক খাচ্ছে। যেমন, এসব দেশে কেন দুর্নীতি দমন আইন ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা থাকার পরও দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে দেশগুলো? বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা কেন জনসেবা নিশ্চিত করতে পারছে না? সরকারি কার্যকলাপে কেন জনগণের মতের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? এসব প্রশ্নের সহজ ও একমাত্র উত্তর হলো, ক্ষমতা কাঠামোই এর কারণ। অনেক দেশেই আবার মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতাকে হরণ করে গণতন্ত্রের সীমানাকে ক্রমেই সংকুচিত করে আনা হচ্ছে। বৈষম্যমূলকভাবে গড়ে ওঠা ক্ষমতা কাঠামো নীতিনির্ধারণে নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে না। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণের মাধ্যমেই নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। এতে সুশাসনের বিষয়টি নিশ্চিত হবে। রাষ্ট্রীয় সেবা, অবকাঠামো ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান

তৈরি করতে সরকারকে সম্পদের সুষম ব্যবহারের পাশাপাশি জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেসরকারি খাত বিশেষ করে সুশীল সমাজকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

নতুন বৈশ্বিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও সুশাসনের বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুশাসন ও কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একইভাবে শান্তি আর নিরাপত্তাও উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর যেসব দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, সেখানেই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মানবাধিকারের সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক আরও বেশি স্পষ্ট। মানবাধিকার সুরক্ষাকারী ভিত্তি ছাড়া কোনো উন্নয়ন কাঠামোই যেমন টেকসই হতে পারে না, তেমনি জনগণের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও উন্নয়ন ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে না। আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের পাশাপাশি প্রতিটি দেশে জাতীয়ভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিকাঠামো তৈরি করা দরকার এবং এসবের কার্যকর প্রয়োগ অপরিহার্য। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জবাবদিহি বাড়ানো দরকার। জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন করতে হবে।

১৫. গণতন্ত্র ও প্রবৃদ্ধি

টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বর্তমান যুগে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সংখ্যাকে উন্নয়ন হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। মানুষ তার জীবনে প্রবৃদ্ধির সুফল কতটা পেল–সেটাই বিবেচনার বিষয়। প্রবৃদ্ধিনির্ভর অর্থনীতিতে নানা ধরনের সমস্যা হয়। সমাজের সব স্তরের মানুষ প্রবৃদ্ধির সুফল পায় না। প্রবৃদ্ধির সুবিধা সবাই যাতে পায়, তা নিশ্চিত করা দরকার। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, প্রবৃদ্ধি ও গণতন্ত্র একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে পারে। ভালো প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য গণতন্ত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সরকার পরিবর্তন হলেও যদি নিয়ম-নীতি না বদলায়, তাহলে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকারীরা আস্থা পান। আবার একনায়কতন্ত্র থাকলে নিয়মকানুনের কোনো তোয়াক্কা থাকে না। তখন বিনিয়োগকারীরা বেশ আস্থাসংকটে থাকেন, প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফিলিপাইনের মার্কোস এবং ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তোর আমলে সেখানে এমনই হয়েছিল। এই দুই স্বৈরশাসকের পতনের পর ওই দুই দেশ বেশ উন্নতি করেছে।

একুশ শতকে এসে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এবং সক্ষমতাও বাড়ছে। দারিদ্র্য বিমোচনে গণতান্ত্রিক দেশগুলো ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সূচকে অন্য সরকার পদ্ধতির তুলনায় গণতান্ত্রিক দেশগুলো ভালো করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে সঠিকভাবে প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিত করাসহ দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচিগুলোতে যেন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে, এমনকি সরকার পরিবর্তনেও যেন এসব কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। গণতান্ত্রিক দেশগুলোর উচিত হবে সামাজিক বৈষম্য কমানো এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বিনিয়োগ আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

পাকিস্তান ও মায়ানমারের মতো হাতে গোনা কয়েকটি দেশকে বাদ দিলে দেখা যায়, বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর গত কয়েক দশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। তবে সুশাসন ছাড়া এই প্রবৃদ্ধি বেশি দিন বজায় থাকবে না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে সুশাসন জরুরী। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থাকা না-থাকার চেয়ে গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে মনোযোগী হতে হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর দিকে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এক জায়গায় আটকে আছে। স্থানীয় পর্যায়কে গুরুত্ব না দিয়ে, কেন্দ্রীয় নির্দেশে পরিচালিত হওয়ার কারণে এমনটা ঘটছে। শ্রীলংকা ও নাইজেরিয়ার মতো এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি হলেও সেগুলো স্থিতিশীল হয়নি। সুশাসন ছাড়াই সেসব প্রবৃদ্ধি হয়েছে। গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে হতদরিদ্র এবং অতিদারিদ্র্যের হার কমানো দরকার। এ লক্ষ্য পূরণ করতে হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার দিকে নজর দিতে হবে।

১৬. রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতন্ত্রায়ণ

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশের রাজনীতি পরিবারকেন্দ্রিক। পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারায় এসব দেশের রাজনীতি পরিচালিত হয়। কাগজে-কলমে গণতান্ত্রিক হলেও এসব দেশে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। যেকোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা ও তার পরিবারবর্গের বাইরের কাউকে দলীয় প্রধান বা নেতা হিসেবে বিবেচনা করার সংস্কৃতি এখনও গড়ে উঠেনি। স্বাভাবিকভাবেই এসব দেশের নির্বাচনে যখন এই ধরনের রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচিত হয় তখন সেই পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী নেতাই সরকারপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন। হাতে গোনা দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা গেছে সরকারপ্রধান হিসেবে

নির্বাচিত নেতাকে একইসাথে দলীয়প্রধানের দায়িত্বও পালন করতে। এর প্রধান অসুবিধা হলো সরকারপ্রধান সবকিছুর উর্দ্ধে দলীয় স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করেন। দলীয় স্বার্থের বিষয় তাদের কাছে এত বেশি গুরুত্ব পায় যে ক্ষমতা হাতে পাওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তায় একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দলীয় স্বার্থের প্রাধান্যের লক্ষ্যে সরকারের ক্ষমতাকে তারা ব্যবহার করেন পার্টির স্বার্থে, এমনকি সরকারি শক্তিকে কাজে লাগান বিরোধীদের দমন-পীড়নের লক্ষ্যে, যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তাই গণতন্ত্রের স্বার্থে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দলীয়প্রধান ও সরকারপ্রধানের পদ একইসাথে কেউ অলংকৃত করতে না পারেন।

রাষ্ট্র হলো সমাজের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের সাথে কোনো জমিদারি, সামন্ত বা জোতদারের তালুকের বিরাট পার্থক্য। রাষ্ট্র জয়েন্ট স্টক কোম্পানিও নয়। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয় তার সংবিধান দ্বারা। অল্প কিছু মানুষ তাদের খুশিমতো রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করলে তাকে বলে ফ্যাসিবাদ। যেখানে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত, তা হলো গণতন্ত্র। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান অনুসারে সে রাষ্ট্রটি হবে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যেখানে সব ক্ষমতার মালিক জনগণ। যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জনগণই ত্যাগ স্বীকার করে, নির্যাতন সহ্য করে এবং প্রয়োজনবোধে রক্ত দেয়। তারপর তারা পায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি ও মালিকানা। কোনো কিছুর মালিকানা কারও থাকলে, তাকে ভালোভাবে গড়ে তোলার দায়িত্বও তার। যেকোনো দেশকে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব সে দেশের জনগণেরই, অন্য কারও নয়।

সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সরকার দেশে নাগরিকদের তাদের যার যার প্রতিভা অনুযায়ী দেশ গঠনের সুযোগ দিলে বা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দিলেই তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। প্রত্যেকেই যদি তার খেয়ালখুশিমতো দেশের জন্য কাজ করতে চায়, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেজন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা সরকারের। সরকার জনগণের আবেগ-অনুভূতিকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। তা বাস্তবায়নে কাজ করবে সবাই। আর্থ-সামাজিক মৌল রূপান্তরের প্রধান শক্তি জনগণ তাদের মিলিত প্রয়াস গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তুলতে পারে। প্রতিটি দায়িত্বশীল সরকারের কর্তব্য সব বিষয়ে ন্যায়নিষ্ঠ ও বিষয়নিষ্ঠভাবে ফয়সালা করা। কোনো দেশের সরকার যদি কিছু মানুষকে অনৈতিক সুবিধা দেয় বা দেয়ার মানসিকতা পোষণ করে তবে সে সরকারকে জনগণের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, অন্তত ইতিহাস সে সাক্ষ্যই বহন করে।

১৭. কর্তৃত্ববাদের অবসান

আন্তসংসদীয় ইউনিয়নের ১৩৬ তম সম্মেলনে[২৯] গুরুত্বপূর্ণ যেসব প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো: কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, বৈষম্য কমিয়ে আনা, নারীর ক্ষমতায়ন, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ ইত্যাদি। কিন্তু এসব প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দেশের নীতিনির্ধারকেরা কতটা মেনে চলবেন, তার ওপরই সম্মেলনের সাফল্য ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সাম্প্রতিককালে ধ্রুপদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যেভাবে অতিমাত্রায় কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে চলেছে, তাতে বৈশ্বিক গণতন্ত্র ও শান্তি মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে। আইপিইউ সম্মেলনে কোনো দেশের ওপর অন্য দেশের হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গিকার ছোট গণতান্ত্রিক দেশগুলোর জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে যে প্রশ্নটি গুরুত্ব পায় তা হলো এতে অনেক দেশেরই ভঙ্গুর গণতন্ত্র কতটা সবল হবে? গণতন্ত্র একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ও নিরন্তর অনুশীলনের বিষয়। একে নিছক আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে পরিপুষ্ট করা যায় না। বর্তমান বিশ্বে সামরিক শক্তি ছাড়াও নানা অস্ত্র বা মাধ্যম প্রয়োগ করে বড় রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে হস্তক্ষেপ করে থাকে। অধিকাংশ দেশের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক কাঠামো খুবই দুর্বল ও ভঙ্গুর। কাজেই বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র সুসংহত করতে হলে কর্তৃত্ববাদেরও অবসান জরুরী।

ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি তাঁর *দ্য প্রিন্স*[৩০] গ্রন্থে শাসকের জন্য কিছু পরামর্শ রেখেছিলেন। শাসক তার জনগণের কাছে বেশি চাইতে পারে, ভালোবাসা নাকি ভয়মিশ্রিত সমীহ। ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন, ভালবাসার চেয়ে ভয় বেশি নিরাপদ। ভালোবাসার মধ্যে যে দায় থাকে, স্বভাবসুলভ আপন সুবিধার খাতিরে মানুষ তা এড়ায়। কিন্তু ভয় শাস্তির আতঙ্ক জাগিয়ে জনগণকে ঠিক রাখবে। এই আতঙ্ক অব্যর্থ। আতঙ্কের শাসন বিপুল সমারোহে ফিরে আসছে দুনিয়ায়। ট্রাম্পের কথা বিবেচনা করা যায়, পুতিনের কথা ভাবা যায়, নেতানিয়াহু বা এরদোগানের কথাও চিন্তা করা যায়। তারা প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করতে চান, জনগণকে উত্তেজিত করে তোলেন জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে দারুণ জনপ্রিয়। তাদের উত্থানের ঘটনাকে এখন বলা হচ্ছে জনতুষ্টিবাদ বা পপুলিজম। পপুলিস্ট শাসন অতি কড়া হলে তাকে বলা যায় ফ্যাসিবাদ। তার আগে তা দেখা দেয় কর্তৃত্ববাদের চেহারায়। দেশে দেশে এখন কর্তৃত্ববাদের জয়ভেরী বাজছে। বিরাট নেতা আর খুদে জনগণ হলো পপুলিজমের লক্ষণ। কখনো তারা হন নির্বাচিত, কখনোবা নির্বাচন ছাড়াই তারা পেয়ে যান উচ্চ ক্ষমতার সিঁড়ি।

---

[২৯] ১এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি. তারিখ থেকে ৫ দিনব্যাপী আইপিইউ এর ১৩১ টি দেশের এক হাজারেরও অধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় আইপিইউ এর ১৩৬ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

[৩০] দেখুন Niccolo Machiavelli, *The Prince,* (Trans.) Ninian Hill Thomson, Minerva Publishing, New york, 1532.

যারা এ ধরনের কর্তৃত্ববাদের ভক্ত, সেই জনগণ নামক বিমূর্ত লোকসমষ্টি আসলে কারা? ব্রিটেনে ব্রেক্সিট হওয়ার আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোয় একটা জরিপ হয়েছিল। তাতে দেখা যায়, ব্রিটেনের প্রায় অর্ধেক ভোটারই কর্তৃত্ববাদের পক্ষে। এর গতিটা অসহিষ্ণুতা বাড়ার দিকে, কমার দিকে নয়। এই জরিপকে অকাট্য প্রমাণ করে ব্রেক্সিট হলো, ফ্রান্সের নির্বাচনে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের পক্ষেই গেছে সব জরিপের ফল। ভারতে ডানপন্থী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এখন ক্ষমতায়। ২০১৭ সালে মার্চ মাসের রাজ্যসভা নির্বাচনে তারাই ছিল এগিয়ে। নেহেরুর সময়কালে কংগ্রেস যত রাজ্য শাসন করত, বিজেপি এখন প্রায় সেখানেই। উত্তর প্রদেশে একজন সাম্প্রদায়িক ধর্মগুরু যোগী আদিত্যনাথ হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইসরায়েলে নেতানিয়াহুর মতো আগ্রাসী ব্যক্তি হুমকি দেন যে, মধ্যবর্তী নির্বাচন দিয়ে পুনরায় বিজয়ী হয়ে তিনি সব সমালোচনার জবাব দেবেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই জায়গাতেই এই ডানপন্থার প্রধান শত্রু হলো 'অন্যরা', যারা নাকি স্বধর্ম, স্বজাতি, স্ববর্ণের ও রঙের লোক নয়। ব্রেক্সিট হওয়ার একটা কারণ ছিল শরণার্থীভীতি, যারা প্রধানত আরব মুসলিম। ডোনাল্ড ট্রাম্পও মুসলিম অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের খেপিয়ে তুলেছেন। ফরাসি উগ্র জাতীয়তাবাদী লো পেনের জনপ্রিয়তার জ্বালানিও ওই মুসলিম শরণার্থীবিদ্বেষ। ভারতেও মোটামুটি তা-ই, সেখানেও শুরু হয়েছে মুসলিমবিদ্বেষী মাংস নিরোধ অভিযান। রাজ্যে রাজ্যে মুসলিমবিরোধী কর্মসূচী পালিত হচ্ছে। তারা সবাই খাঁটি জাতি বানাতে চান। সেই জাতি হবে বহিরাগতমুক্ত, মুসলিমমুক্ত। তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে কাজ দিচ্ছে আইএসের মতো মুসলিম সন্ত্রাসবাদ।

এসব জাতীয়তাবাদী নেতা বিশ্বায়ন মানেন না, তাদের মানবাধিকার কেবল নিজেদের লোকের জন্য প্রযোজ্য। তারা অভিবাসী ঠেকাতে রাষ্ট্রের সীমানা দেয়াল আর সমাজ, ধর্ম বা জাতির গায়ে কাঁটাতার তুলে রাখা জরুরী মনে করেন। গণতন্ত্র তারা ততদূর মানেন, যতদূর পর্যন্ত সেটা তাদের বিজয়ী করে। একবার বিজয়ী হলেই তারা মুখোশটা খুলে ফেলেন। তারা আবার পরস্পরের বন্ধুও। ইহুদীবাদী আর হিন্দুত্ববাদীর সখ্য নতুন নয়। তাদের অনুসারীরাও তা-ই। সৌদি মৌলবাদ আর ট্রাম্পের উগ্র জাতীয়তাবাদের তো হাতে হাত।

কর্তৃত্ববাদ, জনতুষ্টিবাদ, ডানপন্থা, এরা মোটামুটি সবাই নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রের কবর রচনা করেছে। নির্বাচন ও গণতন্ত্রের মধ্যে যখন এমন দা-কুড়াল সম্পর্ক, তখন বিশ্বজুড়েই গণতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি নিয়ে কথা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ ডাকসাইটে নেতা জয়ী হয়েছেন অর্ধেকের চেয়েও কম ভোটে। গণতন্ত্রকে বলা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সংখ্যায় কম ভোটেই তারা বিজয়ী হয়েছেন। এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির ধনিকশ্রেণির গণতন্ত্র কর্তৃত্ববাদ ঠেকাতে অক্ষম।

মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম[৩১] ফ্যাসিবাদী নেতা ও তার অনুসারীদের ওপর গবেষণা করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, নিজের ওপর ভরসার অভাবে, স্বাধীনতার যোগ্য না হওয়ায় আমরা পরাক্রমশালী নেতার দ্বারা চালিত হই বা হতে চাই। আমরা যখন প্রকৃত স্বাধীনতা সহ্য করতে পারি না, তখনই আমরা অধীন হওয়ার পথে বসি। আমাদের নিজেদের বাসনা থেকেই জন্ম নেয় দুঃশাসনের। জনগণের বৃহৎ অংশ যেমন চায়, তেমন ধরনের নেতাই তারা পায়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ববাদের জন্ম দেয়।

১৮. রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ—আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে সমন্বয় থাকার ওপর জনগণ সবসময় গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এগুলো একে অন্যের সম্পূরক হিসেবেই কাজ করে। উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কে বিবেচনা করার সময় রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা এর তত্ত্বগত দিকের প্রতি নজর দেন মূলত দুই কারণে—প্রথমত, রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের ভেতর যে সম্পর্ক থাকার কথা সাধারণভাবে বলা হয়, তার সাথে বাস্তব অবস্থা মেলে না। দ্বিতীয়ত, কাগজে-কলমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনপ্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়ে যায়নি। ফলে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলের সম্ভাবনা সব সময় থেকেই যায়। কেননা, এই তিন অঙ্গের মধ্যেকার সম্পর্ক বিভিন্ন দেশের সংবিধানে লিখিত হলেও বাস্তবে তা এখনো মীমাংসিত বিষয় নয়।

[৩১] দেখুন Fromm Erich, *Escape from Freedom*, New York: Rinehart & co., 1941.

রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ সম্পর্কিত ধারণার সূচনা হয়েছিল এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তায়। পরবর্তীকালে এটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রচিন্তাবিদ মন্টেস্কু। *দ্য স্পিরিট অব ল*[৩২] গ্রন্থে তিনি এই তিন বিভাগের ধারণা উপস্থাপন করেন। তবে এই প্রতিষ্ঠানের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে সংবিধানতন্ত্র বা কনস্টিটিউশনালিজমের বিকাশের সাথে সাথে। আধুনিক রাষ্ট্র যতই ব্যক্তির ইচ্ছা (যেমন রাজা/সম্রাট) বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (যেমন চার্চের) আনুগত্যের বাইরে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব তৈরি করেছে, ততই এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিকশিত হয়েছে। ইউরোপের সমাজে বণিক শ্রেণির এবং পরে মধ্যবিত্তের বিকাশ এই তাগিদকে শক্তিশালী করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি সহজেই নির্ধারিত হয়নি। কেননা, ইতিহাস থেকে জানা যায় যে রাজা বা সম্রাটরা আদালত প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের রাজদরবারও ছিল। ইউরোপে যখন রাষ্ট্র চার্চের অধীন ছিল তখন চার্চ বিচার করার এক ধরনের প্রক্রিয়াও বহাল রেখেছিল। কিন্তু এগুলো স্বাধীনভাবে সবাইকে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়নি, অন্যদিকে ক্ষমতা একই গোষ্ঠীর হাতে থেকেছে। অর্থাৎ আইনপ্রণেতা, আইনের প্রয়োগকারী এবং বিচারক একই মানুষ বা একই গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র তথা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই ক্ষমতাগুলোকে আলাদা করা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনা করে।

গণতন্ত্রের রূপ ও কাঠামো বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও গত এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত সেগুলো হলো–ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব, ব্যক্তি হিসেবে নাগরিকের স্বাধীনতা, জনগণের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের স্বাধীন উপস্থিতি ও ক্ষমতার বিভাজন। যেকোনো আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণায়ই এ বিষয়গুলোর কথা সবার আগে চলে আসে। যদিও শেষোক্ত বিষয়টি অনেক ধরনের বিতর্কের মধ্যে দিয়ে গেছে, তথাপি এর মর্মবস্তুর বিষয়ে দ্বিমত নেই। আর তা হলো প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পরস্পর থেকে আলাদা থাকবে এবং তাদের নির্ধারিত ভূমিকা স্বাধীনভাবে পালন করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটি আরেকটির ওপর কার্যত নজরদারি করবে। নির্বাহী বিভাগ যেন ইচ্ছামতো চলতে না পারে তা একইসাথে আইনপ্রণেতারা অর্থাৎ আইনসভা এবং বিচারবিভাগ দেখবে। আইনপ্রণেতারা যেন এমন আইন তৈরি করতে না পারেন, যা নাগরিকদের অধিকারকে সীমিত করে, তা দেখার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। একেই চেক অ্যান্ড ব্যালান্স বলে অভিহিত করা যায়। স্বাধীনভাবে এগুলো চলার অর্থ হলো কেউ কারও মুখাপেক্ষী হবে না, কেউ কারও সাথে আলাপ-আলোচনা করে পদক্ষেপ নেবে না। মন্টেস্কু এই তিন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ করতে বলেছিলেন। কেননা এর অন্যথা হলে নাগরিকের স্বাধীনতা থাকবে না।

---

[৩২] দেখুন Charles, Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Pantianos Classic, 1752.

যদি একের পদক্ষেপ অন্যের বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়, একে অন্যের সাথে সমন্বয় করে পদক্ষেপ নেয়, তাহলে নজরদারির সুযোগ থাকবে না, তাহলে এক অর্থে সব প্রতিষ্ঠানই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, তাহলে নাগরিকের অধিকার এবং স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হবে। ক্ষমতার বিভাজন যে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কতটা দরকার এবং তা কীভাবে কাজ করে তা সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত ঘটনাবলি থেকে সহজেই ধারণা করা যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেসব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এক বছর পরেও সেগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমে সাতটি এবং পরে ছয়টি মুসলিমপ্রধান দেশ থেকে যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং আরেকটি হচ্ছে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার করা স্বাস্থ্য বীমাব্যবস্থা, যা ওবামাকেয়ার নামে পরিচিত, তা বাতিল করা। প্রথম ক্ষেত্রে, ট্রাম্পের জারি করা প্রথম নির্বাহী আদেশের বাস্তবায়ন দেশের একটি আদালত স্থগিত করে দেন, পরে তা সংশোধিত আকারে আবার জারি করা হলেও আরেক আদালত তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছেন। একটি আদালতের তিনজন বিচারক তাদের দেওয়া রুলিংয়ে বলেছিলেন যে, অভিবাসন এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বে প্রশ্ন করা যাবে না বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে ধারণা দেয়া হয়েছে, তা অগণতান্ত্রিক। এ ক্ষেত্রে আদালত নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার রাশ টেনে ধরেছেন। ওবামাকেয়ার বাতিলের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রীতিমতো হুমকি দিলেও দেশের আইনপ্রণেতাদের বড় অংশ তার সাথে একমত হননি এবং তার কাঙ্ক্ষিত বিল পাস হয়নি। উল্লেখ্য, যে আইনসভা প্রেসিডেন্টের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করল না তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য তার নিজের দলেরই। নির্বাহী বিভাগের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন যে আইন বিভাগের কাজ নয়, সেটা প্রমাণিত হলো।

নির্বাহী বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে যখন বিভাজন স্পষ্ট (যেমন প্রেসিডেন্ট শাসিত মার্কিন ব্যবস্থা, যেখানে আইনসভা অনেক শক্তিশালী) সেখানে এই ধরনের চেক অ্যান্ড ব্যালান্স যতটা সহজ, সংসদীয় ব্যবস্থায় ততটা সহজ নয়। কিন্তু ক্ষমতার এই চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের ব্যবস্থা যদি না থাকে, তবে তা শুধু গণতন্ত্রের অনুপস্থিতির ইঙ্গিত করে না, রাষ্ট্রের লিবারেল চরিত্রকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে। যে কারণে যেসব দেশে শক্তিশালী সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর, সেখানে এমনকি ক্ষমতাসীন দলের সাংসদেরাও তাদের সরকারের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন। যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ওই দলের সাংসদদের ভোট দেওয়ার ঘটনা অহরহই ঘটে। এটিই হচ্ছে নির্বাহী বিভাগের সাথে আইনসভার বিভাজন।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেক গণতান্ত্রিক দেশের সংসদেই কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে আইনসভা এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় উপস্থিত, সেখানে বাকিটুকু সমন্বিত হলে এসব প্রতিষ্ঠানের আলাদা অবস্থান থাকবে না। কোনো গণতান্ত্রিক দেশে আইন প্রণয়নের আগেই আদালতের বিচারকেরা আইনপ্রণেতাদের বলতে পারেন না যে তারা কী আইন তৈরি করবেন, তেমনি আইনসভার সদস্যরা অনেক পরিশ্রম করে আইন তৈরি করেছেন বলেই আদালত তাতে সম্মতি দিলে আদালত তার দায়িত্ব পালন করেছেন এমন বলা যাবে না। কাজেই তিন বিভাগের কাজে সমন্বয়ের সাথে সাথে সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে একে অপরের কাজের ওপর নজর রাখা, স্বাধীনভাবে কাজ করা।

১৯. গণতন্ত্র রক্ষায় করণীয়

সাম্প্রতিককালে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র মন্দার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, স্বকীয়তা হারাতে শুরু করেছে। গণতন্ত্রকে রক্ষার আওয়াজ উঠেছে। ২০১৬ সালে ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)[৩৩] গণতন্ত্রের যে সূচক বের করেছে, তাতে দেখা যায় বিশ্বের মাত্র ৪ দশমিক ৫ শতাংশ জনগণ পূর্ণ গণতন্ত্রের মধ্যে বাস করে। অর্ধেকেরও বেশি বাস করে পুরো অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। আর বাকি অর্ধেক যেসব দেশে বাস করে, সেখানে গণতন্ত্র রয়েছে, তবে ত্রুটি-বিচ্যুতিও রয়েছে। ইআইইউ ২০০৬ সাল থেকে বিশ্বের গণতন্ত্রের মান অবস্থা ধরে যে সূচক বের করে যাচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্রের অবস্থা ক্রমে অবণতির দিকেই যাচ্ছে।

এরকম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন চলে এসেছে। এ প্রসঙ্গে ইআইইউর আঞ্চলিক পরিচালক (ইউরোপ) জোয়ান হোয়ে[৩৪] এক মজার প্রশ্ন তুলেছেন। সবাই গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলছেন, কিন্তু গণতন্ত্রকে কার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে?[৩৫] তিনি গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক দশা, এর নানা পর্ব এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়াসহ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর

[৩৩] বৃটেনকেন্দ্রীক বৈশ্বিক ব্যবসায়িক বোধশক্তিসম্পন্ন বিশ্বনেতৃবৃন্দের যে অর্থনৈতিক গোষ্ঠী রয়েছে তার একটি বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক ইউনিট হলো ইআইইউ। বিশ্বের প্রায় ২০০ টি দেশের মাসিক কর্মপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের নির্বিঘ্নতা পরিস্থিতি, কলকারখানার মান, কর্মপরিবেশ ও লেবার ইউনিয়ন পরিস্থিতি, বাজার পরিস্থিতি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ধরন প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে ইআইইউ প্রতিবছর দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনার সূচক নির্ধারণ করে থাকে।

[৩৪] দেখুন BBC Online Reports, Published in the 29 November, 2016.

[৩৫] ডগলাস হেভেনের এক প্রতিবেদনে হোয়ে গণতন্ত্র নিয়ে এ প্রশ্ন তুলেছেন ও নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। 'গণতন্ত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ' শিরোনামে এটি প্রকাশিত হয়েছে বিবিসি অনলাইনে।

ওপর আস্থা এখন সবচেয়ে নিচে নেমে এসেছে। ইউরোপসহ বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের রূপান্তর ঘটছে। মধ্যপ্রাচ্যে আবার কর্তৃত্ববাদী শাসন ফিরে আসছে। নাগরিক অধিকার ছেঁটে ফেলবেন এমন জনতুষ্টিবাদী নেতারা নির্বাচনে জিতে চলেছেন। উন্নত দেশগুলোতে কয়েক প্রজন্ম ধরে যে মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিল, তা ধ্বসে পড়তে শুরু করেছে।

সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে জোয়ান হোয়ের আক্ষেপ হচ্ছে- রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও চীনের মতো দেশগুলোর গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বেশি মাতামাতি হয়। কিন্তু আসল সমস্যা পশ্চিমে, সবচেয়ে পরিপক্ক গণতন্ত্রের কেন্দ্রে। ব্রিটেনে ব্রেক্সিট হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প জিতেছেন। এই জনতুষ্টিবাদী উত্থানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেক গণমাধ্যমসহ রাজনৈতিক এলিটদের পক্ষ থেকে আওয়াজ উঠেছে, 'গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে'। জোয়ান হোয়ের তাই প্রশ্ন, গণতন্ত্রকে আসলে কার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে? জনগণের কাছ থেকে? ব্রেক্সিট হয়েছে জনগণের ভোটে, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পও জিতেছেন জনগণের ভোটে। হোয়ে মনে করেন, ব্রেক্সিটের ঘটনা গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের বিষয়। এটা এক যুগান্তকারী ঘটনা।[৩৬] হোয়ের এই ধারণার সাথে আরও অনেকেই একমত। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক ও গণতন্ত্র অধ্যয়নবিষয়ক পণ্ডিত ল্যারি ডায়মন্ড বলেছেন, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমরা গণতন্ত্রের এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত মন্দাভাব দেখে আসছিলাম। আমরা বুঝতে পারছিলাম না যে, আমরা কোন দিকে যাচ্ছি। কিন্তু ব্রেক্সিট ও মার্কিন নির্বাচন সব ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে পরিপক্ক দেশগুলোতেই এখন গণতন্ত্র বিপদের মধ্যে রয়েছে।[৩৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্ভবত এই প্রথমবারের মতো পশ্চিমা বিশ্ব গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নিয়ে এত উদ্বেগের মধ্যে পড়েছে। ইআইইউ গণতন্ত্রের যে সূচক তৈরি করে, তাতে দেশগুলোকে পূর্ণ গণতন্ত্র, ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রহীন রাষ্ট্র হিসেবে ভাগ করা হয়। ২০১৬ সালের সূচকে যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণ গণতন্ত্র থেকে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রের কাতারে নেমে এসেছে।[৩৮] অবশ্য এ সূচক করা হয়েছিল ২০১৫ সালের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে। দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসার আগেই যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের মান কমতে শুরু করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়াজুড়েই গণতন্ত্রের এই ধারাবাহিক পতন কেন? এমনকি উন্নত ও দীর্ঘ পরীক্ষিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও। এর কারণ হিসেবে সাধারণভাবে আর্থিক

---

[৩৬] *প্রাগুক্ত*।

[৩৭] দেখুন BBC Online Reports, Published in the 29 November, 2016.

[৩৮] দেখুন, *ইআইইউ রিপোর্ট*, ২০১৬।

খাতের সংকট এবং এর ফলে অর্থিক কাটছাঁটের নীতির প্রভাবের কথা বলা হয়। বিশ্ব এখনো সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিবিসিতে প্রকাশিত ডগলাস হেভেনের নিবন্ধে বলা হয়েছে, আর্থিক খাতের সংকট গণতন্ত্রের ওপর বড় প্রভাব ফেলেছে। রাজনৈতিক নেতাদের জনগণ যেভাবে দেখত ও বিবেচনা করত, সেখানে পরিবর্তন হয়েছে।[৩৯] এই ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয়, তবে গণতন্ত্রের এ সংকট স্বল্পস্থায়ী হওয়ার কথা। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে রাজনীতির আবার আগের জায়গায় ফিরে যাওয়ার কথা, গণতন্ত্রের অস্তিত্বের অবস্থা ভালো হওয়ার কথা। জোয়ান হোয়ে এই মতের সাথে একমত নন। তিনি মনে করেন, গণতন্ত্রের যে বিপদ দেখা দিয়েছে, তা স্বল্পস্থায়ী কোনো বিষয় নয়। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণ গণতন্ত্রের দেশ থেকে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রের দেশে নেমে যাওয়ার ঝুঁকিতে ছিল এবং ২০১৫ সালে দেশটি নিচে নেমে গেছে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, দীর্ঘস্থায়ী যে সংকট গণতন্ত্রের গভীরে চেপে বসেছে, তার সুবিধাভোগী হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো লোকজন।[৪০]

তবে এখন ব্রেক্সিট ও ট্রাম্পের বিজয় যে ঝাঁকুনি দিয়েছে, তাকে যদি একটি সতর্কবার্তা হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়, তবে গণতন্ত্রের সামনের দিনগুলোর জন্য তা ভালো হতে পারে। জোয়ান হোয়ে বলেছেন, গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে গণতন্ত্রের অবস্থা যে খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাকে এতদিন কেউ তেমন পাত্তা দেয়নি। এখন সবাই যখন এ ব্যাপারে সোচ্চার হচ্ছে, তখন ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ নতুন বাস্তবতায় গণতন্ত্রের যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো স্পষ্ট হয়েছে, তাকে অবহেলা করা যাবে না।[৪১] 'সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র' যে বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বা দাঁড়াচ্ছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা যেন প্রকৃত গণতন্ত্রকে বিপদে ফেলতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যের দিকটি এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৪২] এটা একটা বড় আশার দিক। যথেষ্ট শক্তিশালী ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে।

ব্রেক্সিট ও ট্রাম্পের বিজয় পশ্চিমা বিশ্ব, সেখানকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী, পণ্ডিত ও সচেতন নাগরিকদের যে ঝাঁকি দিয়েছে, তা সেসব দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে। একই সঙ্গে

---

[৩৯] দেখুন BBC Online Reports, Published in the 29 November, 2016.

[৪০] *প্রাগুক্ত*।

[৪১] জোয়ান হোয়ে, *প্রাগুক্ত*।

[৪২] কিছু নির্দিষ্ট মুসলিম দেশের অভিবাসীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারে ট্রাম্পের পেছনে জনসমর্থন থাকতে পারে। কিন্তু শুধু জনসমর্থনের জোরেই ট্রাম্প হয়তো যা খুশি তাই করতে পারবেন না সেখানকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নানা ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থার কারণে।

সেখানকার ব্যবস্থার মধ্যে যে ভারসাম্যমূলক কাঠামো রয়েছে, তাও গণতন্ত্রের পতন ঠেকাতে ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশসমূহ, যেখানে নির্বাচনী ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যত ভেঙ্গে পড়েছে, রাষ্ট্রের অঙ্গগুলোর মধ্যে কোনো ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা নেই, বরং আছে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব করার প্রবণতা–সেসব দেশের ভবিষ্যৎ কোন পথে-এ প্রশ্নের অনুসন্ধান আজ জরুরী।

২০. উদার বিশ্বব্যবস্থার ভবিষ্যৎ

প্রায় এক হাজার বছর শাসনের পর অস্তগামী রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে ভলতেয়ারের[৪৩] বিখ্যাত উক্তি ছিল: বিলীয়মান 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' না ছিল 'পবিত্র', না ছিল 'রোমান', না ছিল 'সাম্রাজ্য'। প্রায় আড়াই শতক পর ভলতেয়ারের বাণীর মতো করেই আমাদের বলতে হয়, আজকের এই উদার বিশ্বব্যবস্থা না উদার, না বৈশ্বিক, না বিধিসম্মত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন এবং অন্য কয়েকটি দেশকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 'উদার বিশ্বব্যবস্থা' ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করে। ৩০ বছরে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বকে যে ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে, তার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সেটাই ছিল এর লক্ষ্য। এর ধারাবাহিকতায় বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশও আইনের শাসনভিত্তিক এমন একটি আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আসার জন্য আগ্রহী হলো, যার মাধ্যমে প্রতিটি দেশ পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক সীমারেখার ওপর শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারবে। তারা ভেবেছিল, সেই উদার বিশ্বব্যবস্থায় মানবাধিকার সংরক্ষিত থাকবে। পৃথিবী নামক এই গ্রহের কল্যাণের জন্য এই ব্যবস্থা চালু হবে এবং এই ব্যবস্থায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের বিষয়ে সবার জন্য দুয়ার খোলা থাকবে। উদার বিশ্বব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি জোরেশোরে আবির্ভূত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর।

আজ এই ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে জনতুষ্টিবাদের ক্রম-উত্থান ঘটছে। ইউরোপে কট্টরপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো উঠে আসছে। ইইউ থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে যে এলিট শ্রেণির প্রভাব কমে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও সেখানকার প্রেসিডেন্টের আক্রমণের শিকার হচ্ছে মিডিয়া, আদালত এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো। চীন, রাশিয়া এবং তুরস্কে কর্তৃত্ববাদী সরকার চেপে বসেছে। সিরিয়া ও ইয়েমেনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে এবং সিরিয়া সরকার জনগণের বিরুদ্ধে রাসায়নিক

[৪৩] দেখুন, BrainyQuote.com.

অস্ত্র ব্যবহার করার পরও এর বিরুদ্ধে জাতিসংঘ তেমন কোনো জোরালো ভূমিকা রাখতে পারেনি। ভেনিজুয়েলা এখন ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর প্রতি একশ জনের মধ্যে একজন এখন দেশছাড়া শরনার্থী, নয়তো দেশের ভেতরেই এক জায়গা থেকে বাস্তচ্যুত হয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে।

সাম্প্রতিক এসব বিপর্যয়ের পর, বিশেষ করে ২০১৬ সালের পর অধিকাংশ রাজনৈতিক ভাষ্যকার বিশ্বাস করেন, উদার বিশ্বব্যবস্থা গুরুতর সমস্যার মধ্যে আছে। সম্প্রতি মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে[৪৪] দেখা গেল, জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স, চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াঙ ই, রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ উদার ব্যবস্থা কী জিনিস, তা নিয়ে ঐকমত্যে আসতে পারেননি।[৪৫] ফলে এই ব্যবস্থার কী হবে, তা বলা কঠিন। বৈশ্বিক ক্ষমতা যেহেতু পশ্চিমাদের একক আধিপত্যের হাত থেকে অনেকের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে, তাই উদার বিশ্বব্যবস্থার ধারণা ক্রমবর্ধমান হারে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। রাশিয়ার সাথে সাথে চীন ও ভারতের মতো উদীয়মান শক্তিগুলো পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জ করছে।

কিন্তু প্রথম উদার বিশ্বব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা আছে, অর্থাৎ সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমান্ত যতদিন পরাশক্তিসমূহের দ্বন্দ্বকে আক্রান্ত করেনি ততদিন প্রতিটি দেশ মূলত নিজ ঘরে ব্যবসা করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিজয়ী পশ্চিমা শক্তি উদার বিশ্বব্যবস্থার সীমা সম্প্রসারিত করেছে। ফলে দেশে দেশে দ্বিতীয় উদার বিশ্বব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটল, যার লক্ষ্য হলো, সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসরত মানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়া। এভাবে পশ্চিমা শক্তি জাতীয় সার্বভৌমত্বের বদলে এক অভিন্ন নিয়ম বানানোর চেষ্টা করল। কিন্তু চীন ও রাশিয়ার মতো সার্বভৌমত্ববাদী শক্তিগুলো এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া থামিয়ে দেয়। অন্যদিকে পশ্চিমাদের দ্বারা আরোপিত ও সংঘটিত ইরাকের দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণে দ্বিতীয় উদার ব্যবস্থার মোড় ঘুরে যায়। পশ্চিম যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, এখন সে নিজেই তা ছুড়ে ফেলেছে। যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুক্তবাণিজ্য ও প্যারিস জলবায়ু চুক্তির নিন্দা–এসব কারণে প্রথম উদার ব্যবস্থা হুমকির মুখে।

---

[৪৪] ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো ও জাতিসংঘের মতো বহুপক্ষীয় কাঠামোগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. তারিখে জার্মানির মিউনিখে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাই মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন। এ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা, শরণার্থী সংকট, পররাষ্ট্রনীতি, জোটবদ্ধতার প্রতি অঙ্গীকার, প্রতিরক্ষা জোটের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি, একলা চলো নীতি পরিহার, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা, বিশ্বায়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়।

[৪৫] উদার বিশ্বব্যবস্থা একেবারেই অস্পষ্ট ধারণা, তা বলা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে প্রথম উদার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যার লক্ষ্য ছিল শান্তি সমুন্নত রাখা ও বৈশ্বিক সমৃদ্ধির পালে হাওয়া লাগানো। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও তার সাথে ন্যাটোর মতো আঞ্চলিক নিরাপত্তা বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে এই ব্যবস্থা আরও পাকাপোক্ত হয়। এটা জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বহুপক্ষীয় বন্দোবস্তে জোর দেয়, যার মাধ্যমে মুক্তবাণিজ্যের পক্ষেও জোর প্রচার দেয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যে উদার গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল, সেটা এখন সংকটে পড়েছে। বিশেষ করে ইউরোপের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য, যেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নানা চ্যালেঞ্জের মুখে আছে–যার মধ্যে আছে, ক্রমশ রাশিয়ার আগ্রাসী অবস্থানে যাওয়া, বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের সার্বক্ষণিক হুমকি, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ এবং অসম অর্থনৈতিক বিকাশ। যুক্তরাজ্যের ব্রেক্সিট গণভোট আর মার্কিন নির্বাচনের পর ইউরোপ এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে: জনতুষ্টিবাদী ও জাতীয়তাবাদীরা কি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতেও একই প্রভাব বিস্তার করবে? ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের পর সবচেয়ে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এসব দেশের নির্বাচনের যা ফল, তাতে সারা পৃথিবীই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। অন্তত ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের মতো সুরক্ষাবাদী নীতিতে যাচ্ছে না। বিশ্বের অনেক দেশেই সুরক্ষাবাদ ও অনুদার গণতন্ত্রের উত্থান হচ্ছে।

যারা সুরক্ষাবাদের কথা বলেন, তারা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। গত শতকের শেষের দিকের দুই তৃতীয়াংশ সময় একটি নিয়মভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, যার বদৌলতে পণ্য, সেবা, মানুষ ও চিন্তা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেছে। জনতুষ্টিবাদী ও অর্থনৈতিক সুরক্ষাবাদীরা এই কাঠামোয় চরম আঘাত হেনেছে। তারা মনে করেন, সীমান্তের মূল্য আছে। ফলে যে ব্যবসায়ীরা বৈশ্বিক পরিসরে আন্তসম্পর্কিত ব্যবসা গড়ে তুলতে চাইছেন, তারা এখন নতুন কিছু করার আগে ভাববেন। এই অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিশেষ করে আন্তদেশীয় বিনিয়োগ। বিনিয়োগ কম হলে এই ব্যবস্থার পক্ষপাতীরা এটাকে টেনে নিয়ে যেতে তেমন একটা আগ্রহী হবেন না। পুরো বিশ্বের জন্যই এটা সমস্যাজনক হবে। আমরা পছন্দ করি আর না করি, বৈশ্বিক মানবসমাজ পরস্পর সম্পর্কিতই থাকবে, যার সামনে জলবায়ু পরিবর্তন ও সন্ত্রাসবাদের হুমকি অভিন্ন সমস্যা হিসেবেই থাকবে। ফলে সামষ্টিকভাবে এই সমস্যা মোকাবিলার সক্ষমতা ও প্রণোদনা বাড়াতে হবে।

এই শিক্ষাটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো অনেক আগেই শিখেছে। এই অঞ্চলের ছোট দেশগুলো বুঝতে পেরেছে, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে উন্মুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু সেটা যদি উন্মুক্ত ও গণতান্ত্রিক রাখতে হয়, তাহলে নাগরিকদের বোঝাতে হবে, সমাজের বড় অংশ এতে বাদ পড়বে না। তাই স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোর সফলতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে এই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মডেল। তারা বুঝতে পেরেছে, টেকসই সমৃদ্ধির একমাত্র তরিকা হচ্ছে অভিন্ন সমৃদ্ধি। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ বাকি বিশ্বকে এই শিক্ষাটা নিতে হবে। এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, আজকের বিশ্বায়িত পৃথিবীতে যেখানে একক রাষ্ট্রগুলো নখ-দন্তহীন হয়ে যাচ্ছে, সেখানে এই জনতুষ্টিবাদী জাতীয়তাবাদীরা মানুষের কাঙ্খিত দাবি কতটা পূরণ করতে পারবে। সৌভাগ্যবশত, উদার গণতন্ত্র এখনো প্রগতিশীল বিকল্পের সন্ধান দেয়। উদারপন্থীদের কাজ হচ্ছে এদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া এবং বিকল্প উপস্থাপন করা।

গ্রন্থপঞ্জি

Skoble, Aeon J. & Machan, Tiber R.	*Political Philosophy Essential Selections* (Delhi: Pearson Education: 2007)
Althusser, Louis	*For Marx, Eng. Trans. Ben Brewster* (Harmondsworth: Penguin Books Ltd., 1969)
Anderson and Herr, Gary L. and Kathryn G.	*Encyclopedia of Activism and Social Justice.* (SAGE Publications, inc. 2007)
Vincent, Andrew	*Modern Political Ideologies*, (USA: Wiley-Blackwell publishing, 2010)
Arthur, John & Shaw, William H.	*Justice and Economic distribution* (Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc., 1978)
Avieneri, Shlome	*The Social and Political Thoughts of Karl Marx* (New York: Cambridge University Press, 1993)
Badie, Berg-Schlosser, Morlino, Bertrand, Dirk, Leonardo	*International Encyclopedia of Political Science,* Volume 1. (SAGE, September 7, 2011)
Bernstein, Eduard	*Evolutionary Socialism* (from Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie), (Schocken Books, 1961)
Bilgrami, S. Jafar Raza	*'Problems of Democratic Socialism', (Indian Journal of political Science*, 26(4), 1965)
Bottomore, Tom (ed.)	*A dictionary of Marxist Thought,* (England: Basil Blackwell Publisher Limited, 1983)
Brenkert, George G.	'Freedom and Private Property in Marx', *Marx, Justice and History,* (Princeton: Princeton University Presss, 1980)
Brewer, Anthony	*A Guide to Marx's Capital,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984))
Bryce, James	*Modern Democracies,* Volume-1, (New York: The Macmillan Company, 1921)

Benne, Robert	*The Ethic of Democratic Capitalism: A Moral Reassessment,* (Philadelphia: Fortress Press, 1981)
Busky, Donald F.	*Democratic Socialism: A Global Survey,* (USA: Greenwood Publishing, July 20, 2000)
Callinicos, Allex	*Marxist Theory*, (New York: Oxford University Press, 1989)
Caver, terrell	*A Marx Dictionary*, (Oxford: Polity Press, 1987)
Cohen, G. A.	*Karl Marx's Theory of History*, (Oxford: Clarendon Press, 1982)
_____	*History, Labour and Freedom* (Oxford: Clarendon Press, 1988)
Cooper, John M.	*Reason and Human Good in Aristotle,* (Harvard: Harvard University Press, 1975)
Croce, Benedetto	*Historical Materialism and the Economics of Karl Marx,* Eng. Trans. C. M. Meredith, (London: Frank cass & Co. Ltd., 1966)
Curian, Alt, Chambers, Garrett, Levi, McClain, George Thomas, James E., Simone, Geoffrey, Margaret, Paula D.	*The Encyclopedia of Political Science Set.* (CQ Press, October 12, 2010)
Cutler, Anthony, et. al. (eds.)	*Marx's Capital and Capitalism Today*, Vol. 2, (London: Routledge & Kegan Paul, 1977)
Devon, W. Carbado and Weise, Donald (ed.)	*'Feminism and Equality', Time on Two Crosses: The Collected Writings of Bayard Rustin*, (Cleis Press Inc., San Francisco, California, 2003)
Draper, Hal	*The Two Souls Of Socialism*, Published by the Independent Socialist Committee (A Center for Socialist Education), (Woolsey Street, Berkeley, Calif, 1966)
Draper, Theodore	*A Struggle for Power: The American Revolution*, (New York: Vintage Books, A division of Random House, inc., 1997)

Durant, Will and Ariel	*The Lessons of History*, 1st ed, (New York, Simon & Schuster, 1968)
Eatwell & Wright, Roger & Anthony	*Contemporary Political Ideologies,* Second Edition. Bloomsbury Academic, (March 1, 1999)
Elster, Jon	*Making Sense of Marx,* (London: Cambridge University Press, 1985)
Ely, Richard T.	*Socialism : An Examination of its Nature, Its Strength and Its Weakness with Suggestions for Social Reform,* (New York: Publisher : Thomas Y. Crowell, 1894)
Engles, F.	*Anti Duhring*, (Peking: Foreign Language Press, 1976), (Moscow: Progress Publishers, 1975)
_____	'Speeches in Elberfeld', *Karl Marx & Frederich Engels Collected Works,* (Moscow: Progress Publisher, 1975), Vol. 4
_____	'The Condition of Working Class in England', *Karl Marx & Frederich Engels Collected Works,* (Moscow: Progress Publisher, 1975), Vol. 4
Friedman, Milton	*Capitalism and Freedom*, (The University of Chicago Press, Chicago and London, 2002)
George, Ritzer	*Sociological Theory*, (Newyork: Mcgraw Hill Inc. 1992)
Giddens, Anthony	*Central Problems in Social Theory,* (Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1990)
Goodin, R.E. and Pettit, p. (ed)	*A Companion to Contemporary Political Philosophy*, (Oxford: Blackwell Publishers, 1993)
Gregory and Stuart, Paul and Robert	*Comparing Economic Systems in the Twenty-First.* (South-Western College Pub., 2003)
Groth, A. J.	*Major Ideologies* : *An Interpretative Survey of Democracy, Socialism and Nationalism,* (New York: John Wiley, 1971)
Hadley, Arthur T.	*The Moral Basis of Democracy,* (London: Oxford University Press, 1919)
Hain, Peter	*Back To The Future Of Socialism*, (Policy Press, University of Bristol, UK. 2015)

Dhaka University Institutional Repository

Hegel, G. W. F.	*The Philosophy of Right*, (Chicago: William Benton Publishers, Encyclopaedia Britannica Inc., 1952, vol. 46)
Heilbroner, Robert L.	*An Inquiry into the Human Prospect: Looked at Again for the 1990s*, (W. W. Norton & Company, New york, London, 1991)
Honneth, Axel	The Idea of Socialism, translated by Joseph Ganahl, (Polity Press, Cambridge, UK, 2017)
Hook, S.	*Towards the Understanding of Karl Marx*, (London: Victor Gollancf, 1973)
Hook, S. (ed)	*World Communism*, (Toronto: D. Van. Nostrand, 1962)
Irving, Kristol	*Neoconservatism: The Autobiography of an Idea*, (New York: The free press, 1995)
Jaures, Jean	*Studies in Socialism*, (New York: The Knickerbocker Press, 1906)
Johary, J. C.	*Contemporary Political Theory* , (New Delhi: Sterling Publishers, 1987)
John, Dunn	*The political Thoughts of John Locke: An Historical Account of the Argument of the 'Two Treatise of Government'*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1969.)
Kendall, Diana	*Sociology in Our Time: The Essentials.* Cengage Learning, (January 2011)
Lenin V. I.	*Imperialism the Highest Stage of Capitalism*, (Peking: Foreign Language Press, 1975)
_____	'How to Organize Competition?', *Collected Works*, Vol. 26, (Moscow: Progress Publishers, 1972)
_____	*Marxism on the State*, (Moscow: Progress publishers, 1972)
_____	'The State and Revolution' *in Selected Works*, (Moscow: Progress publishers, 1967, vol. 2)
Perry Marvin, Chase Myrna, Jacob Margaret, Jacob James R.	*Western Civilization: Ideas, Politics and Society From 1600*, vol. 2, Ninth Edition, (Boston, Massachusetts, USA: Houghton Harcourt Publishing Company, 2009)

Dhaka University Institutional Repository

Mandel, Ernest	*Capital,* (Penguin: 1976)
Marcuse, H.	*Soviet Marxism, A Critical Analysis,* (London: Routledge & Kegan Paul, 1968)
Marx, Karl	*Economic and Philosophic Manuscripts of 1844,* (Moscow: Progress Publishers, 1977)
_____	*Grundrisse,* (Trans.) Martin Nicolaus, (London: Penguin books Ltd., 1993)
_____	*Theories of Surplus-Value,* vol. 1, (Moscow: Progress Publishers, 1971)
_____	*Theories of Surplus-Value,* vol. 2, (Moscow: Progress Publishers, 1971)
_____	*Theories of Surplus-Value,* vol. 3, (Moscow: Progress Publishers, 1971)
_____	*Capital,* (ed.) F. Engels, (tr.) Samuel Moore & Edward Aveling, Vol.-6, (Moscow: Progress Publishers, 1984)
Marx, K. & Engels, F.	*The Communist Menifesto,* (Penguin, Hammondsworth, 1967)
_____	*The Poverty of Philosophy,* (Moscow: Progress Publishers, 1947)
_____	*Economic anf Philosophic Manuscripts of 1844*, (Moscow: Progress Publishers, 1981)
_____	*The German Ideology,* (Moscow: Progress Publishers, 1971)
_____	*Selected Works*, 3 vols, (Moscow: Progress Publishers, 1968)
_____	'The Holy Family' *Karl Marx & Frederich Engels Collected Works,* (Moscow: Progress Publishers, 1975), vol. 4
Moore, Barrington	*Social Origins of Dictatorship and Democracy*, (England: Penguin University Books, 1973)
Nisbet, Robert A.	*The Sociological Tradition*, (London: Transsction Publishers, 2004)
Novak, Michael	*The Spirit of Democratic Capitalism,* (New York, The free press, 1993)

Dhaka University Institutional Repository

Orth, Samuel P.	*Socialism and Democracy in Europe,* (New York: Henry Holt and Company, 1913)
Berger Peter L. and Luckmann Thomas	*The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (New York: Anchor Books, Random House, 1966)
Pipes, Richard	*Communism: A History*, (USA: A Modern Library, Chronicles Book, 2003)
Poulantzas, Nicos	*State, Power, Socialism*, (Verso, London, 2014)
Prychito, David L.	*Markets, Planning, and Democracy: Essays After the Collapse of Communism.* (UK: Edward Elgar Publishing, July 31, 2002)
Rashid, Haroon	*Normative Marxism*, (Dhaka: Jatiya Shahittaya Prakash, 2007, 2nd Print, 2017)
Roemer, John E.	*Analytical Foundation of Marxian Economic Theory*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1981)
Russell, B.	*Proposed Roads to Freedom–Socialism, Anarchism and Syndicalism,* (New York: Henry Holt and Company, 1919)
Skoble, Aeon J. and Machan, Tibor R. (ed)	*Political Philosophy Essential Selections*, (Delhi: Pearson Education and Dorling Kindersley Publishing, 2007)
Schumpeter, Joseph A.	*Capitalism, Socialism and Democracy*, (Routledge, London and New York, 2003)
Smith, Adam	*The Wealth of Nations*, (Oxford Paperbacks, Oxford, UK, 2008)
Spargo, John	*Elements of Socialism,* (New York: The Macmillan Company, 1912)
Taylor, Charles	'Socialism and Weltanschauung, in Leszek Kolakowskij', Stuart Hampshire (ed.), *The Socialist Idea, A Reappraisal*, (London: Quarlet Books, 1977)
_____	*A Secular Age*, (London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007)
Toynbee, Arnold	'Heroic Ages: Contacts Between Civilizations in space' *A Study of History,* v. 8, (Oxford University Press, 1969)

Waldron, Jeremy	*The Right of Private Property*, (Oxford: Clarendon Press, 1988)
Walker, David and Gray, Daniel	*Historical Dictionary of Marxism*, (Lanham, Maryland, UK: Scarecrow Press, 2007)
Weidenbaum, Murray L.	*Business, Government, and the Public*, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990)

সাদি, অনুপ	*সমাজতন্ত্র*, (ঢাকা: ভাষাপ্রকাশ, ২০১৫)
বুজুয়েভ, আ.	*পুঁজিতন্ত্র কী*, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)
আইনস্টাইন, অ্যালবার্ট	'সমাজতন্ত্র কেন?', (সম্পা.) শরীফ শমশির, *সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে*, (ঢাকা: গণপ্রকাশন, ২০১৩)
আগিবালভা, ইয়েকাতেরিনা ও দনস্কই, গ্রিগোরি	*পৃথিবীর ইতিহাস: মধ্যযুগ*, (অনুবাদ: সুবীর মজুমদার, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১০)
আগিবালভা, ইয়েকাতেরিনা ও দনস্কই, গ্রিগোরি	*পৃথিবীর ইতিহাস: আধুনিক যুগের সূচনাপর্ব*, (অনুবাদ: সুবীর মজুমদার, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১২)
মুহাম্মদ, আনু	'প্যারি কমিউন টিকে ছিল ৭২ দিন, সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকল ৭০ বছর', (সম্পা.) পারভেজ হোসেন, *সমাজতন্ত্রের সংকট: নানা চোখে*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২)
আহমদ, এমাজউদ্দীন	*গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, (ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী, ২০০২)
ইসলাম, নজরুল	'পুঁজিবাদের পর কী?' *সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র*, (ঢাকা: সমাজ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ৮, জানুয়ারি ২০১৪)
উমর, বদরুদ্দীন	*সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের মুখে সমাজতন্ত্রের পদধ্বনি*, (ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১২)
এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক	*পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*, (বাংলাবাজার, ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৫)
_____	'বাস-সংস্থান সমস্যা', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২)
_____	'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকান ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', *মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন*, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২)
_____	'পূর্বাভাস', ১৮৫৫, *পুঁজি*, খন্ড-২, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

_____	*মজুরি প্রথা, ('লেবর স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, ১৮৮১)* (ঢাকা: সংঘ প্রকাশন, ২০১৪)
_____	'মার্কসের পুঁজি', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২)
ফ্রম, এরিক	*মার্কসের মানুষ*, (অনু.) মনোজ দে ও জাভেদ হোসেন, (ঢাকা: বাঙলায়ন, ফেব্রুয়ারি, ২০১০)
খান, আখতার সোবহান	*মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮)
খান, হায়দার আকবর রনো	*অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট*, (ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১৭)
খান, হায়দার আকবর রনো	*মার্কসীয় অর্থনীতি*, (ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী, ২০১২)
সাবিরভ, খারিস	*কমিউনিজম কী*, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)
খোলদ, সোফিয়া	*সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ*, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)
গ্রাৎসিয়ানস্কি, প.স., গ্রাফস্কি, ভ.গ., দেয়েভ, ন.ন., মামুত, ল. স., মারতিশিন, ও. ভ., নেসেসিয়ানৎস, ভ.স.	*রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খন্ড, ননী ভৌমিক অনূদিত, (ঢাকা: অবসর, ২০০৯)
ঘোষ, রতনতনু (সম্পা.)	*পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র*, (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১১)
_____	'বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের গতিধারা', *গণতন্ত্র স্বরূপ সংকট ও সম্ভাবনা*, (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১২)
চক্রবর্তী, মধুসূদন	*মার্কসবাদ জানবো*, (কলকাতা: ন্যাশনার বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪)
চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ ও মৈত্র রমাকৃষ্ণ	*পৃথিবীর ইতিহাস*, (বাংলাবাজার, ঢাকা: মাটিগন্ধা, ২০১৪)
চৌধুরী, এম আর	*সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম:বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রক্রিয়া*, (ঢাকা: দি ডলফিন এন্টারপ্রাইজ, ২০১০)
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ	*রাশিয়ার চিঠি*, (ঢাকা: রহমান বুকস, ২০১৪)
নাথ, ধীরাজ কুমার	'প্রসঙ্গকথা', *গণতন্ত্র : সংকট ও উত্তরণ*, (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০০৯)
পল, সাভচেনকো	'পুঁজিতন্ত্রে শ্রমের প্রক্রিয়া' *পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র*, রতনতনু ঘোষ (সম্পা.) (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১১)
সুইজি, পল এম.	'সমাজতন্ত্র', (সম্পা.) শরীফ শমশির, *সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে*, (ঢাকা: গণপ্রকাশন, ২০১৩)

Dhaka University Institutional Repository

বসু, প্রদীপ — *উত্তর আধুনিক রাজনীতি ও মার্কসবাদ*, (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০০৫)

মজহার, ফরহাদ — *সাম্রাজ্যবাদ*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, মার্চ ২০১০)

উমর, বদরুদ্দীন — *সাম্রাজ্যবাদের নোতুন বিশ্ব ব্যবস্থা*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫)

বর্মন, রেবতী — *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮)

বিথাম, ডেভিড ও বয়েল, কেভিন — *গণতন্ত্র ৮০ টি প্রশ্ন ও উত্তর*, আলমগীর সিকদার লোটন (সম্পা.) (ঢাকা: আকাশ, ২০১০)

বুজুয়েভ, ভ. ও গরোদনভ, ভ. — *মার্কসবাদ লেলিনবাদ*, (অনু.) ননী ভৌমক, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)

লেলিন, ভ. ই. — *কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের মূলনীতি*, (ঢাকা: ভ্যানগার্ড প্রকাশনী, ২০১১)

_____ — *গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল*, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৪)

_____ — *প্রলেতারিয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি*, রচনা সংকলন, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, তারিখহীন)

_____ — 'যুব লীগের কর্তব্য' *ভ. ই. লেলিন রচনা সংকলন*, চতুর্থ ভাগ, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৪)

_____ — *রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৬)

_____ — *সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়*, (অনু.) প্রভাত পট্টনায়ক, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২)

মজুমদার, সমীরণ — *মার্ক্সবাদ বাস্তবে ও মননে*, (কলকাতা: স্বপ্রকাশ, ১ বৈশাখ, ১৪০২)

মার্কস, কার্ল — 'গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা' *মাএরস*, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২)

_____ — *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-১, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)

_____ — *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-২, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)

_____ — *পুঁজি*, তৃতীয় খন্ড, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)

_____ — *পুঁজি*, পঞ্চম খন্ড, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)

_____ — *পুঁজি*, ষষ্ঠ খন্ড, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

_____ 'মজুরি,দাম, মুনাফা', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২)

_____ 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' *মাএরস*, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২)

_____ *ইহুদি প্রশ্নে*, (অনু.) জাভেদ হুসেন, (ঢাকা: সংহতি, ২০০৯)

মার্কস, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক 'কমিউনিস্ট পার্টির ইসতেহার', *মাএরস*, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২)

মাও সেতুং *জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে*, (পিকিং: বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, ১৯৫৭)

_____ জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান, *নির্বাচিত রচনাবলী*, (কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন, ২০০১)

মিল, জন স্টুয়ার্ট *প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার*, (অনু.) দরবেশ আলী খান, (ঢাকা: নালন্দা, ২০০৭)

হক, আবুল কাসেম ফজলুল *গণতন্ত্র ও নয়াগণতন্ত্র*, (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১২)

রশীদ, হারুন মার্কসীয় দর্শন, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪)

রশীদ, হারুনুর *রাজনীতিকোষ*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)

রায়, প্রদীপ কুমার 'দর্শন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও বাংলাদেশ', *মূল্যবোধ ও মানবতা*, (সম্পা.) শহিদুল ইসলাম (ঢাকা: উত্তরণ, ২০০৫)

সরকার, ব্যারিষ্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন *গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, (ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী, ২০১২)

হক, আবুল কাসেম ফজলুল, 'গণতন্ত্র ও নয়াগণতন্ত্র', *গণতন্ত্র স্বরূপ সংকট ও সম্ভাবনা*, রতনতনু ঘোষ (সম্পা.) (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১২)

হক, মফিদুল 'স্বপ্নের সমাজ ও উৎপীড়ক বাস্তব', *সমাজতন্ত্রের সংকট: নানা চোখে*, (সম্পা.) পারভেজ হোসেন, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২)

হুবারম্যান, লিউ 'সমাজতন্ত্রের অ আ ক খ', *সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে*, শরীফ শমশির (সম্পা.) (ঢাকা: গণপ্রকাশন, ২০১৩)

দত্তগুপ্ত, শোভনলাল *মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা*, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জুন,২০১৪)

দত্তগুপ্ত, শোভনলাল ও ঘোষ, উৎপল *মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব*, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০)